PRESENTED
11/2003

ভক্তকবি মধুসূদন রাও
ও
উৎকলে নবযুগ

LIBRARY
No. 11/20[illegible]

অবন্তী দেবী

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

১১|২৫৬

ভক্তকবি মধুসূদন রাও
ও
উৎকলে নবযুগ

LIBRARY
No
Ashram

শ্রীঅবন্তী দেবী

প্রকাশক—
শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য,
৭০-সি, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা—২৯

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর সরকার মহাশয়ের
করকমলে

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় —
২১-১০-১৯৬৩

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রকঃ—
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার,
ব্রাহ্মমিশন প্রেস,
২১১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

পরিবেশকঃ—"জিজ্ঞাসা," পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা,
১৩৩-এ, রাসবিহারী এভিন্যু,
কলিকাতা—২৯

১১|৮-০২

উৎসর্গ পত্র

পার্থিব গণনায় দীর্ঘ অর্ধশতাব্দ
অতীত হইলেও যাঁহার পুণ্যজীবনের অমরস্মৃতি
আমাকে সর্বদাই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; যাঁহার অমূল্য
জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত জন্মভূমি উৎকলে নবযুগ আনয়নে
বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল; যাঁহার জীবনে ভগবদ্‌ভক্তির
অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া উৎকলবাসী যাঁহাকে একবাক্যে
'ভক্তকবি' নামে আখ্যাত করিয়াছে; যাঁহার বাণীতে,
আচরণে ও সমগ্র জীবনে ভূমা ভুবনেশ্বরের
অপূর্ব মহিমা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত—

সেই স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের শ্রীচরণে তাঁহার অযোগ্য
কন্যার এই ভক্তির অর্ঘ্য উৎসর্গীকৃত হইল।

—শ্রীঅবন্তী দেবী

১১। ২০১

ভূমিকা

ভক্তকবি মধুসূদন রাও।

মধুসূদন বলতে বাংলাদেশে যেমন একজনকেই বোঝায় ওড়িশায় তেমনি দুজনকে। তাঁদের কেউ কারো চেয়ে কম প্রসিদ্ধ নন। দুজনেই অমর। যিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অমর তাঁকে বাংলা দেশের লোক চেনে। মধুসূদন দাস ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক। আর সাহিত্যে অমর যিনি তাঁর "ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ" এককালে বাংলায় অনূদিত হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"য় কবিকণ্ঠের মালা পেয়েছিল। কিন্তু সে সব কথা কারো মনে নেই। তবে ব্রাহ্মসমাজের তিনশাখায় তিনি সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এখনও রাও-পরিবারের সহিত এঁদের যোগাযোগ রয়েছে ও এঁরা এখনও শ্রদ্ধার সহিত মধুসূদনকে স্মরণ করেন। মধুসূদন রাও ছিলেন কবি তথা ভক্ত। সেজন্যে তাঁর প্রদেশের লোক তাঁকে "ভক্তকবি মধুসূদন" বলে নিত্য স্মরণ করে।

ছেলেবেলায় আমি যে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি তার দ্বিতীয় ভাষা ছিল ওড়িয়া। সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক ছিল মধুসূদন রাও মহাশয়ের রচনা। সে সব পাঠ্যপুস্তকের গদ্যরচনা মনে রাখবার মত নয়। কিন্তু পদ্য অংশ মধুসূদনের স্বরচিত ও সুরচিত কবিতা। পাঠ্যপুস্তকের জন্যেই তিনি সে সব লিখেছিলেন তা নয়। তিনি লিখেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়, পরে জুড়ে দিয়েছিলেন পাঠ্যপুস্তকে। সে সব কবিতা পড়লে সহজেই ছন্দের কান তৈরী হয়ে যায়; চিত্ত সাহিত্যের আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়। তাঁর সব কবিতাই যে ভক্তিমূলক তা নয়। বরং প্রকৃতিবর্ণনাই বেশী। তবে তার সঙ্গে খানিকটা দার্শনিকতাও থাকত। কিংবা নীতির অনুশাসন। মধুসূদন দাস কেবল সার আশুতোষেরই শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু মধুসূদন রাও ছিলেন আমার মতো বহু অবোধ বালকের শিক্ষার জন্য সমর্পিতপ্রাণ। শিক্ষাবিভাগেই তিনি কাজ করতেন। তবে আমি যখন স্কুলে ততদিনে তিনি পরলোকে।

রাও কবিকে আমি চোখে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে "উৎকল সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁর জীবনকথা প্রকাশিত হয়। লেখেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথ। আর

একটু বেশী বয়সে এক সেট্ পুরাতন "উৎকল সাহিত্য" আমার হাতে পড়ে। তন্ময় হয়ে কবির জীবনচরিত "ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন" পড়ি। কবির মৃত্যুকালীন একটি উক্তি আমার পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও মনে আছে। কবিকে যখন এনিমা দেওয়া হয় তিনি কাতর কণ্ঠে বলেন, "এনিমা জানিনা। জানি সেই চিনিমা"—চিন্ময়ী মা।

কলেজে পড়ার সময় একটি পুরস্কার ঘোষিত হয়। আমি সেই পুরস্কারটি পাই। রাও কবির "বসন্ত গাথা" নামক কবিতাবলীর সমালোচনা লিখে।

"বসন্তগাথা"র একটি কবিতা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করি। এটি কবির এক বন্ধুর পত্নীবিয়োগ লক্ষ্য করে লিখিত।

"হজি নাহি কেভেঁ যার কিছিহি রতন
এ মর্ত্য সংসারে সেহি দীন অকিঞ্চন।
সে পুনি দরিদ্রতর, হরাই রতন
এ ভবভবনে তাহা পাসোরে যে জন।
সে পুনি দরিদ্রতম কৃপাপাত্র অতি
হরাই পাসোরিবাকু বলে যার মতি।"

স্বাধীনভাবে অনুবাদ করলে এই রকম শোনায়,

"হারায়নি কভু যার কিছুই রতন
এ মর্ত্য সংসারে সেই দীন অকিঞ্চন।
সে জন দরিদ্রতর, হারিয়ে রতন
এ ভবভবনে তাহা পাসরে যে জন।
সে জন দরিদ্রতম কৃপাপাত্র অতি
হারাইয়া পাসরিতে যায় যার মতি।"

আর একটা কবিতা কোনো এক পতিতা রমণীর দশা দেখে লেখা। তাতে আছে—"যে চাহিঁব চাহুঁ তোতে গর্ব অবজ্ঞারে কিন্তু লো ভগিনী মুহি তো দুঃখে কাতর। আহত মো প্রাণ তোর মর্ম হাহাকারে কান্দই বিকলে মোর ব্যথিত অন্তর।"

সেকালের একজন মহিলাকবি এর অনুবাদ করেন। নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম।

"যে চাহে চাহক তোরে গর্ব অবজ্ঞায়, তোর দুঃখে লো ভগিনি, এ প্রাণ

LIBRARY
No.
Shri ... ...
BANARAS
...mayee Ashram

কাতর, আহত এ প্রাণ তোর মরম ব্যথায়, কান্দয় আকুলে মোর ব্যথিত অন্তর।"

তারপর কবি পতিতপাবনীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,

"পতিতা হেলেহেঁ নারী মোহরি তনয়া,
সতীত্ব, দেবীত্ব তার ললাটে লিখিত,
কে তাকু সেথিরু বিশ্বে করিব বঞ্চিত !"

অনুবাদ :— "পতিতা হলেও নারী আমারি তনয়া,
সতীত্ব, দেবীত্ব তার ললাটে লিখিত—
কে তাকে তা হতে বিশ্বে করিবে বঞ্চিত !"

এ ক'টি নমুনার থেকে মনে হতে পারে কবি শুধু পয়ার ছন্দই জানতেন। তা নয়, ছন্দসম্পদে ওড়িয়া অসাধারণ ধনী। আধুনিক যুগের পূর্বে তার ভাণ্ডারে বিচিত্র রাগরাগিণী সহযোগে রচিত অসংখ্য "ছান্দ" জমেছিল। কিন্তু সমসাময়িক রুচিতে সেগুলি আদিরসাত্মক বলে একালের কবিরা সে ধরণে নতুন কবিতা লেখা একপ্রকার বন্ধ করে দেন। ভক্তকবিও একজন ভিক্টোরিয়ান। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। অথচ প্রাচীন "ছান্দ" তাঁর শ্রুতি হরণ করেছিল। অনেকটা আমাদের ভানুসিংহ ঠাকুরের মত। ভানুসিংহের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, তিনি নায়ক নায়িকাকে বর্জন ক'রে "ছান্দ" বাঁধলেন প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে। এই রকম একটি কবিতার নাম "পদ্ম"। সুর করে পড়তে হয়।

"পদ্ম"কে উদ্দেশ করে কবি যা বলেছেন তাতেও বিধাতার গুণগান। সে বিধাতাও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ঈশ্বর। মধুসূদন ভক্তকবি হলেও রাম কিংবা কৃষ্ণ, জগন্নাথ কিংবা লোকনাথ, চণ্ডী কিংবা সারলার নাম মুখে আনবেন না। তাহলে কেমন করে জনপ্রিয় হবেন ? পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাঁর যে সব বই সেগুলি লোকে পয়সা খরচ করে কিনবে কেন ? এখন মধুসূদন গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য।

ওদিকে ভক্তকবির শতবার্ষিকীও করা সম্ভব হল না—টাকা উঠল না। উৎসাহী কর্মীদেরও অভাব। এই কবির কাছে উৎকলের কে না ঋণী ! লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে ছেলেবেলায় এঁর লেখা পড়ে মানুষ হতে হয়েছে। "বর্ণবোধ" পড়ে অক্ষরপরিচয় হয়েছে কোটি কোটি উৎকল সন্তানের।

তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা ও আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রবধূ পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবী পিতার জীবনকাহিনী "ভক্তকবি মধুসূদন ও উৎকলে নবযুগ" নাম দিয়ে বঙ্গভাষায় লিখেছেন। তাঁর শ্বশুর প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" তাঁর আদর্শ। তৎকালীন উৎকল সমাজেরও বিবরণ দিয়েছেন তিনি। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবীর বয়স বিরাশী (৮২) বৎসর পূর্ণ হয়েছে। তৎকালীন উৎকল সমাজের সঙ্গে পরিচয় তাঁর মত কয়জনেরই বা আছে? এই কাজটি তিনি না করলে আর কেই বা করতেন? তৎকালীন উৎকল সমাজের সঙ্গে সমসাময়িক ব্রাহ্মসমাজও যুক্ত ছিল। বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী তখনকার দিনে ওড়িশায় অবস্থান করতেন। আর ব্রাহ্মসমাজেরও একটি কেন্দ্র ছিল সেখানে। এই গ্রন্থে বঙ্গ সমাজেরও একটা দিক আলোচিত হয়েছে।

আধুনিক উৎকল সাহিত্যের ত্রিরত্ন রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও এবং ফকিরমোহন সেনাপতি। গল্পে উপন্যাসে ফকিরমোহন অদ্বিতীয়। কাব্যে রাধানাথেরই শিরে শিরোপা। মধুসূদনের গৌরব তাহলে কোনখানে? মধুসূদন ছিলেন ঋষি কবি। মৃত্যুঞ্জয় রথ মহাশয়ের ভাষায় "ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন"। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

সাধারণতঃ দেখা যায়, সাহিত্যে একজন বড় হলে আরেক জন তাঁর প্রতি হিংসায় জর্জর হন। বন্ধু হয়ে থাকলে তাঁদের বন্ধুতায় ভাঙ্গন ধরে। এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা যে মধুসূদন ছিলেন রাধানাথ ও ফকিরমোহন উভয়েরই পরম প্রিয়। রাধানাথের পুত্র সুলেখক শশীভূষণের ডাক নাম ছিল মধু। এই সাহিত্যিক সৌহার্দ ব্যক্তিগত মাধুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধুসূদন ছিলেন মধুর স্বভাবের মানুষ।

ওড়িশা যদিও প্রতিবেশী রাজ্য তাহলেও তার ইতিহাস সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সুবিদিত নয়। ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনার ভার শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবী অর্পণ করেছেন শ্রীমান্ দিলীপকুমার বিশ্বাসের উপর। এই যুবক অধ্যাপক ইতিমধ্যেই গবেষণা কার্যে সুনাম অর্জন করেছেন। এর মাতামহ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ "উৎকল সাহিত্য" পত্রের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সম্পাদক, ওড়িয়া গদ্য সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ কর মহাশয়। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

ভূমিকা

শ্রীমান দিলীপকুমার যা লিখেছেন, তার উপর আমি এইটুকু যোগ করতে চাই যে, আমার জন্মস্থান ঢেঙ্কানালেও একটি ব্রাহ্ম উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেও একটি উপাসক মণ্ডলী ছিল। এই রকম অনেক জায়গায় পরে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ও প্রভাব কমে যায়। তাই আমার জন্মস্থানের ব্রাহ্ম উপাসনাগৃহ হয় সংস্কৃত টোল।

ঢেঙ্কানালে আমার বাল্যকালে আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়কে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের সাহিত্যালাপ অনেক রাত্রে শুনেছি; কপিলাস পাহাড়ে রাজার বাংলোয় ঢালা বিছানায় শুয়ে। কুমুদবাবুর ভ্রাতা স্বনামধন্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন তখন কটকে পড়তেন। প্রিয়রঞ্জনদা এই গ্রন্থে অংশ নিয়েছেন এটি আমার কাছে বিশেষ আনন্দের বিষয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

নিবেদন।

আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের একখানি উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয়, ইহাই আমার চিরকালের আকাঙ্ক্ষা। আমার ভক্তিভাজন শ্বশুরদেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত "রামতনু লাহিড়ীও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে যেভাবে বঙ্গদেশের তৎকালীন অবস্থা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি দেশের সকল বিষয়ের সংস্কার ও অগ্রগতির ভিতর দিয়া তৎকালীন নেতৃবর্গের জীবনচরিত ও অবদানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সেই আদর্শে উৎকলের তৎকালীন অবস্থার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয়—ভক্তকবি মধুসূদনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া। ওড়িষ্যার তৎকালীন নেতৃগণের প্রকৃত অবদানের বিবরণ লিখিত হইলে তাহা সত্যই দেশের একটি অমূল্য গ্রন্থ হইতে পারিত। 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক, ভক্তকবির শিষ্য, আমাদের ভক্তিভাজন বিশ্বনাথ করকে আমি এ বিষয়ে কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনিও ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি নানাপ্রকার সংগ্রামে বিব্রত হইয়া পড়ায় ও অকস্মাৎ পরলোক গমন করায় ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

পিতৃদেবের সুযোগ্য ছাত্র, ওড়িষ্যার উদীয়মান বিশিষ্ট লেখক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথও ভক্তকবির জীবনী লিখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া, ভক্তকবির জীবিত অবস্থায় তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে অনেক বিষয় জানিয়াছিলেন। অবশেষে ভক্তকবির মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট হইতে ডায়েরী ও অনেক প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র লইয়া সেই সকল অবলম্বনে "ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন" নামে একটি জীবনী ধারাবাহিক ভাবে "উৎকল সাহিত্যে" চৌদ্দটি সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ঐ লেখাটি সুসংস্কৃত করিয়া ও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন এই সংকল্প তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার গ্রামে বাসকালে অকস্মাৎ কালরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোক গমন করায় এই জীবনচরিত আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মধুসূদনের ডায়েরী ও চিঠিপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রামের বাড়ী হইতে তখন

PRESENTED

আনা হয় নাই। অনবধানতা বশতঃ সেগুলি হারাইয়া গিয়াছে, এইরূপ শুনিয়াছি।

আমার ভক্তিভাজন ছোটকাকা রায়সাহেব রঘুনাথ রাও—যাঁহার এই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অসাধারণ ভক্তি নিয়ত তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণে চালিত করিত, অর্ধশতাব্দী কাল যিনি উৎকলের সর্ববিধ উন্নতি-জনক কার্যে সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছিলেন, পরিবারের ও দেশের বহু ঘটনা যাঁহার জানা ছিল—তিনিও এগার বৎসর পূর্বে (২৩। ।৫২) পরলোক গমন করিয়াছেন।

কবি রাধানাথ রায়ের আত্মজ ওড়িয়া ভাষায় সুলেখক শশিভূষণ রায় যিনি মধুসূদনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন ও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উৎকল সাহিত্যে বহুবার লিখিয়াছেন, তিনিও কয়েক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাবার জীবনকথা ভালভাবে জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করাতে বাবার মৃত্যুর বৎসর খানেক পূর্বে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "অনেকের অজ্ঞাত অথচ জ্ঞেয় কথা তোমাকে বলিব"—তাহাও হয় নাই।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ হইল। আমি পিতৃদেবের উল্লেখযোগ্য জীবনীর অভাব সর্বদাই অনুভব করিয়াছি, কিন্তু নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা ভাবিয়া একার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সংকুচিত হইয়াছিলাম। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কটকে মধুসূদনের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব, তাঁহার পরিবার ও উৎকল ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পালিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাসগুপ্ত এই উপলক্ষে কটকে গিয়া তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে ও মধুসূদনের পরিবারে উপাসনা ও কবির জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। আমিও এই উপলক্ষে কটকে গিয়া মধুসূদনের সমাধি-ক্ষেত্রে ও কোন কোন ব্রাহ্ম এবং আত্মীয়দিগের গৃহে উপাসনা ও ভক্তকবির জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনা করি।

ওড়িশার জনসাধারণ কর্তৃক এই শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে ; এবং সভায় পিতৃস্মৃতি পাঠের জন্য আমার নিকট অনুরোধ পত্র আসে। আমি একটি রচনা ওড়িয়া ভাষায় লিখিয়া যথাসময়ে পাঠাইয়া

নিবেদন।

আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের একখানি উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয়, ইহাই আমার চিরকালের আকাঙ্ক্ষা। আমার ভক্তিভাজন শ্বশুরদেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত "রামতনু লাহিড়ীও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে যেভাবে বঙ্গদেশের তৎকালীন অবস্থা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি দেশের সকল বিষয়ের সংস্কার ও অগ্রগতির ভিতর দিয়া তৎকালীন নেতৃবর্গের জীবনচরিত ও অবদানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সেই আদর্শে উৎকলের তৎকালীন অবস্থার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয়—ভক্তকবি মধুসূদনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া। ওড়িষ্যার তৎকালীন নেতৃগণের প্রকৃত অবদানের বিবরণ লিখিত হইলে তাহা সত্যই দেশের একটি অমূল্য গ্রন্থ হইতে পারিত। 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক, ভক্তকবির শিষ্য, আমাদের ভক্তিভাজন বিশ্বনাথ করকে আমি এ বিষয়ে কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনিও ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি নানাপ্রকার সংগ্রামে বিব্রত হইয়া পড়ায় ও অকস্মাৎ পরলোক গমন করায় ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

পিতৃদেবের সুযোগ্য ছাত্র, ওড়িষ্যার উদীয়মান বিশিষ্ট লেখক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথও ভক্তকবির জীবনী লিখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া, ভক্তকবির জীবিত অবস্থায় তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে অনেক বিষয় জানিয়াছিলেন। অবশেষে ভক্তকবির মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট হইতে ডায়েরী ও অনেক প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র লইয়া সেই সকল অবলম্বনে "ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন" নামে একটি জীবনী ধারাবাহিক ভাবে "উৎকল সাহিত্যে" চৌদ্দটি সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ঐ লেখাটি সুসংস্কৃত করিয়া ও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন এই সংকল্প তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার গ্রামে বাসকালে অকস্মাৎ কালরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোক গমন করায় এই জীবনচরিত আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মধুসূদনের ডায়েরী ও চিঠিপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রামের বাড়ী হইতে তখন

PRESENTED

আনা হয় নাই। অনবধানতা বশতঃ সেগুলি হারাইয়া গিয়াছে, এইরূপ শুনিয়াছি।

আমার ভক্তিভাজন ছোটকাকা রায়সাহেব রঘুনাথ রাও—যাঁহার এই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অসাধারণ ভক্তি নিয়ত তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণে চালিত করিত, অর্ধশতাব্দী কাল যিনি উৎকলের সর্ববিধ উন্নতি-জনক কার্যে সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছিলেন, পরিবারের ও দেশের বহু ঘটনা যাঁহার জানা ছিল—তিনিও এগার বৎসর পূর্বে (২৩। ।৫২) পরলোক গমন করিয়াছেন।

কবি রাধানাথ রায়ের আত্মজ ওড়িয়া ভাষায় সুলেখক শশিভূষণ রায় যিনি মধুসূদনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন ও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উৎকল সাহিত্যে বহুবার লিখিয়াছেন, তিনিও কয়েক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাবার জীবনকথা ভালভাবে জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করাতে বাবার মৃত্যুর বৎসর খানেক পূর্বে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "অনেকের অজ্ঞাত অথচ জ্ঞেয় কথা তোমাকে বলিব"—তাহাও হয় নাই।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ হইল। আমি পিতৃদেবের উল্লেখযোগ্য জীবনীর অভাব সর্বদাই অনুভব করিয়াছি, কিন্তু নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা ভাবিয়া একার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সংকুচিত হইয়াছিলাম। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কটকে মধুসূদনের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব, তাঁহার পরিবার ও উৎকল ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পালিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাসগুপ্ত এই উপলক্ষে কটকে গিয়া তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে ও মধুসূদনের পরিবারে উপাসনা ও কবির জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। আমিও এই উপলক্ষে কটকে গিয়া মধুসূদনের সমাধি-ক্ষেত্রে ও কোন কোন ব্রাহ্ম এবং আত্মীয়দিগের গৃহে উপাসনা ও ভক্তকবির জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনা করি।

ওড়িশার জনসাধারণ কর্তৃক এই শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে; এবং সভায় পিতৃস্মৃতি পাঠের জন্য আমার নিকট অনুরোধ পত্র আসে। আমি একটি রচনা ওড়িয়া ভাষায় লিখিয়া যথাসময়ে পাঠাইয়া

দিই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসভা আহূত হয় নাই। কয়েক মাস পরে আমি ঐ ওড়িয়া লেখাটি ফিরাইয়া আনি। পরে এক সময় "কথা-শিল্প" পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তীর অনুরোধে আমার লেখা ওড়িয়া পিতৃস্মৃতির বঙ্গানুবাদ করি ও তাহা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে কথাশিল্প পত্রিকার কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং উহা অনেকের নিকট প্রশংসিত হয়। শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তী আমার এই লেখাটি কোনও কোনও সুলেখক দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন।

পিতৃদেবের লিখিত 'ঋষি-চিত্র' কবিতা ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বাংলা নব্য ভারত পত্রিকার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; তার পরেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত "সাধনা" পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংখ্যায় ইহার অনুকূল সমালোচনা বাহির হয়। এই নব্যভারত ও সাধনা হইতে উক্ত কবিতা ও তাহার সমালোচনা আমার অনুরোধে শ্রীমান যোগেশচন্দ্র বাগল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে অনেক যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করিয়া দেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। ইহার পর আমি পিতৃদেবের লিখিত চিঠিপত্র প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে শারদীয় যুগান্তরে প্রকাশ করিয়াছি; ও এই 'ঋষি-চিত্র' কবিতার বিষয় ও পিতৃ-প্রসঙ্গ যুগান্তরে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়াছি। বঙ্গদেশে ইহা বেশ আদৃত হইয়াছে দেখিয়া পিতৃদেবের জীবন চরিতটি লিখিবার জন্য আমার আগ্রহ বাড়িতে থাকে। পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী ওড়িয়াতেই লেখা, ওড়িষ্যাবাসী তাঁহাকে ভক্তকবি নাম দিয়াছে। আমার স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইয়াছিল, জীবনচরিতটি ওড়িয়া ভাষাতেই লিখি, সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কারণ ওড়িয়া আমারও মাতৃভাষা; সে ভাষায় লিখিতে আমার কোন অসুবিধা হইবার কথা নয়। কিন্তু আমি দূরে থাকি, কটক হইতে আশানুরূপ আনুকূল্য না পাইলে, ওড়িয়া ভাষায় জীবনীটি লেখা ও প্রকাশ করা সম্ভব নয় দেখিয়া সে ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়া বাংলাতেই লিখিলাম। বঙ্গদেশে আমি আশাতিরিক্ত উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছি। বঙ্গের বিশিষ্ট মাসিক পত্র 'বসুধারা'র সম্পাদক, (অধুনা স্বর্গত) শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় পিতৃদেবের জীবন চরিতখানির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে উহা ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-সংখ্যা বসুধারায় উক্ত জীবন-

চরিতের প্রথমাংশ বাহির হইবার পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সাতটি সংখ্যায় এই জীবনচরিতের বহুলাংশ প্রকাশিত হয়। এজন্য আমি শ্রদ্ধেয় সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বসুধারার পরিচালকবর্গের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

পিতৃদেবের জীবন কথা আমার বড়ই প্রিয়। আমার স্মৃতিতে তাঁহার বহু কথা উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত আছে। তাঁহার চিঠিপত্র আমি সযত্নে রাখিয়া আসিয়াছি ও মধ্যে মধ্যে পাঠ করি। আমার দিদি বাসন্তী দেবীর নিকটও বাবার চিঠিপত্র সযত্নে রক্ষিত ছিল। দাদা ও অন্য ভাইবোনদের নিকট লিখিত বাবার পত্রও তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই গ্রন্থ রচনায় সেগুলি আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছে। আমার কাকা রায়সাহেব রঘুনাথ রাও মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশীলা মিত্র এই গ্রন্থের প্রণয়নে আমাকে বহু সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। গ্রন্থখানিকে ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশে আমার একান্ত আগ্রহ জানিয়া তিনি ইহার ওড়িয়া অনুবাদের ভার লইয়াছেন।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, মৃত্যুঞ্জয় রথ লিখিত "ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন" হইতে আমি এই জীবনী লিখিবার বহু উপকরণ পাইয়াছি। যে বিষয়গুলি আমার মনে ছিল, মৃত্যুঞ্জয় রথ মহাশয়ের লেখাতে তাহার সায় পাইয়াছি এবং সেই স্মৃতি আরও সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়াছে। সমাজের ও দেশের তৎকালীন অবস্থার কথাও তাঁহার লেখার মধ্যে বহুস্থলে আছে। মধুসূদনের কর্মজীবনের একটি ধারাবাহিক বিবরণও তাঁহার লেখার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। উৎকলের মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য তাঁহার একটি মূল্যবান প্রবন্ধে আছে। উৎকল সাহিত্যের ১৩২৭ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ফকীরমোহন সেনাপতি মহাশয়ের ওড়িয়া আত্মজীবনী ও উৎকল ভ্রমণ প্রভৃতি পুস্তক হইতেও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। ৺রাধানাথ জীবনীতে মধুসূদনের বিষয় আশানুরূপ পাই নাই। সামান্য যাহা পাইয়াছি, তাহা আমার স্মৃতির সহিত মিলাইয়া লইয়াছি।

পারিবারিক জীবন পরিচ্ছেদটি আমার নিজের স্মৃতি, বাবার চিঠিপত্র এবং আমাদের ভাইবোনের স্মৃতির সাহায্যে লিখিত।

"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" আমার আদর্শ হইলেও আমি এই গ্রন্থ রচনায় সে আদর্শ সম্যক্‌রূপে রক্ষা কবিতে পারি নাই। অর্ধশতাব্দ হইল ভক্তকবি পরলোকগমন করিয়াছেন। আমার বয়স এখন ৮২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ৩৪ বৎসর পূর্বে আমি এই রচনা আরম্ভ করিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে, রুগ্ন ভগ্ন দেহে, আত্মীয়-বিয়োগ, রোগ শোক ও নানা প্রকার বাধার মধ্যে ধীরে ধীরে লিখিয়াছি। আমার দৃষ্টি-শক্তি, স্মরণ-শক্তিও ম্লান হইতেছে। কোনও প্রকারে গ্রন্থখানি শেষ করিয়া মুদ্রিত করিলাম। অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল।

উৎকলের নবযুগের নেতাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদিগের অবদানের বিষয় যাহা আমার লিখিবার ইচ্ছা ছিল তাহাও সম্পূর্ণভাবে দিতে পারিলাম না। এ অভাব আমি সর্বদাই অনুভব করি; আমার অক্ষমতার জন্য যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিলাম মাত্র তাহাই দিলাম। ভবিষ্যতে যদি কেহ এই অভাব পূরণের চেষ্টা করেন, বড়ই ভাল হইবে। আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি পরিশিষ্টে দিলাম।

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, ভক্তকবির সাহিত্য সাধনা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ, শ্রীমান দিলীপকুমার বিশ্বাস ওড়িষ্যার ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া, ও আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে, আমার ভক্তিভাজন শ্বশুর মহাশয়ের সেবা করিবার আকুল আগ্রহে আসিয়া দীর্ঘকাল এই পরিবারের নিকট আত্মীয়রূপে কাটাইতেছেন, সেই আমার সোদর-প্রতিম শ্রীমান নগেন্দ্রনাথের এ গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্যের কথা বলিবার উপযুক্ত ভাষা আমার নাই। তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী অকুণ্ঠ সহায়তা ব্যতীত আমার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষাটির এই বাস্তব রূপায়ণ দুরূহ হইত। বহু লাইব্রেরী ঘুরিয়া ওড়িষ্যার ইতিহাসগুলি হইতে বহু পরিশ্রমে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ওড়িষ্যার তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা এবং ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচনায় তিনি আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বহু স্থানে ইহার

PRESENTED

সংশোধন সংযোজন এবং ঘটনাবিন্যাস ছাড়াও মুদ্রণবিষয়ে বহু প্রকার সহায়তা তিনি করিয়াছেন।

সর্বশ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী পূর্ণেন্দুমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রকুমার সরকার এই কার্যে আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মধুসূদন গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমার অনুজ সহোদর প্রশান্ত রাও-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সংস্করণে তাহার উল্লেখ আছে। তৎপরে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভগ্ন হইতেছিল, কিন্তু পিতৃদেবের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছা সে মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত করিত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অকালমৃত্যু হওয়ায়, সে সংকল্প কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আমাদের দিদি বাসন্তী দেবীও (ভক্তকবির প্রথম সন্তান) ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার অন্তর আজ আকুল হইয়া ইঁহাদের শুভ কামনা স্মরণ করিতেছে।

—গ্রন্থকর্ত্রী

১৭।২০৩

বংশাবলী

নাগপুর হইতে এই বংশ—অনুমান ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে—রাজকার্য উপলক্ষ্যে ওড়িষ্যায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার নিকট হইতে সন্ধিসূত্রে ওড়িষ্যা ইংরাজ-শাসনাধীনে আসে। মধুসূদনের পূর্বপুরুষ ভোঁসলার দৌহিত্র বংশ ছিলেন। ওড়িষ্যা ইংরাজ শাসনাধীন হইলে পর বহু মহারাষ্ট্র পরিবার নাগপুরে ফিরিয়া যান। অনুমান মাত্র শতাধিক পরিবার ওড়িষ্যায় রহিয়া যান। অধিকাংশ পুরী ও কটক জেলাবাসী ছিলেন। মধুসূদনের বংশপরিচয় যাহা পাইয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

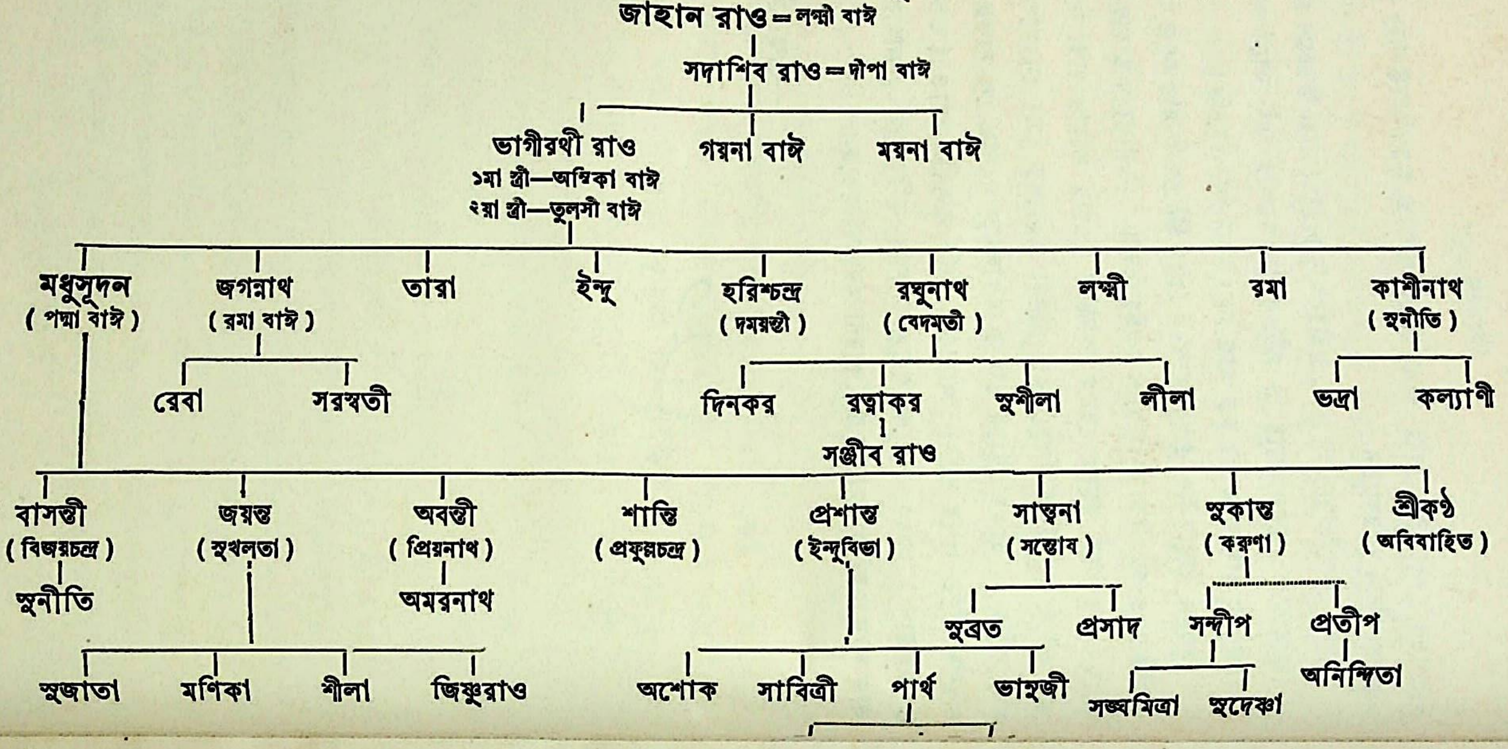

ভ্রম সংশোধন

২১ পৃষ্ঠায় অষ্টম ও নবম পঙ্‌ক্তির সংশোধন সাধারণ মুদ্রাকর প্রমাদ সংক্রান্ত নহে। উহা রচনারই ত্রুটিজনিত বলিয়া সর্বাগ্রে প্রদর্শিত হইল। পাঠকবর্গকে অনুরোধ তাঁহারা যেন অন্তত এই দুইটি সংশোধন যথাস্থানে লিখিয়া লয়েন ঃ—

২১ পৃষ্ঠা	অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে	‘বালিকাদিগের’	স্থলে	‘বালিকাদিগকে’	হইবে
ঐ „	৯ম „	‘শিখিবার পথে সামাজিক বিশেষ অন্তরায় ছিল না’	„	‘শিখিতে কোথাও কোথাও দেখা যাইত’	„
৪ পৃঃ	১০ম „	‘অন্তবর্তী’	„	অন্তর্বর্তী	„
৬ „	২২শ „	‘গ্রীয়াসন’	„	গ্রীয়ার্স্‌ন	„
৮ „	১২শ „	‘মূসলমান’	„	মুসলমান	„
১৬ „	২৫শ „	‘হইাই’	„	ইহাই	„
২০ „	৬ষ্ঠ „	‘আয়ূর্ব্বেদ’	„	আয়ুর্বেদ	„
৩৪ „	৫ম „	‘ব্যাকূল’	„	ব্যাকুল	„
৩৬ „	১৮শ „	‘মঘুস্থদন’	„	মধুসূদন	„
৩৭ „	২য় ও ৫ম „	‘বধু’	„	বধূ	„
৪৩ „	১২শ „	‘পরিদর্শকালে’	„	পরিদর্শনকালে	„
৪৮ „	২৪শ „	‘পুন্তকাবলী’	„	পুস্তকাবলী	„
৫০ „	২৫শ „	‘হইতে’	„	ইহাতে	„
৫১ „	১২শ „	‘সুপরিস্ফুট’	„	সুপরিস্ফুট	„
৬৫ „	৮ম „	‘সরলা দেবী’	„	সরলাদেবীর	„
৭৪ „	শেষ „	‘দেওয়ায়’	„	দেওয়ার	„
৭৫ „	২৫শ „	‘উম্মুখ’	„	উন্মুখ	„
৮১ „	১১শ „	‘বাল্মিকী’	„	বাল্মীকি	„
৮৩ „	২৯শ „	‘স্রগ্‌ধারা’	„	স্রগ্‌ধরা	„

ভ্রম সংশোধন

৯৭ পৃষ্ঠা	১৪শ	পঙ্‌ক্তিতে	'মধূস্থদনের'	স্থলে	মধুস্থদনের	„
৯৮ „	১৫শ	„	'রাণী'	„	রজনী	„
৯৯ „	২য়	„	'সুপরিষ্ফুট'	„	সুপরিস্ফুট	„
১০০ „	১৫শ	„	'পূর্বেই'	„	পরে (১০৩ পৃঃ)	„
১০৪ „	১৪শ	„	'চট্রোপাধ্যায়'	„	চট্টোপাধ্যায়	„
১০৭ „	১৯শ	„	'পুত্রবধু'	„	পুত্রবধূ	„
১৩৭ „	পৃষ্ঠাশীর্ষে		'কর্মজীবন'	„	ধর্মজীবন	„
ঐ „	শেষ	„	'মণ্ড কের'	„	মণ্ডূকের	„
১৩৯ „	পৃষ্ঠাশীর্ষে		'কর্মজীবন'	„	ধর্মজীবন	„
১৪০ „	১৯শ	„	'ছিণ্ণ'	„	ছিন্ন	„
১৪১ „	পৃষ্ঠাশীর্ষে		'কর্মজীবন'	„	ধর্মজীবন	„
ঐ „	১৪শ	„	'ব্রহ্মোপসনার'	„	ব্রহ্মোপাসনার	„
ঐ „	২৬শ	„	'য়ামমোহন'	„	রামমোহন	„
১৪৩ „	পৃষ্ঠাশীর্ষে		'কর্মজীবন	„	ধর্মজীবন	„
১৫৪ „	২৬শ	„	১৮৭০	„	১৮৭৭	„
১৬২ „	২৭শ	„	'আপ্ল ত'	„	আপ্লুত	„
১৭৫ „	পৃষ্ঠাশীর্ষে		'ব্রাহ্মসাজ'	„	ব্রাহ্মসমাজ	„
১৯৯ „	১৬শ	„	'রেজিস্ট্রেশন'	„	রেজিস্টার্ড	„

ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

উৎসর্গ পত্র ।১।

ভূমিকা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ।৩।

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন ।৮।

বংশাবলী ।১৪।

ভ্রম সংশোধন ।১৫।

সূচীপত্র ।১৭।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ঐতিহাসিক পটভূমিকা

লেখক—অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ১—১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জন্ম-শৈশব-কৈশোর ... ... ১১—৩৫

(১) জন্ম, বংশ-পরিচয় ও শৈশব—১১; (২) ওড়িয়্যার তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা—১৫; (৩) শিক্ষারম্ভ—২২, (৪) পুরী জিলাস্কুলে শিক্ষা ও বিবাহ—২৪; (৫) উচ্চতর শিক্ষা—৩১;

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—কর্ম্মজীবন ... ... ৩৬—৫৯

(ক) যাজপুর, বালেশ্বর ও কটকে সহকারী শিক্ষক—৩৬; (খ) কটকে ডেপুটি ইন্‌স্পেকটর—৪০; (গ) রেভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক—৪৪; (ঘ) কটক ট্রেনিং স্কুলে প্রধান শিক্ষক—৪৬; (ঙ) উৎকল সাহিত্য সমাজের উৎপত্তি—৪৯; (চ) 'মহাযাত্রা' আন্দোলন—৫০; (ছ) ওড়িয়্যা বিভাগের জয়েন্ট ইন্‌স্পেক্‌টর—৫৩; 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ ও অবসর প্রাপ্তি—৫৫; (জ) টাউন ভিক্‌টোরিআ হাইস্কুল—৫৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—সাহিত্য সাধনা—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ... ৬০—৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—পারিবারিক জীবন ... ... ৭০—১১৫

(ক) পিতামাতার প্রতি ভক্তি—৭০; (খ) ভ্রাতৃস্নেহ—৭৫; (গ) দাম্পত্য জীবন—৭৬; (ঘ) দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মসূচী—৭৮; (ঙ) সন্তান বাৎসল্য ও সন্তানগণের শিক্ষাব্যবস্থা—৮১; (চ) জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—৮৮; (ছ) গুরুভক্তি ও দেশপ্রেম—৯৭; (জ)

জনসাধারণের প্রতি ব্যবহার—১০১ ; (ঝ) অতিথি সৎকার—১০৩ ; (ঞ) বন্ধুপ্রীতি—১০৪ ; (ট) সন্তান-সন্ততি—১০৮।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—ভক্তকবি ... ... ১১৬—১২৪

রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগ—১২২ ; উৎকলের বাহিরে ভক্তকবির সম্মান—১২৩।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—অন্তিম দশা ... ... ১২৫—১৩৪

(ক) রোগশয্যা—১২৫ ; (খ) অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ—১২৮ ; (গ) 'শ্রাদ্ধ বাসরে'—১৩০।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ধর্মজীবন ... ... ১৩৫—১৫৯

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়—(ক) রাজর্ষি রামমোহন—১৩৭ ; (খ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—১৩৮ ; (গ) ব্রাহ্ম উপাসনা-প্রণালীর ক্রমবিকাশ—১৪৩ ; (ঘ) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—১৪৬ ; (ঙ) শিবনাথ শাস্ত্রী—১৫১ ; মধুসূদনের ধর্মজীবন—১৫৮।

মধুসূদনের হস্তাক্ষরের প্রতিচ্ছবি ১৬০

বার্ষিক শ্রাদ্ধ বাসরে বিজয়চন্দ্রের নিবেদন ... ১৬১

দাদামশায়ের কথা—দৌহিত্রী শ্রীসুনীতি দেবী ... ১৬২

পরিশিষ্ট ... ... ১৬৫—২২৩

ওড়িষ্যায় ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কাজ ১৬৭—২০০

১। উৎকল ব্রাহ্মসমাজ ১৬৮—১৮৭

(ক) প্রতিষ্ঠাতা—অধ্যাপক হরনাথ ভট্টাচার্য—১৬৮ ; (খ) প্যারীমোহন আচার্য—১৬৯ ; (গ) বিশ্বনাথ কর—১৭৬ ; (ঘ) রামকৃষ্ণ রাও—১৭৮ ; (ঙ) সাধুচরণ রায়—১৭৯ ; (চ) রঘুনাথ সিংহ—১৮০ ; উঃ ব্রাঃ সমাজের কর্মকর্তৃগণ—১৮২ ; বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগাযোগ—১৮৩ ; বাঙালী ব্রাহ্মগণের সহিত উঃ ব্রাঃ সমাজের যোগাযোগ—১৮৩।

২। বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮—১৯৪

ঈশানচন্দ্র বসু, ফকিরমোহন সেনাপতি, গোবিন্দ পট্টনায়ক, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র দাস—১৮৮ ; জগবন্ধু ঘোষ, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, নীলমণি কোঁয়ার—১৮৯ ; দ্বিজদাস দত্ত, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—১৯০ ; কালিন্দী কামিলার আশ্চর্যজনক পরিবর্তন—১৯১ ; সাধু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,

পণ্ডিত পদ্মলোচন দাস, রমানাথ দাস—১৯২; ভাই বিহারীলাল সেন, প্রসন্নকুমার মিত্র, বরদাকান্ত বর্ধন, শ্যামসুন্দর বিশাল, উদয়চন্দ্র দে, বৈকুণ্ঠনাথ দাস—১৯৩; বালেশ্বরে ৭১-তম ব্রাহ্ম সম্মিলনী—১৯৪।

৩। বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ) ব্রাহ্মসমাজ ১৯৪—১৯৭

সাধু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৪; মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব ও মহারাণী সুচারু দেবী—১৯৫; ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক—১৯৫; নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৬; গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা—১৯৬।

৪। গঞ্জাম ব্রাহ্মসমাজ ১৯৭—১৯৮

ডক্টর হেমচন্দ্র সরকার, আর. বালকৃষ্ণ রাও, এম. জগন্নাথ রাও, জয়মঙ্গল রথ, কৃপাসিন্ধু পাণ্ডা, সন্নেইয়া পান্তলু, ডাক্তার শ্রীউদ্ধবচরণ, প্রভৃতি—১৯৭।

৫। পুরী ব্রাহ্মসমাজ ১৯৮—২০০

বি. সি. সেন, আই-সি-এস, মিঃ এন সেনাপতি, আই-সি-এস, লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়ক, ডাঃ যামিনী সেন, মিসেস কামিনী রায়, ডাঃ শ্রীদিনকর রাও, প্রভৃতি উদ্যোক্তৃগণ— ৯৯; ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, ডাঃ ডি. এন. ব্যানার্জি ও প্রেমাশ্রম—১৯৯।

চট্টোপাধ্যায়—ভগবতীচরণ ও বিপ্রচরণ ২০০

দত্ত—শশিভূষণ ও পার্বতীচরণ ২০১

রায় বাহাদুর নন্দকিশোর দাস—শ্রীনিকুঞ্জকিশোর দাস ২০৬

মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে ও জগমোহন লাল ... ২০৮

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—শ্রীমতী শান্তা নাগ ২১০

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী—শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায় চৌধুরী ... ২১৫

পরিসমাপ্তি ২২২

ছবির নির্ঘণ্ট :—(১) ভক্তকবি মধুসূদন রাও—গ্রন্থারম্ভে

(২, ৩) ভাগীরথী রাও ও জগন্নাথ রাও—১২ পৃঃ

(৪—৬) ফকিরমোহন, রাধানাথ ও বিজয়চন্দ্র—৩৮ পৃঃ

(৭, ৮) পদ্মাবাঈ ও রামকৃষ্ণ রাও—৭৮ পৃঃ

(৯,১০) হরনাথ ভট্টাচার্য ও রঘুনাথ রাও—১৬৮ পৃঃ

(১১,১২) বিশ্বনাথ কর ও সাধুচরণ রায়—১৭৮ পৃঃ

PRESENTED

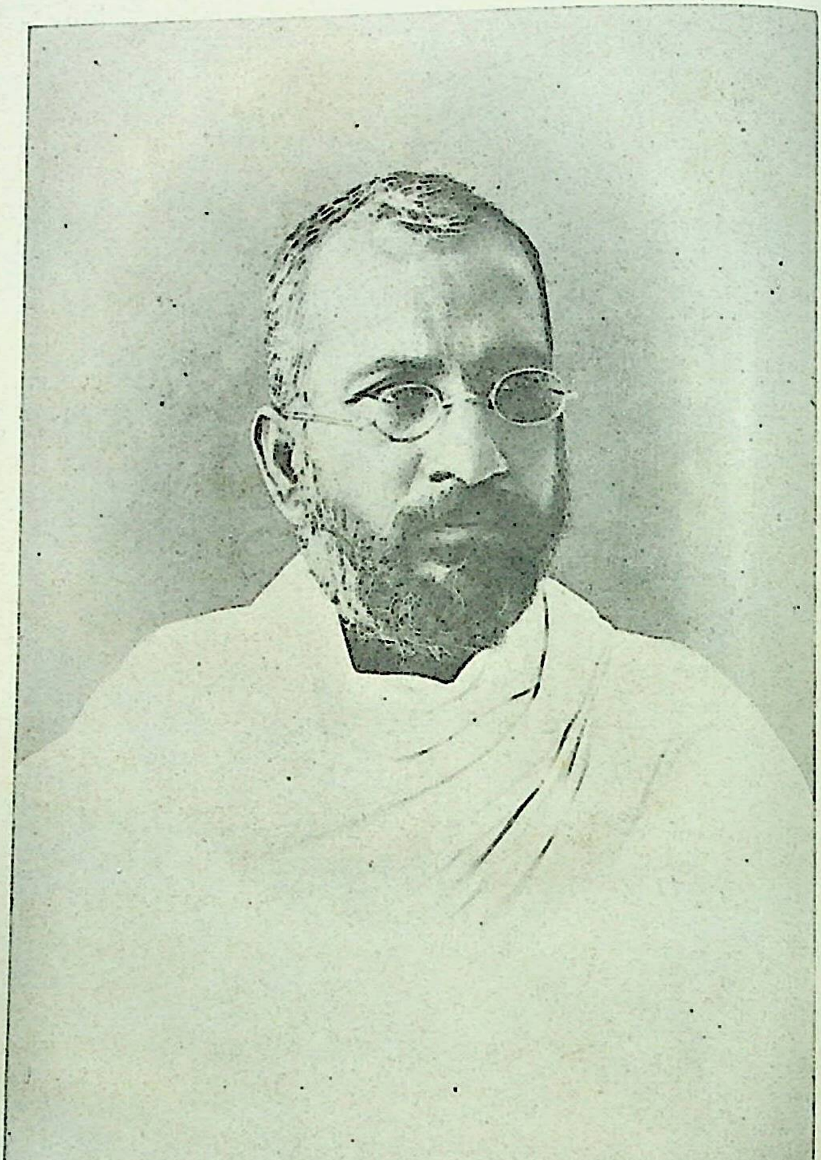

ভক্তকবি মধুসূদন রাও (রায় বাহাদুর)

জন্ম—১৫ মাঘ, ১৭৭৪ শকাব্দ (ইং ২৯ জানুআরি, ১৮৫৩)

মৃত্যু—২৮ ডিসেম্বর, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ গ্রন্থারম্ভে

ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

(শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস)

পূর্বভারতের পক্ষে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতক এক স্মরণীয় কাল। প্রতীচ্য শিক্ষা এবং উরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শ হেতু ভারতীয় চিত্তে সংস্কার-মুক্তির যে দীপশিখাটি এই শতাব্দীতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে। আজ একথা ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এই প্রভাবের মূল কেন্দ্র ছিল সাধারণ অর্থে বাঙ্‌লা দেশ, এবং বিশেষ অর্থে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং বাঙ্‌লা দেশের প্রধান নগরী, কলিকাতা। বাঙ্‌লা দেশের পূর্বে অবস্থিত আসাম ও পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিবাসী প্রদেশদ্বয় বিহার ও ওড়িষ্যাতেও মুলতঃ বঙ্গদেশ হইতেই ধীরে ধীরে এই নব ভাবধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। আসাম ও বিহারের কথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নহে। কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় ওড়িষ্যার নূতন যুগের সাহিত্যে ভক্তকবি মধুস্থদনের আবির্ভাব এই বঙ্গ-প্রভাবেরই অন্যতম শুভকর নিদর্শন। কোনও সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একথা বলিতেছি না। কেননা ইহা যে যুগের কথা, তখন পর্যন্ত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক চেতনা আমাদের নবগঠিত জাতীয় মনোভাবকে খণ্ডিত করিতে আরম্ভ করে নাই। পরস্পরকে আমরা তখন প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করিতাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, ওড়িষ্যার ও ওড়িয়া সাহিত্যের পূর্বকথিত এই নূতন যুগকে কেবলমাত্র উনবিংশ শতকীয় বঙ্গ-প্রভাব-জাত বলিলে সেই উক্তির মধ্যে গুরুতর অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। বাঙ্‌লা দেশের ন্যায় ওড়িষ্যার ও একটি নিজস্ব অতি প্রাচীন সংস্কৃতি-ধারা আছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে বহু জাতি ও গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে, ব্যবসা বাণিজ্য ধর্মপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ইহার যোগ স্থাপিত হইয়াছে, সমুদ্র-বাণিজ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় উপনিবেশ

স্থাপন প্রভৃতি কার্যে ওড়িষ্যার প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ অগ্রণী হইয়া বৈদেশিক প্রভাবের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন; মধ্যযুগের আফগান, মুঘল ও মারাঠাগণ কর্তৃক ওড়িষ্যা-বিজয় ও তথায় রাজ্য স্থাপনের ফলে মুসলিম ও মারাঠা শাসন-পদ্ধতি ও দরবারী রীতিনীতির কিছু কিছু, গভীর ও ব্যাপক ভাবে না হইলেও, এই অঞ্চলের কোনও কোনও অংশে বদ্ধমূল হইয়াছে। এক কথায়, ওড়িষ্যার নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারা সুপ্রাচীন, গভীর ও বহু বিচিত্র উপাদানে গঠিত। আধুনিক ওড়িয়া জাতি এই সংস্কৃতি-সম্পদের উত্তরাধিকারী। বহিরাগত বিচিত্র ভাবধারাকে আয়ত্ত ও সমন্বিত করিয়া সংস্কৃতির নব নব পর্ব রচনার কার্যে ওড়িয়াগণ বহুকাল যাবৎ অভ্যস্ত ছিলেন। সেই কারণেই আধুনিক যুগের সূচনায় সম্পূর্ণ গ্রহণশীল মন লইয়া নূতন শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্মুখীন হওয়া ওড়িয়া মনীষিগণের পক্ষে অপ্রত্যাশিত বা কঠিন মনে হয় নাই।

পূর্ব-ভারত প্রথম হইতে বৈদিক আর্য-সভ্যতার কেন্দ্র-বহির্ভূত ছিল বলিয়া এই অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে আর্য-গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে স্বীয়-প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ আর্য ও অনার্য সভ্যতার আদি সংঘাত ও উত্তরকালীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিত্র ওড়িষ্যার ইতিহাসে যেমন জীবন্ত, ভারতের অপরাপর অঞ্চলে অল্পই সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকল-সভ্যতার এই অনার্য ভিত্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আবিষ্কার করা কঠিন নহে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে (১।১।২৫-৩১) কলিঙ্গ অপবিত্র দেশ রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তত্রস্থ অধিবাসিবৃন্দের সংস্পর্শ ঘটিলে আর্য-গোষ্ঠীভুক্ত উচ্চবর্ণজাত ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির একটি শ্লোকের (৩।২৯৩) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা টীকায় নিম্নলিখিত যে দেবল-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও অনুরূপ মনোভাব প্রতিফলিত:

> সিন্ধুসৌবীরসৌরাষ্ট্রাংস্তথা প্রত্যন্তবাসিনঃ।
> অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ গত্বা সংস্কারমর্হতি ॥

মহাভারতপুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঋষি দীর্ঘতমস্ এবং অসুররাজ বলির পত্নী, সুদেষ্ণার মিলনের ফলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ ভ্রাতার জন্ম হইয়াছিল। এই কাহিনী কাল্পনিক হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ কাহিনীকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন, অঙ্গ (পূর্ব-বিহার,—ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং সম্ভবতঃ পূর্ণিয়া

PRESENTED

জিলার কিয়দঞ্চল), বঙ্গ (বাঙ্‌লা দেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও ঢাকা-বিভাগের অধিকাংশ), কলিঙ্গ (বর্তমান ওড়িষ্যার কটক জিলার পূর্বান্তবাহিনী বৈতরণী নদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ), পুণ্ড্র (উত্তর বাঙলার রাজসাহী-বিভাগ) এবং সুহ্ম (পশ্চিম-বাঙ্‌লার বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত হুগলী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) প্রভৃতি ভূভাগের অধিবাসি-বৃন্দের মধ্যে একই উৎপত্তিহেতু সম্ভবতঃ একটি জাতিগত আত্মীয়তা (ethnic kinship) ছিল। অপর দিকে, ব্রাহ্মণ পিতা দীর্ঘতমসের ঔরসে অনার্য অসুর-রমণী সুদেষ্ণার গর্ভে উপরি-উক্ত সন্তানগণের জন্মবৃত্তান্ত হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, আর্য ও অনার্য সভ্যতার যথোচিত মিশ্রণের ফলে ঐতিহাসিক কালে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুলাংশে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, কলিঙ্গ বা ওড়িষ্যার একটি প্রধান ভূভাগের সহিত বাঙ্‌লা-বিহারের যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত যোগ ছিল এবং এই সকল অঞ্চলের সংস্কৃতি যে আর্য-অনার্য মিশ্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, ইহার আভাস প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই আছে।[১] বর্তমান ওড়িষ্যার জনসমষ্টি বিশ্লেষণ করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই প্রদেশের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল বিভিন্ন অনার্য আদিবাসী **'কোম'** দ্বারা অধ্যুষিত। গোঁড়, কোল, জুয়াং, শবর প্রভৃতি উপজাতি আবহমান কাল ওড়িষ্যার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, যদিও তাহার বিবরণ অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। আধুনিক কালে আবিষ্কৃত ওড়িষ্যার প্রাচীন ক্ষোদিত লেখমালায় সময়ে সময়ে এই অনার্য শক্তির গুরুত্ব-পূর্ণ রাষ্ট্র-নৈতিক ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন কনস তাম্রশাসনে তোসলীর অন্তর্ভুক্ত অষ্টাদশ আটবিক রাজ্যের উল্লেখ (তোসল্যাং সাষ্টাদশাটবীরাজ্যায়াম্) বা দেবানন্দদেবের বারিপদা চিত্রশালায় রক্ষিত তাম্রশাসনে জয়ানন্দ কর্তৃক সমগ্র "গোণ্ড্রম" (গোঁড়-উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ?) জয়ের উল্লেখ, ইত্যাদি। এইভাবে স্পষ্টতঃ আর্য-অনার্য মিশ্র উপাদানের ভিত্তিতে ওড়িষ্যার সভ্যতা গঠিত হওয়ায় ওড়িয়া জাতি নানা ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা ও গ্রহণশীলতা গুণদ্বয় অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

১। দীর্ঘতমস্ ও সুদেষ্ণার উপাখ্যান সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, মহাভারত ১।১০৪।৪১-৫৫ ; বায়ুপুরাণ, ৯৯।২৬-৩৪ ; ৬৪-৮৬ ; মৎস্য পুরাণ, ৪৮।৬০-৭৮ ; ভাগবত পুরাণ, ৯।২৩।৫, ইত্যাদি।

ওড়িষ্যার ভৌগোলিক পরিস্থিতিও তাহার জনসন্নিবেশের ন্যায় তাহাকে যুগপৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমানে ওড়িষ্যা বা ওড়িশা বলিতে যে ভূভাগকে বুঝায় প্রাচীন কালে তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বৈতরণী নদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত ভূখণ্ডকে প্রাচীন-কালে কলিঙ্গ নামে অভিহিত করা হইত। রায়পুর বিলাসপুর সম্বলপুর অঞ্চল সমগ্রভাবে সেকালে দক্ষিণ-কোশল নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত পাটনা-সোনপুর অঞ্চল মধ্য যুগ পর্যন্ত এই দক্ষিণ-কোশল দেশের অংশ ছিল। আবার বালেশ্বর জিলা, কটক এবং পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ (মোটামুটি কাঁসাই ও বৈতরণী নদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগ) প্রাচীন কালে উৎকল নামধেয় ছিল। কোনও কোনও পণ্ডিত অনুমান করেন, প্রাচীন উড্র জাতি উৎকলের উত্তরসীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাস করিত। পরবর্তী কালে ক্রমশঃ সমগ্র ওড়িষ্যা অর্থে উৎকল বা উড্র নাম প্রচলিত হইয়াছিল।[২] অতএব দেখা যাইতেছে, ওড়িষ্যার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের তিনটি বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটাইয়াছে। উৎকল দেশের মাধ্যমে বাঙ্‌লার পশ্চিম সীমান্তের সহিত আধুনিক সময়ের ন্যায় প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও ইহার সর্বদা যোগ রক্ষিত হইত। বস্তুতঃ বাঙ্‌লা ও ওড়িষ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা স্থাপন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের ছাত্রগণের পক্ষে অনেক সময়ে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যে দেশের শাসক যখন পরাক্রমশালী হইতেন তখন তিনি প্রতিবেশী রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আপন রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়া লইতেন। এই ভাবে মেদিনীপুর বালেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বহুবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। শাসক-পরিবর্তন এবং অধিবাসিবৃন্দের পরস্পরের মেলামেশা ও যোগাযোগের ফলে এই সকল মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে অনিবার্য রূপেই মিশ্রণ দেখা দিয়াছে। দক্ষিণে কলিঙ্গের মাধ্যমে ওড়িষ্যা দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত গভীর যোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে; তেমনি পশ্চিমে মধ্য-ভারত ও ওড়িষ্যা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে। এতদুপরি বলা যায়, পূর্বে

২। দ্রষ্টব্য—অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার লিখিত "প্রাচীন উড়িষ্যা,"—ইতিহাস,-চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৫০-৫৭।

সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং অধিবাসিবৃন্দের নৌচালনদক্ষতা, বাণিজ্যপ্রীতি ও দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, ওড়িষ্যাকে ব্রহ্মদেশ মালয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত করিয়াছিল। এই ভাবে ভৌগোলিক কারণেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেশের সহিত সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সুযোগ ওড়িষ্যা প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে ওড়িষ্যার দান অসামান্য। এই প্রদেশ বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির লীলাভূমি। বহু প্রাচীন কাল হইতে জৈন ধর্ম এই অঞ্চলে তাহার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কলিঙ্গ-সম্রাট খারবেল স্বয়ং জৈনধর্মাবলম্বী ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জৈনধর্মের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মও ওড়িষ্যার বিভিন্ন অংশে প্রসার লাভ করে এবং ক্রমশঃ এই প্রদেশ মহাযান ও তৎপরবর্তী তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্রহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশস্থল রূপেও ওড়িষ্যা প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ ইহার বিভিন্ন অঞ্চল হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট দেবদেবীর লীলাস্থল ও উপাসনাকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হইয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। কটক জিলার অন্তর্গত যাজপুর ওড়িষ্যার প্রধানতম শক্তিপূজার কেন্দ্র, এবং এইখানকার বিরজা দেবীর মন্দির শক্তিউপাসকগণের নিকট অতি পবিত্র ও মহিমমণ্ডিত স্থান। পুরী জিলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর শিবোপাসকগণের মহাতীর্থ। ওড়িষ্যায় শৈবধর্মের ও শিবোপাসনার ইহা প্রধান কেন্দ্র। অত্রস্থ লিঙ্গরাজ মন্দিরের মাহাত্ম্য সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজে সুবিদিত। শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথক্ষেত্র বা পুরীধামের কথা তো এই প্রসঙ্গে অধিক বলা বাহুল্য। বৈষ্ণব উপাসনার এই সুবিখ্যাত কেন্দ্রটির নাম ও মাহাত্ম্যের সহিত হিন্দুমাত্রেই পরিচিত এবং পুরীধামে উপনীত হইয়া জগন্নাথদর্শন নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেরই জীবনের একটি পরম আকাঙ্ক্ষা। আবার পুরী হইতে কিছু দূরে অবস্থিত সুবিখ্যাত কোণার্ক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ওড়িষ্যার এককালীন সুপ্রসিদ্ধ এবং অধুনা হৃতগৌরব সূর্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে কটক জিলার অন্তর্গত মহাবিনায়ক পর্বত গণেশপূজার অন্যতম কেন্দ্রস্থল বলিয়া

প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।[৩] সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট ওড়িষ্যার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। এই সকল ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া ওড়িষ্যায় যে অপূর্ব স্থাপত্য ভাস্কর্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ওড়িয়া জাতির গভীর রসবোধ ও শিল্পকার্যে বিরাট প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণার্কের মন্দিরে যে স্থাপত্য-মহিমার বিকাশ, এই সকল স্থানে এবং খিচিং ললিতগিরি রত্নগিরি প্রভৃতি কেন্দ্রের ভাস্কর্যের যে সকল উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—সে-সমূহ কেবল ওড়িষ্যার নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ওড়িয়া শিল্পশাস্ত্রিগণ স্থাপত্যশিল্পের যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং বংশপরম্পরায় সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর যত্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে।[৪] ইহা ওড়িয়া শিল্পি-সম্প্রদায়ের প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ওড়িষ্যার অবদান সামান্য নহে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ওড়িয়া ব্রাহ্মণসমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করিয়াছেন। এখনও এই ঐতিহ্যের ধারাচ্ছেদ হয় নাই। পুরী এখনও সংস্কৃতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। মধ্য যুগে এই সংস্কৃতচর্চার বিশেষ ফলস্বরূপ উৎকলের একটি নিজস্ব স্মৃতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। নৃসিংহ বাজপেয়িকৃত নিত্যাচারপ্রদীপ, বিদ্যাকর বাজপেয়ি-রচিত নিত্যাচারপদ্ধতি, মুরারি মিশ্র-প্রণীত প্রায়শ্চিত্তমনোহর, দিব্যসিংহ মহাপাত্র-কৃত শ্রাদ্ধদীপ, গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্র দেব রচিত সরস্বতীবিলাস ও প্রতাপমার্তণ্ড, গদাধর রাজগুরু-কৃত গদাধরপদ্ধতি, প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া বিরাজমান। ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য কম প্রাচীন নহে। সার জর্জ গ্রীয়ার্সন দেখাইয়াছেন খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেই ওড়িয়া ভাষার বিকাশ ও গঠন প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং তদবধি আজ পর্যন্ত তাহার রূপের অধিক পরিবর্তন হয় নাই।[৫] মধ্যযুগের কবিগণের হস্তে এই ভাষায় ধীরে ধীরে একটি

৩। শ্রীহরিদাস মিত্র প্রণীত *Ganapati* (বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত), পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

৪। দ্রষ্টব্য :—নির্মল কুমার বসু-*Canons of Orissan Architecture.*

৫। *Linguistic Survey of India* Vol. V. Part II p. 367.

LIBRARY

উল্লেখযোগ্য কাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠে। সুতরাং আধুনিক যুগের নূতন সাহিত্যিকগণ আপন আপন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি সুগঠিত ভাষা এবং সুপ্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্য যে সম্মুখে পাইয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ওড়িষ্যার রাজবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগে পর পর বহু রাজবংশ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছে এবং অনেক সময়ে এককালীন বিভিন্ন রাজবংশ এই প্রদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডে স্বাধীন ভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। মগধের নন্দ ও মৌর্য রাজবংশদ্বয় এবং স্থানীয় চক্রবর্তীরাজ খারবেলের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তীকালে এই যুগে বিগ্রহ-বংশ, শৈলোদ্ভব বংশ, ভৌমকর বংশ, সোম বংশ, ভঞ্জ বংশ, শুলকি বংশ, গঙ্গ বংশ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ওড়িষ্যায় রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়। এই সকল বংশের রাজত্বকালে ওড়িষ্যায় ব্রহ্মণ্য সভ্যতার ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ধর্মপ্রাণ বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পরিবারসকল ওড়িষ্যায় আসিয়া এবং তত্রস্থ রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া স্থায়ী ভাবে তথায় বসবাস করিতে থাকেন। ওড়িষ্যার প্রাচীন ক্ষোদিত লেখমালায় এই প্রকার বহিরাগত বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের মধ্যে বাঙ্‌লা দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণবংশেরও অভাব ছিল না। অপর পক্ষে ওড়িষ্যার অধিবাসী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ যে প্রাচীন যুগে বাংলা দেশে আসিয়া বসবাস করিতেন, বাঙ্‌লার ক্ষোদিত লিপিতে সে বিষয়ে প্রমাণেরও অভাব নাই।[৬] সুতরাং চৈতন্যযুগের পূর্বেই বাঙ্‌লা-ওড়িষ্যার পারস্পরিক ভাববিনিময় শুরু হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মধ্যযুগের গজপতি রাজগণের রাজত্বকালেই ওড়িষ্যার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির কাঠামোটি গড়িয়া উঠে। এই যুগের বাঙ্‌লা ও ওড়িষ্যার সংস্কৃতিবিনিময়ের ইতিহাসে বৃহত্তম ঘটনা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ওড়িষ্যা পরিদর্শন ও স্থায়িভাবে পুরীধামে বাস। জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর তিনি নীলাচলে অতিবাহিত করেন। তাঁহার প্রভাবে কেবল উৎকলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারই হয় নাই, পুরীতে তাঁহার দীর্ঘ অবস্থিতিকালে ও দেহত্যাগের পরে ওড়িষ্যা, বিশেষতঃ নীলাচল, বাঙালী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

৬। নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ২৪০, ২৭৩

মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর দিব্য জীবন এই দুই প্রদেশের মধ্যে এক মহামিলনের সেতু রচনা করিয়াছে। ওড়িয়া বৈষ্ণব-গণের উপরও তাঁহার জীবন ও শিক্ষার প্রভাব অতি গভীর ভাবে কার্যকর হইয়াছিল।[৭]

আফগানগণ ওড়িষ্যাজয় করিলে হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটে। কিন্তু ওড়িষ্যায় আফগান রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই—ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল-শক্তি কর্তৃক ওড়িষ্যা বিজিত হয়। ঔরংজিবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিলে ক্রমশঃ বাঙ্‌লার নবাব-নাজিমগণ ওড়িষ্যার উপর স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাগপুরের মারাঠা ভোঁস্‌লে রাজগণ কর্তৃক ওড়িষ্যা অধিকৃত হয়। উৎকলে মুসলিম শাসন বঙ্গদেশের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কয়েক শতাব্দীর মুসলমান রাজত্বকালে জনসাধারণের মুষ্টিমেয় অংশই ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্থানীয় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি মধ্যে মধ্যে অনুদার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইহা ওড়িয়া জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠতার নিদর্শন। অপরাপর ক্ষেত্রেও ওড়িয়াগণের জাতীয় জীবনকে উত্তর ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

উৎকলে মারাঠাশাসন কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল (১৭৫১—১৮০৩)। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওড়িষ্যার জাতীয় জীবনে কোনও বিশেষ ছাপ রাখিয়া যাওয়া মারাঠাশক্তির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, এই সময়ে ভারতবর্ষ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহের আবির্ভাব, উত্তরপশ্চিম হইতে বিদেশী আক্রমণ, প্রভৃতি একযোগে অষ্টাদশ শতকে ভারতে এমন এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সেই সময়ে কোনও দেশীয় শক্তির পক্ষে স্থিরতার সহিত রাজ্যশাসন করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন ছিল। ইহার পরে মারাঠা শক্তিপঞ্চকের পরস্পর বুঝাপড়া ও ঐক্যের অভাব মারাঠাশক্তিকে ক্রমশঃ দুর্বল করিয়া ফেলে এবং

৭। প্রভাত মুখোপাধ্যায়—*History of Medieval Vaishnavism in Orissa* (Calcutta, 1940) pp. 128-47

অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষ্যা মারাঠা শক্তির কবল হইতে বৃটিশরাজের অধীনে চলিয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ওড়িষ্যায় স্বল্পকাল স্থায়ী মারাঠা শাসনের প্রচুর নিন্দাবাদ করিয়াছেন।[৮] দেশীয় গবেষকগণ সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই, কেহ কেহ মারাঠাশাসনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।[৯] এই বিতর্ক বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। মারাঠা-শাসন-কালের দুইটি বিশেষত্ব মনে রাখিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। হিন্দু মারাঠা-শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ওড়িয়া জাতি পুনরায় ধর্মকর্মের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ওড়িষ্যার বিখ্যাত ধর্মস্থান ও মন্দিরগুলি পুনরায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা শাসনের অবসানের পরেও কতকগুলি মারাঠী পরিবার স্থায়ী ভাবে ওড়িষ্যার অধিবাসী হইয়া যান। ইঁহারা ওড়িষ্যার ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লন। এই ওড়িষ্যাবাসী মারাঠী সমাজের মধ্য হইতেই ওড়িষ্যার নবযুগের কবি মধুসূদন রাও আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন ওড়িষ্যায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহার অনতিপরেই ভারতের নবযুগ-প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় আসিয়া কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ কলিকাতা ব্রাহ্মধর্ম ও ইংরাজী শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির সারভাগের সহিত পাশ্চাত্ত্য ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সমন্বিত করিয়া রামমোহন যুগোপযোগী নূতন জীবন-দর্শন গঠন করিলেন। তাঁহার হাত হইতে উত্তরকালে আলোকবর্ত্তিকা গ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ। এই নবজীবন স্রোত বাঙলা-দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া পার্শ্বস্থ প্রদেশগুলিকেও প্লাবিত করিয়াছিল। ইহাতে অবগাহন করিয়াই ওড়িষ্যার সুসন্তান মধুসূদন রাও নবজীবন লাভ

৮। A. Sterling-*Orissa—its Geography, Statistics, History, Religion and Antiquities* (London, 1846) p. 106; W. W. Hunter *Orissa* Vol. II (London, 1872) pp. 31-35.

৯। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—*History of Orissa* Vol. II pp. 246-47; বিপিনবিহারী রায়—*Orissa under Marathas* pp. 160-65

করিয়াছিলেন এবং ইহারই প্রভাবে তাঁহার কবি-প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং বঙ্গদেশের সহিত নিবিড় আত্মীয়তা বাহ্য অনুকরণ মাত্র নহে। তাহার পশ্চাতে ছিল ওড়িষ্যার দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ইহা তাঁহার মনকে সমৃদ্ধ, সহিষ্ণু ও গ্রহণশীল করিয়া না তুলিলে বহিরাগত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রগতির বাণীকে তিনি এমনভাবে স্বাগত জানাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ওড়িষ্যার যে স্বাভাবিক প্রবণতা যুগে যুগে নানা বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, উনবিংশ শতকে ভক্তকবি মধুসূদনের জীবনে নূতনরূপে আমরা তাহারই পরিচয় পাইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১) জন্ম, বংশপরিচয় ও শৈশব

ওড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী-নগরী হিন্দুগণের অন্যতম এক প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত বলিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যও জনসাধারণের নিকট ইহা একটি আকর্ষণের বস্তু। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা মহাপ্রভু জগন্নাথের পীঠস্থানরূপে শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তমপুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিয়া এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন, তখন পুরুষোত্তমপুর বা জগন্নাথদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব তিনি দেখিতে পান নাই। তাঁহার লিখিত এই অঞ্চলের বিবরণের মধ্যে 'চারিত্র' (চৈনিক ভাষায়, চা-লি-তা-লো) বলিয়া একটি সমুদ্রোপকূলবর্তী নগরের উল্লেখ আছে, যেখানে তিনি বহু বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দির, বিহার ইত্যাদির মধ্যে কতকগুলি হিন্দুমন্দিরও দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা যে, এই চারিত্রই পরবর্তী যুগে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পতনের সহিত হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় এবং জগন্নাথ মহাপ্রভুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ফলে, পুরুষোত্তমপুর বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে নীলাচল মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থল বলিয়া সুবিদিত। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বর্ষ প্রধানতঃ এইখানেই অতিবাহিত করেন এবং এখানেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। বলা বাহুল্য, এই নীলাচল পুরুষোত্তমপুর বা পুরীরই অন্যতম নাম। ইংরাজ আমল হইতে এই পুরুষোত্তমপুরই সংক্ষেপতঃ 'পুরী' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এই পুরী নগরীর পথুরিয়াসাহি নামক পল্লীতে মধুসূদন রাও, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তারিখে, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে (১৭৭৪ শকাব্দ, সন ১২৫৯ ১৫ মাঘ) এক মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে—ইঁহারা নাগপুরের ভোঁসলাগণের দৌহিত্র বংশ ছিলেন। মধুসূদনের পিতার নাম ভাগীরথী রাও।

ওড়িষ্যা ব্রিটিশ অধিকারে আসিবার পূর্বে নাগপুরের ভোঁসলাবংশীয় মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্ধশতাব্দী কাল এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে ১৮০৩

খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজ শাসন ওড়িষ্যায় প্রবর্তিত হইল তখন রাজকার্যে নিযুক্ত অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয় নাগপুরে ফিরিয়া গেলেন ; কেবল যাঁহারা জমিদারি ও বসতবাটি প্রভৃতি করিয়া বসবাস করিতেছিলেন ও যাঁহাদের অন্তরে ধর্মপিপাসা বলবতী ছিল এবং শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া জগন্নাথ দর্শন অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন, তাঁহারা—অনুমান শতাধিক পরিবার—ওড়িষ্যায় রহিয়া গেলেন। প্রধানতঃ পুরী ও কটক জেলার শহর ও নিকটবর্তী গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেন। তখন ইঁহারা নিজেদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষাই বলিতেন এবং সাধারণের সহিত হিন্দী ভাষার ব্যবহার করিতেন। পরে ক্রমশঃ ইঁহারা ওড়িয়াকে নিজেদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়া ওড়িষ্যাবাসী বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন।

মধুস্থদনের পিতামহ সদাশিব রাও, মাতামহ ভরতজী প্রভৃতি কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয় সেই সময় পুরী নগরীতে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। সদাশিব রাও অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত এই যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র ভাগীরথী রাও উপার্জনক্ষম হওয়ার পর অমিতব্যয়ী হওয়ায়, তিনি পুত্রের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিলেন। এইভাবে দীর্ঘ দশবৎসর কাল পিতাপুত্রের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর সদাশিব যখন কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি পুত্রের মুখদর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া আত্মীয়বন্ধুগণ পুত্রকে সংবাদ প্রেরণ করিলে, ভাগীরথীও ব্যগ্রচিত্তে কর্মস্থল হইতে ছুটিয়া আসেন। কিন্তু গৃহ হইতে কয়েকগজমাত্র ব্যবধানে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, কোনও প্রতিবেশী উৎকণ্ঠিত সদাশিবকে হঠাৎ "আপ্‌কা বেটা আ গিয়া" বলিয়া ফেলেন। এই কথা শুনিয়াই সদাশিব—"কাঁহা হৈ, কাঁহা হৈ" বলিতে বলিতে গৃহদ্বারে আগত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তখনই টলিয়া পড়েন ও সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। পিতার এই মৃত্যু ভাগীরথী রাও-এর নিকট অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

মধুস্থদনের মাতা—অম্বিকাবাঈ—ভরতজীর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তিনি সুন্দরী, অতি সুশীলা এবং রূপে গুণে সকলের নিকট সমাদৃতা ছিলেন। ইঁহাকে বিবাহ করিবার পর ভাগীরথী রাও-এর সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। ইঁহার কর্মকুশলতার গুণে ভাগীরথীর অল্প আয়ের সংসার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে চলিত, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে এই সুখভোগ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

IBRARY
....
... Ashram
ANARAS

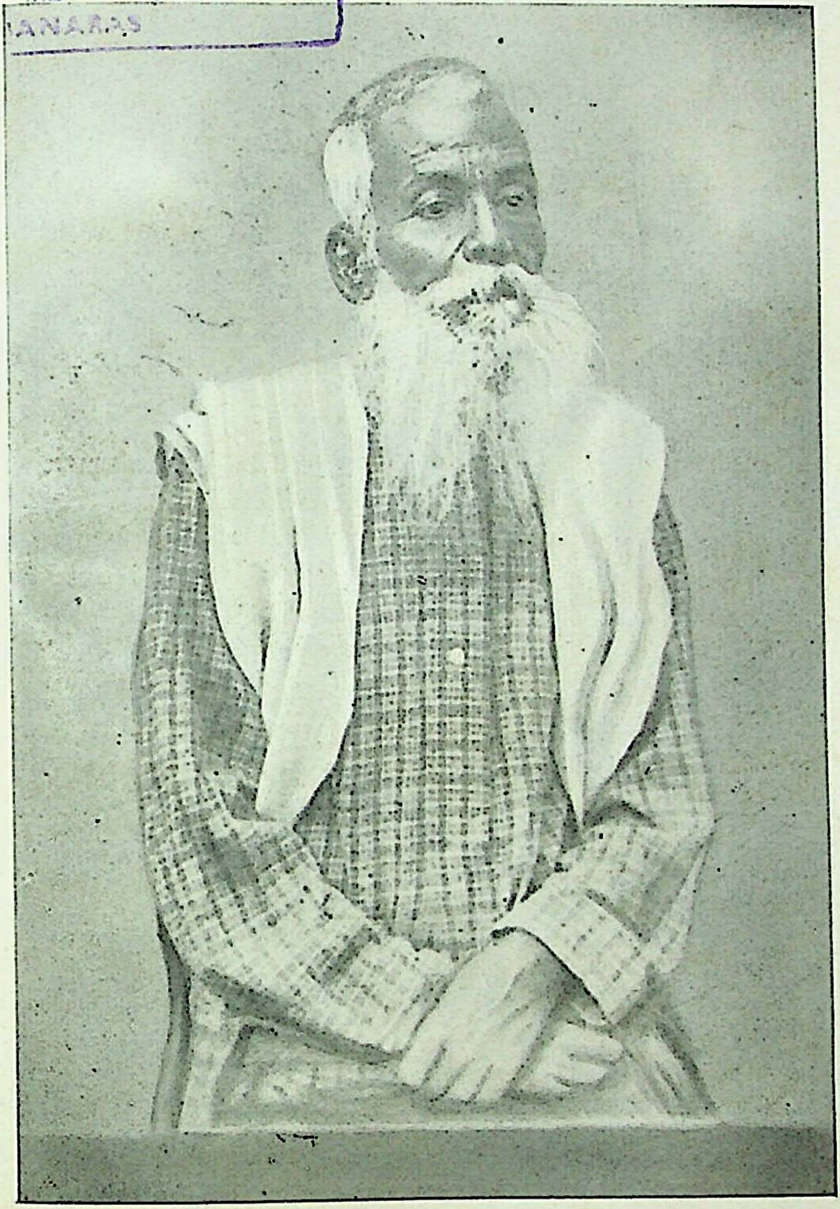

ভক্তকবির পিতা—ভাগীরথী রাও

জন্ম—অনুমান ১২৩৪ সাল (১৮২৭ খৃষ্টাব্দ)

মৃত্যু—৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল (১৯০৯ খৃষ্টাব্দ) ১২ পৃঃ

জগন্নাথ রাও—ভক্তকবির অনুজ সহোদর

জন্ম—৮ শ্রাবণ, ১৭৭৬ শকাব্দ (১৮৫৫ খৃঃ) ; মৃত্যু—৩০ মে, ১৯১৯।

(৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পুরীর তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ড্রামণ্ড সাহেব ভাগীরথীর কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পুরী শহরের নিকটস্থ আঠারোনালা নামক পুলিস-ফাঁড়ির জমাদার পদে নিযুক্ত করেন। জগন্নাথ-যাত্রী-কর সংগ্রহের জন্য তখন এই ফাঁড়িটি নূতন স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা। ইহার কিছুকাল পরে ভাগীরথীর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করেন; মধুময় শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ইঁহার জন্ম হওয়াতে, পিতা এই শিশুর নাম মধুসূদন রাখেন। নবজাত শিশুর অনুপম কান্তি দর্শনে সকলেই মুগ্ধনয়নে চাহিয়া থাকিতেন। স্নেহময়ী জননী পরম স্নেহে ও যত্নে এই শিশুর লালন-পালন করিতে লাগিলেন। আড়াই বৎসর পরে অম্বিকাবাঈ আর-একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। শ্রীক্ষেত্রবাসী পিতা শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রভু জগন্নাথ-দেবের নামানুসারে ইঁহার নাম জগন্নাথ রাখেন। জগন্নাথের আড়াই বৎসর বয়সের সময় অম্বিকাবাঈ একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া নবজাত শিশুসহ সূতিকাগারে পরলোকগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর।

অন্তিমসময়ে এই সতী নারী স্বামীর পাদোদক লইয়া পান করেন ও তৎপরে পুত্রদ্বয়কে নিজবক্ষে গ্রহণ করিয়া, "আমার ধন দুটি তোমার হাতে দিলাম" —অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিয়া শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। শৈশবের এই করুণ দৃশ্যের স্মৃতি মধুসূদনের অন্তরে আজীবন জাগরূক ছিল। তিনি বহু সময়ে সজলনয়নে এই ঘটনার কথা বলিতেন। পরবর্তীকালে 'মো জননী' কবিতার মধ্যে তাঁহার যে মাতৃভক্তির প্রকাশ হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"অতি মলিন মো অঙ্গ ধূলি ধূসরিত হে
পোছিণ শ্রীকরে
মা মোর আনন্দময়ী মধুর বচন কহি
আনন্দে ধরন্তি মোতে অমৃত বক্ষরে হে
অমৃত বক্ষরে।
মাতার অমৃত বক্ষ স্বর্গসুখ জিণি হে
অতি সুখময়;
কাঁহি পটান্তর তার, রাজ্য বিভব কি ছার,
কাঁহি আউ সন্তানর সেপরি আশ্রয় হে
সেপরি আশ্রয়!

* * * *

পাঞ্চ বর্ষ দিনু মুঁহি অটই অনাথ হে
হরাই জননী ;
কিন্তু আহা বিশ্বপতি দয়া বহি দুঃখী প্রতি
দেইছন্তি মোর প্রাণে মহা স্পর্শমণি হে
মহা স্পর্শমণি !
বিশ্বাস পরশ-মণি হৃদয়ে মুঁ ধরি হে
দেখইঁ প্রত্যক্ষে
দিবা নিশি আকাশরে, জলে স্থলে চরাচরে,
মোহরি জননী মূর্তি ধরি মোতে বক্ষে হে
ধরি মোতে বক্ষে।"

পত্নীবিয়োগের পর ভাগীরথী যখন শিশুসন্তান দুইটি লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময় তাঁহার উপর বদলির আদেশ আসিল। যাত্রী-কর-সংগ্রহ প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে, আঠারোনালা ফাঁড়িও উঠিয়া যায় ; সুতরাং ভাগীরথী রাও, 'গোপ' থানার জমাদার পদে নিযুক্ত হইয়া, পুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বর্তমান সময়ে পুলিস বিভাগে সাব-ইনস্পেক্টর নামে যে পদ আছে, তাহা তখন ছিলনা। এই জমাদার পদবিধারী ব্যক্তিগণকে উক্ত কার্য করিতে হইত। লাল পাগড়ি, সবুজ রঙের চাপকান ও তদুপরি কাবা (ব্যাজ) ইঁহাদের পোশাক ছিল। ইঁহারা দারোগা অর্থাৎ আধুনিক ইন্‌স্পেক্টর পদবি-ধারী কর্মচারীর অধীনে কাজ করিতেন।

পুরী ত্যাগ করিবার পূর্বে ভাগীরথী শিশুপুত্র দুইটির প্রতিপালন বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া জ্যেষ্ঠ শ্যালক নারায়ণজীর হস্তে ইঁহাদের ভার অর্পণ করেন। অম্বিকাবাঈও অন্তিমকালে কনিষ্ঠ পুত্রের লালন-পালনের ভার ভ্রাতা নারায়ণজীকে দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং শিশু জগন্নাথ ও মধুসূদন এই মাতুলগৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

গোপে তখন সুবলচন্দ্র বসু নামে একজন দারোগা ছিলেন। ভাগীরথী রাও-এর ধীর স্বভাব, নম্র ব্যবহার ও কার্যকুশলতাগুণে সন্তুষ্ট হইয়া দারোগাবাবু তাঁহাকে বন্ধুভাবে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল। গোপবাসের বৎসরকাল মধ্যেই একদিন রাত্রে ভাগীরথী একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,

LIBRARY
No. ১২।২০৯

স্বর্গগতা পত্নী অম্বিকাবাঈ আসিয়া বলিলেন, "আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান দুইটি তোমার হাতে দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের অযত্ন হইতেছে। তুমি যদি দেখিতে না পার, তবে আমি জগন্নাথকে (দ্বিতীয় পুত্রকে) লইয়া আসিব"।

পুত্রবৎসল ভাগীরথী নিতান্ত কাতর হইয়া কর্মক্ষেত্রের বন্ধু দারোগাবাবুর নিকট বালকবৎ ক্রন্দন করিতে করিতে স্বপ্নবিবরণ তাঁহাকে জানাইয়া, বলিলেন, "আমাকে এখনই পুরী যাইতে হইবে, আমাকে ছুটি দিন।" দারোগা সুবলবাবু সপরিবারে গোপে বাস করিতেন; সুতরাং বন্ধুর এই শিশু দুইটির পালন বিষয়ে ভরসা দিয়া, তাহাদিগকে লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। পুত্রবৎসল ভাগীরথী সেইদিনই পদব্রজে পুরী যাত্রা করেন। তৎকালে পুরী হইতে গোপ যাতায়াতের পথ (৯।১০ ক্রোশ) বর্তমান সময়ের মতো সুগম ছিলনা। গো-যানই একমাত্র অবলম্বন ছিল, কিন্তু পথ দুর্গমই ছিল। সেই দুর্গম পথে শিশুদিগকে, বিশেষতঃ রুগ্ন জগন্নাথকে, গোযানে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইবে বুঝিয়া ভাগীরথী যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই কৌতুককর। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত সে-ঘটনাটির উল্লেখ করা গেল। তিনি প্রথমে দুইটি বড় ঝুড়ি আনিয়া তাহার ভিতর ধান ঢালিয়া সমতল করিয়া দিলেন; তৎপরে কাপড় পাট করিয়া তাহার উপর পাতিয়া শিশু দুইটিকে তাহাতে বসাইলেন। এই দুইটি ঝুড়ি একজন ভারবাহীর স্কন্ধে বাঁকের দুই দিকে ঝুলাইয়া, বাহককে সঙ্গে লইয়া ভাগীরথী পদব্রজে গোপে গমন করিলেন। সেখানে শিশু দুটি পিতার নিকট থাকিয়া যত্নে পালিত হইতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, মাতুল নারায়ণজীর পত্নী তখন কিশোরী বধূ মাত্র, নিজে সন্তানের জননী হন নাই। এই পরিবারে বয়স্কা গৃহিণীও তখন অন্য কেহ ছিলেন না। সুতরাং কিশোরী মাতুলানীর শিশুসন্তান পালনের অনভিজ্ঞতার জন্য শিশু জগন্নাথের সমুচিত যত্নের অভাবে প্রকৃতই স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল।

(২) ওড়িয্যার তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি আরগাঁওয়ের যুদ্ধে নাগপুরের ভোঁসলাকে পরাজিত করিয়া, দেওগাঁয়ের সন্ধিসূত্রে ভোঁসলার নিকট হইতে ওড়িষ্যা ও বেরারের অধিকার লাভ করেন। ও'ম্যালি-সাহেব তাঁহার ডিস্ট্রিক্ট

গেজেটীয়ারে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ওড়িষ্যার সমস্ত আফিস-আদালতের কাজ ফার্সি ভাষায় নির্বাহিত হইত। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসক আদেশ জারি করেন যে, সাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য সমস্ত ইস্তাহার বা বিজ্ঞাপনে ফার্সি ভাষার সহিত ওড়িয়া ভাষাও ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার ফলে ওড়িয়া-লিখন-পঠনক্ষম মুহুরী নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কটকের ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, তখনও পর্যন্ত সরকারি কার্যে সাধারণ মুহুরীর কাজ চালাইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ওড়িয়া একজনও ছিলনা। ওড়িষ্যার অধিবাসী বাঙালী ও মুসলমান কর্মচারীদের সাহায্যে ঐ সময়ে সরকারি দপ্তরখানার কার্য নির্বাহিত হইতেছিল।

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিতেছেন—"ওড়িষ্যার একগুঁয়ে গোঁড়ামির নিকট খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের ও ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত উন্নতি-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই-একটি মিশনারী কেন্দ্র ছাড়া ওড়িষ্যায় উল্লেখযোগ্য কোনো বিদ্যালয় ছিল না। সমগ্র প্রদেশের ২৫ লক্ষ অধিবাসী তখন দারুণ কুসংস্কার ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত। ক্বচিৎ কোথায়ও কোনো জমিদারের আশ্রয়ে দুই-একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কয়েকজন ছাত্রকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন দেখা যাইত; এবং বড় বড় গ্রামে উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষচ্ছায়ায় গ্রাম্য 'অবধান' (অর্থাৎ গুরুমহাশয়) কয়েকজন ছাত্রকে সুর করিয়া নামতা ইত্যাদি শিখাইতে বা ধুলিতে অ, আ, ক, খ লিখাইতে ব্যাপৃত আছেন—দেখা যাইত। যে-কেহ তালপত্রে দুই ছত্র লিখিতে পারিত, সে-ই তখন মস্ত বিদ্বান বলিয়া সমাদৃত হইত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকার প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পুরী নগরীতে একটি ইংরাজী ও একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু স্থানীয় অজ্ঞানতা ও ধর্মান্ধতার বন্যায় সরকারী প্রচেষ্টা ভাসিয়া গেল; বিদ্যালয় চলিল না। তৎপরে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কটকে প্রথম উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইল; বহু বাধা-বিঘ্ন কাটাইয়া এই বিদ্যালয় টিকিয়া গেল, এবং বহুকাল পর্যন্ত ইহাই ওড়িষ্যার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিরাজমান রহিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি ওড়িয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐরূপ আর-একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর ও পুরীতে একটি করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড সাহেবের (বিলাতের বোর্ড-অব-কণ্টোলের সভাপতি) বিখ্যাত ডেস্‌প্যাচ বা

কম্পানির সরকারের নিকট প্রেরিত শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশপত্র ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারে এক নবযুগ আনয়ন করে। তৎসত্ত্বেও ওড়িষ্যায় পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা অতি ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৯ অব্দের মধ্যে ওড়িষ্যায় ঊনত্রিশটি প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে উনিশটি ছিল খোরধা, বাঁকি ও অনগুলের খাসমহল ইলাকায়। প্রকৃত কথা এই যে, সমস্ত ওড়িষ্যাবাসীই বৈদেশিক শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিককালে যে সামান্য উন্নতি দেখা যাইতেছিল, তাহার মূলে ওড়িয়াগণের সাহায্য বিশেষ ছিলনা। তাহার কৃতিত্ব বিশেষতঃ সেইসমস্ত বাঙালীগণেরই প্রাপ্য, যাঁহারা সরকারি কার্য উপলক্ষ্যে ওড়িষ্যায় স্থায়িভাবে বাস করিতেছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ৫৮ জন ওড়িষ্যার ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র দশ জন খাঁটি ওড়িয়া, বাকি ৪৮ জনই ওড়িষ্যার প্রবাসী ছাত্র।”

উপরে হাণ্টার সাহেব তদানীন্তন ওড়িষ্যার শিক্ষাসম্বন্ধীয় দুরবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা সত্য হইলেও, এই বিবরণকে প্রকৃত অবস্থার পরিচয়-জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যায়না। এদেশে তখন ইংরাজ সরকারের অনুমোদিত পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষালয় অতি অল্পসংখ্যক থাকিলেও, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিতান্ত নগণ্য ছিলনা। অবশ্য এই শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চাঙ্গের কিছু না হইলেও, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অনুপযোগী ছিলনা। ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ওড়িষ্যায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা এবং মারাঠাগণের অত্যাচার উৎপীড়ন চলিলেও, গ্রাম্য শিক্ষা-ব্যবস্থা কখনই একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই। জনগণের সাক্ষরতার মান সমগ্র দেশে ব্রিটিশ-আমল অপেক্ষা যে উন্নততর ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, রাজা রামমোহন রায়ের সহকর্মী ও বন্ধু—ইউনিটেরিয়ান প্রচারক উইলিয়ম য়াডাম সাহেবের রিপোর্টের মধ্যে। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট—ভারত-হিতৈষী লর্ড বেণ্টিঙ্কের নির্দেশক্রমে য়াডাম সাহেব বাংলা ও বিহারের কয়েকটি জেলায় অনুসন্ধান কার্য (স্যাম্প্‌ল্ সার্ভে) সমাধা করিয়া ১৮৩৫-১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বাংলা ও বিহারের চার কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ অর্থাৎ প্রতি ৪০০ লোকের জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল—হিন্দুদের সংস্কৃত-মাধ্যম শিক্ষাকেন্দ্র—টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতি, আর

মুসলমানদিগের ছিল—মাদ্রাসা—যেখানে আরবী ও ফার্সীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফার্সী ও উর্দু শিক্ষার জন্য মক্তব এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের শিক্ষার জন্য বিভিন্নপ্রকারের গ্রাম্য পাঠশালা প্রভৃতি। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, পুরাণ, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতির অনুশীলন ও অধ্যাপনা হইত। টোল-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও ছাত্র প্রায়শই ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমানগণের মাদ্রাসার অধ্যাপক অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান হইলেও, ফার্সী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যাপক কখনও কখনও হিন্দুও দেখা যাইত।

য়াডাম সাহেবের উক্ত রিপোর্টটি বঙ্গ-বিহার সম্বন্ধে হইলেও, দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তৎকালে বঙ্গ বিহার ও ওড়িষ্যার বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে হয়না। সুর করিয়া পড়িলেও—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পাঁচালি প্রভৃতি পঠন-ক্ষমতা ওড়িয়া জনসাধারণের মধ্যে খুব ব্যাপক ছিল, এবং ব্রিটিশ সরকারের দপ্তরের কার্যক্রমে ও হিসাব-রক্ষণে অপটু হইলেও, ওড়িয়াগণ দৈনন্দিন বাজার-হিসাব, সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য বা ব্যবসায়িগণের গদির হিসাবপত্রাদি রক্ষণে এবং জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্ম পরিচালনা-বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্যতা রাখিত।

ওড়িষ্যার তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ওড়িয়া কথা-সাহিত্যিক ও আধুনিক ওড়িয়া গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম জন্মদাতা ফকীর-মোহন সেনাপতি স্বীয় 'আত্মজীবন-চরিতে' যে উপভোগ্য বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল (উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) :—

"সেকালে বড় বড় গ্রামে, এবং গ্রামগুলি ছোট হইলে, দুই-তিনটা গ্রামের জন্য এক-একটি পাঠশালা থাকিত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে স্বতন্ত্রভাবেও এক-একজন 'অবধান' অর্থাৎ গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামের পাণ, বাউরী, কণ্ডরা ইত্যাদি অস্পৃশ্য জাতির বালকেরাও উচ্চবর্ণের ছাত্রগণ হইতে কিছু দূরে বসিয়া এই সমস্ত 'চাটশালী' অর্থাৎ পাঠশালায় পড়িতে পারিত। অবধানগণের অধিকাংশ করণ—অর্থাৎ ওড়িষ্যার কায়স্থ-জাতীয়, অল্পসংখ্যক 'মাটি-বংশ ওঝা' ছিলেন। বালেশ্বরবাসী অবধানগণ জাতিতে জ্যোতিষী ছিলেন। সে-যুগে কটক জেলা—বিশেষত উহার অন্তর্গত ঝঙ্কড় পরগনা—হইতে বহু অবধানের আমদানি হইত। ফাল্গুন মাস হইতে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত

অবধান-আমদানির সময় ছিল। এই সময়ে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে কর্মের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বেশভূষা ও সাজ-সরঞ্জাম হইতেই অবধান-কর্মপ্রার্থীদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইত। তাঁহাদের পরিধেয় ছিল—হাঁটুর নীচপর্যন্ত একখানা দেশী ধুতি, মাথায় জড়ানো একটা ময়লা গামছা, কাঁধে একটা দু'পাশে ঝোলানো বোঁচকা, বোঁচকার একদিকে আধসের চাউল ফুটাইবার মতো পিতলের বাসন, ছোট হালকা একটি ঘটি, অন্যদিকে দুই-তিনটা তালপাতার পুঁথির বিড়া এবং একটি আট কি নয়-হাতি কাপড়। ইহাই হইল কর্মপ্রার্থী অবধানের চিহ্ন।

"ইঁহারা যে কেবল কটক পুরী ও বালেশ্বর জেলাতেই চাটশালী স্থাপন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দান করিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে; ইঁহাদের কর্মক্ষেত্র গড়জাতের দেশীয় রাজ্যসমূহে এবং মেদিনীপুর জেলার দাঁতন, পটাশপুর, কাঁথি ও মহিষাদল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল!

"গ্রামস্থ মঠ বা মন্দিরের একপ্রান্তে অথবা গুরুমহাশয়ের নিজ ঘরে, অন্যথা কোনো বৃক্ষতলে বসিয়াই অবধান তাঁহার পাঠশালার কার্য আরম্ভ করিতেন। এই অবধানগণ আদৌ অর্থলোলুপ ছিলেন না। ছাত্রগণের নিকট হইতে তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বেতন পাইতেন না। নিয়মিত ছাত্রবেতনের পরিবর্তে তাঁহারা বিভিন্ন ছাত্রের অবস্থা বুঝিয়া কাহারও নিকট হইতে কয়েক সের চাউল, কাহারও নিকট হইতে বা কয়েকটি নারিকেল, বা কিছুটা ডাল-কলাই, শাক-সব্‌জি, ফল-পাকড় পাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। কখনও কখনও ছুটির দিনে কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র গান গাহিয়া, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অবধানের জন্য চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিত। কোনও ছাত্র নূতন পাঠ আরম্ভ করিবার সময়, অবধানের জন্য একটি 'সিধা' লইয়া আসিত। সিধার উপকরণ ছিল একসের চাল, একটি সুপারি, খানিকটা গুড় ও মুড়কি এবং কয়েকটি ফুল।"

এই সমস্ত গ্রাম্য পাঠশালায় সাধারণত পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইলে বালকগণের বিদ্যারম্ভ হইত না; ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত তাহারা এখানে পড়িতে পারিত। অবশ্য সকল অবধানের বিদ্যা অথবা জ্ঞানবত্তা সমান ছিলনা এবং ছাত্রগণেরও সকলের বিদ্যালাভের জন্য সমান আকাঙ্ক্ষা বা সুযোগও ছিলনা। সুতরাং অধিকাংশ ছাত্রই ৪।৫ বৎসরের মধ্যে যাহা শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যথা, লিখন পঠন ও সাধারণ হিসাব বুঝিবার জন্য যতটা অঙ্কের

প্রয়োজন,—শিখিয়া লইয়া, পাঠশালা ত্যাগ করিত। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই চাটশালীর পাঠ সমাপন করিত।

চাটশালীর পাঠ শেষ করিয়া জ্ঞানপিপাসু মেধাবী ছাত্রগণ উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে বা উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট স্ব স্ব প্রেরণা বা ইচ্ছানুযায়ী ওড়িয়া সাহিত্য অথবা সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কার, স্মৃতি-পুরাণ-জ্যোতিষ বা আয়ুর্বেদ দর্শনাদির চর্চা করিতেন। অবশ্য সে-যুগে ইচ্ছানুরূপ উচ্চ-শিক্ষালাভের উপায় যে খুব সুলভ ছিল, তাহা নহে; কিন্তু অর্থব্যয়ের দিক হইতে আধুনিক কাল অপেক্ষা উহা বহুলাংশে সহজসাধ্য ছিল। কারণ এই সমস্ত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি প্রায়শঃ ধনী বণিকশ্রেণী, জমিদার ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হইত। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র-ভাবেও চতুষ্পাঠী পরিচালনা করিতেন। এই সমস্ত অধ্যাপক বিদ্যাদানের বিনিময়ে ছাত্রের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ তো করিতেনই না, উপরন্তু ছাত্র-দিগকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়া তাহাদের ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। সুতরাং দরিদ্র মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সেই যুগে বর্তমানকালের তুলনায় অভাবনীয়রূপে সুগম ছিল। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করিয়া তাঁহার কৃপা ও আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, ছাত্রের আর দুর্ভাবনার বিশেষ কোনো কারণ থাকিত না। ছাত্রগণ গুরুগৃহে থাকিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা বিদ্যাভাস করিতেন। গুরুর জীবনযাত্রা অতি সহজ সরল ও বিলাসবর্জিত ছিল। ছাত্রদিগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুগৃহে নানাবিধ পরিশ্রম-সাধ্য কাজ করিতে হইলেও, গুরুর সান্নিধ্য ও সস্নেহ সাহায্য লাভ করিয়া তাহারাও গুরুর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হইতে পারিত। সে-যুগে গুরুসেবা ও গুরুভক্তিই জ্ঞানার্জনের প্রধান উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত।

তবে সে-যুগে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রধান অন্তরায় ছিল কাগজ ও পুস্তকের অভাব। যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা পোষণ করিতেন, তাঁহাদের বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারপূর্বক প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র সন্ধান ও নকল করিয়া লইতে হইত। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া উচ্চ-জ্ঞান লাভে যত্নবান হইতেন, তাঁহারা ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু। তাঁহাদের বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা ছিল না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানলাভ ও আত্মোৎকর্ষ-সাধন।

অবধান তথা শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের পুঁথিপত্র সমস্তই তালপত্রে

লিখিত হইত। স্থায়িত্বের জন্য তালপত্রের উপর সূচ্যগ্র লৌহশলাকা দ্বারা এই সমস্ত পুঁথি লিখিত হইত ও পরে তাহার উপর কালির লেপ বুলাইয়া লিখিত বিষয় সুস্পষ্ট করিয়া লওয়া হইত। সম্ভবতঃ এই লিখনপদ্ধতির জন্যই ওড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা অর্ধবৃত্তাকার হইয়াছিল। কারণ লৌহলেখনী দ্বারা তালপত্রে বাংলা অক্ষরের ন্যায় সরল মাত্রা লিখিতে যাইলে, পাতা চিরিয়া গিয়া পুঁথি অল্পকাল মধ্যে নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিত।

বালিকাগণের শিক্ষার প্রথা সমাজে সুপ্রচলিত না থাকিলেও, অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের সাধারণ চাটশালীতে বালকগণের সহিত একত্রে বসিয়া লিখন পঠন ও সামান্য অঙ্ক শিখিবার পথে সামাজিক বিশেষ অন্তরায় ছিলনা। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, জমিদার অথবা রাজন্যগণ—যাঁহারা স্বতন্ত্র গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের পরিবারস্থ বালিকাগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্যন্ত অল্পাধিক উচ্চতর শিক্ষালাভের সম্ভাবনা ছিল—বিশেষতঃ সংস্কারমুক্ত অধ্যাপক-ব্রাহ্মণের গৃহে মধ্যে মধ্যে বিদুষী শাস্ত্রজ্ঞা মহিলা-লেখিকাও দেখা যাইত।

অবধানীয় শিক্ষারীতির দোষ-ত্রুটি অনেক ছিল। ইহাতে নিয়মিত কোনো পাঠক্রম না-থাকায়, ছাত্রগণের অনেক সময় অযথা নষ্ট হইত। পাঠশালার সুনির্দিষ্ট সময়সূচী বা শ্রেণী-বিভাগ ছিল না। সকলেই একসঙ্গে বসিয়া লেখা পড়া করিত। পড়িতে শিখিবার পূর্বে লেখা শিখিতে হইত। পাঠ্যপুস্তক না-থাকায় গুরুমহাশয় যাহা লিখাইয়া দিতেন, ছাত্রদিগকে তাহাই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিখিতে হইত। ছাত্রসংখ্যা অধিক হইলে, একজন অবধানের পক্ষে সকল ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর হইত না। সেজন্য অধিকাংশ চাটশালীতে 'সর্দার পোড়ো' প্রথা প্রবর্তিত ছিল। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনোরম বা চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য শিক্ষকগণের কোনো চেষ্টাই ছিলনা। চাটশালীর কঠোর দণ্ডবিধিই তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে মুখ্যস্থান অধিকার করিত। কেবল যে লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধানই ছিল তাহা নহে, বিনাঅপরাধেও অনেক সময় কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইত। বেত্রের সদ্ব্যবহার বিনা—লিখন পঠন বিদ্যাভ্যাস যে হইতেই পারে না, ইহা ছিল সে-যুগের বদ্ধমূল ধারণা প্রায় সর্বদেশেই; এবং এ বিষয়ে অভিভাবকগণেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতৈক্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই অবধানীয় শিক্ষারীতির প্রধান সুবিধা ছিল ইহার ব্যয়স্বল্পতা; আর ইহা ছিল ওড়িয়া-মাধ্যম-শিক্ষা।

(৩) শিক্ষারম্ভ

গোপে আগমনের পর এইরূপ এক গ্রাম্য চাটশালী বা পাঠশালায় সপ্তম বর্ষ বয়সে মধুসূদনের বিদ্যারম্ভ হয়। চাটশালীর রীতি অনুসারে শোধি, ওড়াঙ্ক, হরিগুণ, কোটা-নল, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি যেসকল অঙ্কের নাম বর্তমান যুগে ছাত্রগণের কর্ণগোচরও হয়না—প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়া মধুসূদনকে সেসকল শিখিতে হইয়াছিল। বৎসরাধিক কাল পরে ভাগীরথী ভুবনেশ্বরে বদলি হইয়া আসিবার পর পুত্রের শিক্ষার কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল। কারণ সেখানে তৎপূর্বেই একটি সরকারী মিড্‌ল্‌ ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইংরাজ আমলের সূত্রপাত হইলেও, প্রথম অর্ধশতাব্দীকাল কম্পানির সরকার কেবল রাজস্ব আদায়, সৈন্যদল বৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তারেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া মঞ্জুর হয়, তখন ইহার একটি সূত্রে দেশীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিকল্পে এবং ভারতীয়গণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার নিমিত্ত কম্পানিকে বার্ষিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ দেওয়া হয়। ইহাই ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে কম্পানির সরকারের প্রথম উদ্যম। এই সময়ে ব্রিটিশ ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তারকল্পে তিন দল লোক কার্যারম্ভ করিয়াছিলেন :—(১) প্রটেস্টাণ্ট মিশনারী দল ; (২) শিক্ষা-সুহৃদ ও শিক্ষা-ব্যবসায়ী দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণের দল ; এবং (৩) কম্পানির সরকার। শিক্ষার আদর্শ লইয়া, ভারতীয়গণের মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইয়া প্রাচ্যবাদী (Orientalist) ও পাশ্চাত্ত্যবাদী (Occidentalist) নামক দুই দলের বাদ-বিতণ্ডা বহুদিন চলিবার পর, অবশেষে লর্ড বেন্টিঙ্কের উদারনৈতিক শাসনকালের (১৮২৮-১৮৩৫) শেষভাগ হইতে কম্পানির সরকার পাশ্চাত্ত্য ইংরাজী-মাধ্যম শিক্ষানীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া দিবার সময় আসিলে ভারত-শাসনের অন্যান্য বিষয়ের সহিত শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনাও হয়। তদানীন্তন ইংলণ্ডের উদারনীতিক মতবাদের সাফল্যে ও ভারতে কম্পানির অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থার ফলে নূতন সনন্দের মধ্যে এইরূপ কতকগুলি সূত্র সন্নিবেশিত করা হয়, যাহার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। শিক্ষার খাতে

বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ হইতে বাড়াইয়া পনেরো লক্ষ টাকা করা হইল। কেবল তাহা নহে, অপর একটি সূত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার যে-কোন দেশ হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ ভারতে আসিয়া কাজ করিবার অধিকার পাইলেন। তাহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের কর্মতৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল।

ইংরাজ আমলের প্রথম এক শতাব্দীকাল, বাংলা বিহার ও ওড়িষ্যা একই শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন ছিল। সুতরাং এই তিন প্রদেশে একই শিক্ষানীতি অবলম্বিত হইত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তথা বিহার-ওড়িষ্যার প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তদানীন্তন বড়লাটকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত একটি প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রেরণ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র সামান্য বাংলা লেখাপড়া আর একটু আঁক শিখাইলেই চলিবে না। শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি শিখাইবার প্রয়োজনও আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কম্পানির বোর্ড-অব-কণ্ট্রোলের সভাপতি উড সাহেবের বিখ্যাত ডেসপ্যাচে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা-নীতি স্বীকৃত হইয়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইল। এই নীতি অনুযায়ী কম্পানি ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণোদ্যমে কার্য আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে ভুবনেশ্বরে একটি সরকারী মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সরকারের প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, উহা বাংলা-মাধ্যম শিক্ষা এবং শিক্ষকগণ প্রায়শই বাঙালী। ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সেযুগে বাংলা পুস্তকের সাহায্যেই ওড়িষ্যার নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। যদিও ইতঃপূর্বেই খৃষ্টীয় মিশনারীগণ ওড়িষ্যায় ওড়িয়া ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের কতকগুলি ওড়িয়ায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন, কিন্তু সে বিজাতীয় ওড়িয়ার অর্থগ্রহণ সাধারণের পক্ষে দুষ্কর ছিল।

ভাগীরথী ভুবনেশ্বরে বদলি হইয়া আসিবার পর মধুসূদনকে এই বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইলেন। ছাত্রের প্রখর বুদ্ধি, পাঠানুরাগ ও উত্তম স্বভাব দেখিয়া শিক্ষকগণ অচিরেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উক্ত

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহরি ভট্টাচার্য, মধুসূদন যে উচ্চশিক্ষা পাইবার উপযুক্ত সে-কথা বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগীরথার সামান্য আয় পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দানের অনুকূল ছিল না। বিধাতার কৃপায় শীঘ্রই একটি ঘটনায় এই অন্তরায় দূরীভূত হইল।

তদানীন্তন স্কুলসমূহের অধিকর্তা উড্রো-সাহেব খণ্ডগিরি-উদয়গিরির প্রত্নসম্ভার দেখিতে আসিয়া, সেখান হইতে ভুবনেশ্বর বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান। ভুবনেশ্বরে সাহেবের অবস্থানের উপযোগী সুবিধাজনক স্থান না থাকায়, তত্রত্য থানাতেই উড্রো-সাহেবকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। লোকব্যবহার-কুশল ভাগীরথী তৎকালে আতিথ্যসৎকার দ্বারা সাহেবকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়গৃহে প্রবেশ করিয়াই পরমসুন্দর বালক মধুসূদনকে দেখিয়া সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—"এটি কাহার পুত্র?" বুদ্ধিমান ভাগীরথী হিন্দিতে "এটি আমার ছেলে" উত্তর দেওয়ায়, সাহেব অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া সস্মিতমুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার ছেলেকে পরীক্ষা করি।" প্রথমে সম্মুখে ভারতের মানচিত্র দেখিয়া কয়েকটি ভৌগোলিক প্রশ্ন করিলেন। প্রত্যেকটির সদুত্তর পাইয়া পুনরায় গণিতের পরীক্ষা করিলেন। মধুসূদনের নিকট হইতে আশানুরূপ উত্তর পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া সাহেব পুরী জিলা স্কুলে বালকটিকে পড়াইতে পরামর্শ দিলেন এবং যাহাতে মধুসূদন উক্ত স্কুলে পাঁচবৎসর বিনা-বেতনে পড়িতে পারেন, তদ্রূপ লিখিত নির্দেশও দিলেন! এই সুযোগ ঘটাতে ভাগীরথী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রকে পুরী জিলা স্কুলে ভর্তি করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

(৪) পুরী জিলাস্কুলে শিক্ষা ও বিবাহ

পুরীতে ভাগীরথীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলরামজীর গৃহে মধুসূদনের থাকার ব্যবস্থা হইল। বলরামজী সরল, ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধুপুরুষ ছিলেন। মধুসূদনের বয়স তখন অনুমান নয়বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। মধুসূদনের মুখে আমরা শুনিয়াছি, ভুবনেশ্বর হইতে আসিয়া তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান বলরামজীর পাদবন্দনা করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াস্থিত সুদর্শনচক্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন—"চক্রধর, এই বালককে তোমার চক্রের আড়ালে রক্ষা কর!"

পুরী জিলা-স্কুলে ভর্তি হওয়ায় মধুসূদনের শিক্ষার সুযোগ বহু পরিমাণে

LIBRARY
No.

বৃদ্ধি পাইল ; কারণ ভুবনেশ্বর অপেক্ষা পুরী স্কুলে, ছাত্রসংখ্যাও অনেক বেশী এবং শিক্ষকগণও উচ্চশিক্ষিত। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—এই নীতিবাক্য মধুস্থদনের জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। বিদ্যালয়ে অপর ছাত্ররা যখন শ্রেণীতে বালস্থলভ চপলতাবশতঃ কোলাহল করিত, দেখা যাইত—মধুস্থদন তখন নিবিষ্টচিত্তে পাঠে রত। তাঁহাকে সেসময় কেহ কিছু বলিলে বা ডাকিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। মধুস্থদন মেধাবী ছাত্র ছিলেন ; তদুপরি অধ্যবসায়-গুণে প্রথম-বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডবল প্রমোশন পাইয়া চার বৎসরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসেন। তিনি প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষক ও সহাধ্যায়ী ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পুরীর তদানীন্তন গুণগ্রাহী ম্যাজিস্ট্রেট বক্স্ওয়েল সাহেব পুরী জিলা-স্কুলের ছাত্রদের পাঠোন্নতির জন্য এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর চারিটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করিয়া মোট কুড়িটি প্রশ্ন করা হইবে ; যে ছাত্র ঐ সমুদয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবে, তাহাকে প্রত্যেক উত্তরের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া মোট একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ছাত্রগণের মধ্যে একাকী মধুস্থদন তিন বৎসর এই একশত টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রেওয়া নামক দেশীয় রাজ্যের রাজার প্রদত্ত একটি বড় ৪০।৫০ ভরি ওজনের রৌপ্যপদক তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছিল। রেওয়ার রাজা এই শর্তে উক্ত পদকটি দিয়াছিলেন যে, পুরী জিলা স্কুলে যে-ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে ঐ পদকটি সাতদিনের জন্য দেওয়া হইবে ; তৎপরে উহা আবার স্কুলে রক্ষিত হইবে। কিন্তু যে ছাত্র উপর্যুপরি তিন বৎসর ঐ পদক লাভ করিবে, পদকটি তখন তাহার নিজস্বই হইবে। এই শর্তানুযায়ী মধুস্থদন দুই বৎসর ঐ পদক পাইয়াছিলেন, তৃতীয় বৎসরে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া শারীরিক অসুস্থতার নিমিত্ত তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্ষে পরীক্ষা দিয়া পুরী জিলা-স্কুল হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক দশটাকা বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে এফ. এ. পড়িবার জন্য কটক চলিয়া আসায় পদকটি তখন তিনি পান নাই। পরবৎসর হরিকৃষ্ণ দাস নামক একজন ছাত্র পুরী জিলা-স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি পায় এবং উক্ত পদকের দাবি করে, কিন্তু গুণগ্রাহী ন্যায়পরায়ণ বক্স্ওয়েল সাহেবের

সুবিবেচনার ফলে ডিস্ট্রিক্ট কমিটী ঐ পদকটি মধুসূদনকে দেওয়াই সিদ্ধান্ত করেন। যেদিন মধুসূদনের এই পদকটি পাইবার কথা, সেদিন কোনো নীচাশয় ছাত্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া স্কুল-গৃহে অগ্নি-সংযোগ করে ও তাহার ফলে রৌপ্যপদকটির সহিত স্কুলের বহু পুস্তক ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় মধুসূদন মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন।

১৮৬৬-১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষ্যায় ভীষণ লোমহর্ষণকারী দুর্ভিক্ষ হয়। তৎকালীন পুরীর রাজা শ্রীশ্রীদিব্যসিংহদেবের নামীয় বর্ষ-গণনা অনুসারে তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে এই দুর্ভিক্ষ ঘটে বলিয়া, ওড়িষ্যায় ইহাকে 'ন-অঙ্ক' দুর্ভিক্ষ বলা হয়। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সরকারী হিসাবে স্বীকৃত যে, ওড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করে। পথে ঘাটে শত শত শব পড়িয়া থাকিত। সেই শোচনীয় দৃশ্য কোমলমতি বালক মধুসূদনের অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করিত। এই সময়ে সরকার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করেন। পুরীর তদানীন্তন সুপণ্ডিত মোহান্ত নারায়ণ-দাসের অনুরোধক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট বক্স্ওয়েল সাহেব জিলা-স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধুসূদনকে এই চাউল বিতরণের ভার অর্পণ করেন। দয়ার্দ্র-হৃদয় মধুসূদন এই অসহায় দুঃস্থগণের সেবাকার্যে নিজেকে নিয়োগ করিতে পারিয়া কৃতার্থ হন। একজন স্কুল-ছাত্রের এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ সেবাব্রত-গ্রহণ সেকালের লোকের নিকট অভাবনীয় ছিল।

মধুসূদন জিলা-স্কুলে ভর্তি হইবার কিছুকাল পরে ভাগীরথী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর নাম তুলসীবাঈ। ইনি মধুসূদন অপেক্ষা মাত্র ২।৩ বৎসরের বড় ছিলেন। সপত্নী-পুত্রদ্বয়ের প্রতি ইঁহার ব্যবহার বেশ ভালো ছিল। ক্রমে এই বিমাতা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া পতিগৃহে আসিলে, পুরীতে ভাগীরথীর গৃহস্থালি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে মধুসূদন ও জগন্নাথ পুরীর বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তুলসীবাঈ নিরক্ষরা হইলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন; তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে যাহা শুনিতেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। জগন্নাথ মহাপ্রভুর 'জণান' (স্তবস্তুতি) ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেশ-প্রচলিত বহু পালা-কাহিনী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

আমরা শুনিয়াছি, তুলসীবাঈয়ের পিতৃগৃহ কটকের নিকটবর্তী গ্রামে ছিল। ইঁহারা তিনটি বোন ছিলেন ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা গজরাজ বাঈ ; ইঁহার স্বামীর নাম হরিজী। ইঁহারা কটকে বাস করিতেন। মধুসূদন এফ. এ. পড়িবার সময় কটকে ইঁহাদের বাসায় থাকিয়াই কলেজে যাইতেন।

তুলসীবাঈয়ের অগ্রজা দ্বিতীয়া ভগিনীকে আমরা দেখিয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে পিতামহীর স্নেহাদর লাভ করিয়াছি। তিনি তখন কটক হইতে অনতিদূরে বারাঙ্গ নামক গ্রামে বাস করিতেন। এই স্থানের অপর নাম সারঙ্গগড়। এখানে একটি ছোটখাটো কেল্লা ছিল, যাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও রহিয়াছে। ইনি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। মধুসূদন এফ. এ. পাস করিবার পর যখন প্রথম চাকরি লইয়া সস্ত্রীক কর্ম্মস্থল যাজপুরে গমন করেন, তখন ভাগীরথী এই বয়স্কা শ্যালিকাকে পুত্রের পরিবারে অভিভাবিকা রূপে থাকিবার জন্য সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে মধুসূদন যখন কটকে আসিলেন, তখন ইনি অনেকসময় বারাঙ্গ হইতে কটকে আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিতেন।

অনুমান বারো বৎসর বয়সে মধুসূদনের বিবাহ হয় পুরীনিবাসী বলরামজীর দ্বিতীয়া কন্যা চম্পাবাঈয়ের সহিত। মহারাষ্ট্রীয় রীতি অনুসারে পতিগৃহে ইঁহার 'পদ্মা'-নামকরণ হয়। তদবধি এই 'পদ্মাবাঈ' নামেই ইনি সমগ্র জীবন পরিচিতা ছিলেন।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্তারূপে বলরামজীর জীবন আদর্শস্থানীয় ছিল। ইঁহার পত্নীর নাম ছিল মিছুবাঈ। ইঁহাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ, কন্যাদ্বয়—স্বর্ণ ও চম্পা (ওরফে পদ্মা) ও কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ। বলরামজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরজী অকালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃসন্তানা বালিকা-বধূটিকে বলরামজী কন্যানির্বিশেষে আজীবন পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ যখন শিশু, তখন সেই শিশুটিকে তিনি ভ্রাতৃবধূর হস্তে পুত্ররূপে পালন করিবার জন্য দিয়াছিলেন। এই বিধবা ভ্রাতৃবধূর নাম হীরাবাঈ। কটকের নিকটস্থ চৌদ্বয়ারের অনতিদূরে খইরাগ্রামে ইঁহার বাপের বাড়ী ছিল। আমার মা ও ছোটমামাকে ইনি নিজসন্তান তুল্য দেখিতেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মামা রামকৃষ্ণ রাও কটকে বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আসেন। হীরাবাঈ পুরী হইতে সেই সময় কটকে আসিয়া ইঁহাদের নিকট আজীবন বাস করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ রাওয়ের

সহিত আমার বড় পিসী তারাবাঈ-এর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। এই বধূটিকে হীরাবাঈ যে যত্ন-আদর করিতেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমার মায়েরও সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক সকল অবস্থাতেই ইঁহাকে কাছে কাছে দেখিয়াছি। নিষ্ঠাবতী, সুগৃহিণী, সেবাপরায়ণা এই হীরাবাঈ, রামকৃষ্ণ রাওয়ের দুই পুত্রের (ভাস্কর ও সুধাকর) বিবাহের পরে নাতি নাতবৌদের লইয়া কিছুকাল আনন্দে কাটাইয়া অল্প দিন রোগভোগের পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই কটকেই পরলোকগমন করেন। আমার বাবাও ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। দিদিমার স্নেহাদর আমরা ইঁহার নিকট পাইয়াছি।

বলরামজীর আর্থিক অবস্থা ভালোই ছিল। পুরী জগন্নাথমন্দিরে আটা যোগান দেওয়া ইঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। এই সূত্রে বহু দরিদ্রা নারী ইঁহার গৃহে জাঁতায় গম ভাঙিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বলরামজী-ই এই দরিদ্র পরিবারগুলির নির্ভর ও ভরসাস্থল ছিলেন।

মধুসূদনের অনুজ জগন্নাথ রাওয়ের বিবাহ কটক জেলার অন্তর্গত প্রাচীন চৌদ্বয়ারের নিকটস্থ আগ্রাহাট গ্রামনিবাসী লছমনজীর দ্বিতীয়া কন্যা চন্দ্রমণির সহিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত মারাঠারীতি অনুযায়ী বিবাহের পর ইঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া রমাবাঈ রাখা হয়। রমাবাঈয়ের পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায়—তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে—কন্যাকে বিবাহের পূর্বে 'মহাপ্রসাদ উঠা' (অর্থাৎ মহাপ্রভু জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণপূর্বক 'পাকা দেখা' অনুষ্ঠান) সম্পন্ন করিয়া ভাবী শ্বশুরগৃহে অর্থাৎ পুরীতে লইয়া গিয়া সেখানে বিবাহ দেওয়া হয়। বলরামজী কন্যাকর্তা রূপে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। তদবধি তিনি নিজ কন্যা পদ্মার সহিত রমাকেও সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। উভয়ের সন্তানদিগের প্রতি ব্যবহারেও তিনি কোনোরূপ পার্থক্য করিতেন না। এই উদার-হৃদয় প্রেমিক প্রাণের দৃষ্টান্ত তাঁহার পরিবারের সকলের প্রাণে এরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল যে, বহুবৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় রমাবাঈয়ের মৃত্যু ঘটিলে, বলরামের কনিষ্ঠ পুত্র বৃদ্ধ রামকৃষ্ণ নিজকে ভগ্নীস্নেহ হইতে বঞ্চিত দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—"আমার 'দিদি' ডাক ফুরিয়ে গেল!"

মধুসূদন যখন পুরী জিলা-স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন সেই সময় বালেশ্বর জিলা-স্কুলের শিক্ষক কবিবর রাধানাথ রায় জগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরী গিয়া একদিন স্থানীয় জিলা-স্কুল দেখিতে যান। সেইদিন তিনি

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

দেখিলেন একটি বালক পুস্তক লইয়া পাঠে নিমগ্ন, পার্শ্ববর্তী অপর একটি ছাত্র তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কি যেন বলিতেছে। প্রথম বালকটি বিরক্ত হইয়া বলিল, "Don't bother me now." এই দৃশ্যে রাধানাথের মন বালকটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই বালকটিই মধুসূদন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে রাধানাথ বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া পুরী জিলা-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহার উপর স্কুলে ভূগোল ও ইতিহাস পড়াইবার ভার ছিল। পূর্ববৎসর মধুসূদন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পরীক্ষা দিতে না পারায়, রাধানাথ এখানে তাঁহাকে ছাত্ররূপে পাইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধা ও পাঠানুরক্তির গুণে মধুসূদন অচিরেই তাঁহার প্রিয়তম ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। এ বৎসরেও অসুস্থতার জন্য মধুসূদন শেষ পরীক্ষায় প্রস্তুতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ব্যাকুলভাবে রাধানাথকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন। রাধানাথ তাঁহাকে তাঁহার পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া বিষয়ে আশা ও উৎসাহ দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। অঙ্কে একটু কাঁচা বলিয়া মধুসূদন তাঁহাকে অঙ্ক শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করায়, রাধানাথ প্রত্যহ মধুসূদনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে অঙ্ক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল তাহা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল।

কবিবর রাধানাথের সঙ্গে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে স্বর্গদ্বারে সাগর-সৈকতে বসিয়া মহাসমুদ্রের মহোদার রুদ্রসুন্দর দৃশ্যাবলী ও শ্মশানের ভাব-গম্ভীর রহস্য ও ইহজীবনের ক্ষণস্থায়ী লীলা দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের অন্তরে নানাপ্রকার ভাবোদয় হইত। রাধানাথের সঙ্গগুণে মধুসূদনের অন্তরে সাহিত্যানুরাগও দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

তৎকালে পুরীতে হরিহরদাস নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত বাস করিতেন। দেশে-বিদেশে সর্বত্র ইঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অনর্গল বক্তৃতা-শক্তি পণ্ডিতগণকে মুগ্ধ করিত। পুরীর তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট বক্স্ওয়েল সাহেব ইঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাধানাথ এবং মধুসূদন উভয়ে একত্রে পণ্ডিতবর হরিহরের বাসভবনে গিয়া সংস্কৃত চর্চা করিতেন ও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ শ্রবণ করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও, হরিহরদাস নাস্তিক দার্শনিক

ছিলেন, এবং সে-কারণে হিন্দুধর্মানুমোদিত আচার-ব্যবহার মানিতেন না। ইঁহার প্রবর্তনায় বলরামপুরের বদান্য মহারাজার অর্থানুকূল্যে পুরীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এই পণ্ডিতমহোদয় ওড়িষ্যার জনসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি বর্তমান 'পুরী সংস্কৃত কলেজ' নামে পরিচিত।

এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের জীবনের প্রভাব রাধানাথ, মধুসূদন ও তাঁহার অন্যান্য কতকগুলি শিষ্যের জীবনে পড়িয়াছিল। বালক মধুসূদনের অন্তরে আস্তিক্য বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ছিল। পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট শাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন মতবাদ শ্রবণ করিয়া মধুসূদন তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন; কারণ, নাস্তিকতাতে তাঁহার অন্তর সায় দিত না। গুরুর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের ভিতর দিয়া তাঁহার নাস্তিকতার সমর্থন দেখিয়া মধুসূদনের অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আলোড়িত হইত। মনের এই অশান্ত অবস্থায় মধুসূদন একদিন রাত্রে একটি স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নটি এইরূপ :—কতকগুলি জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড স্কন্ধে লইয়া পণ্ডিত হরিহরদাস পুরীর 'বড়দাণ্ডে' (প্রধান রাস্তা—যে রাস্তায় পুরীর রথযাত্রার সময় রথ টানা হয়) ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন ও জলন্ত কাষ্ঠ পার্শ্ববর্তী জনতার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন; তাহারাও অগ্নিদগ্ধ হইয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় নিকটবর্তী নরেন্দ্রপুষ্করিণীতে নিমজ্জিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

আশ্চর্য এই, ইহার অল্পকাল পরেই পণ্ডিতবর হরিহরদাসের অগ্নিদগ্ধ হইয়াই মৃত্যু হইয়াছিল। এই ঘটনা ও পণ্ডিতমহাশয়ের স্মৃতি কিশোর মধুসূদনের অন্তরে এরূপ গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, পরবর্তীকালে অনেক সময় তিনি আমাদের নিকট আবেগময়ী ভাষায় এই গল্প করিতেন। এই স্মৃতি অবলম্বনেই তাঁহার 'পরম প্রমাণ' নামক যে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"হে ধীমন্ত বুধকুল! খুঁজিতেছ ধ্যানে
কেমন যুকতি সেতু নির্মি সুকৌশলে,
নাশি দৃশ্য অদৃশ্যের মহা ব্যবধানে
চকিত করিবে সর্ব ধরণীমণ্ডলে।

হে পণ্ডিত! ক্ষুদ্র তব বুদ্ধি মানদণ্ডে
বিচারিছ, মাপিবে হে অনন্ত অপারে!
... ...
শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের অতীত অগাধ
সে অন্তরতম, ডুবে যাও সে অতলে।
দূরে ফেলি অভিমান প্রমাণ-প্রমাদ,
পড় আসি সে অনন্ত পাদ-পদ্মতলে।
হে চতুর সুধী! ছাড়ি বিচার চাতুরী
ভুঞ্জ মহানন্দে মহা বিশ্বাস মাধুরী।"*

এই সম্পর্কে সাধু হরিদাস বাবাজীর বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। পুরী মন্দিরের নিকটে একটি মঠে এই সাধুটি বাস করিতেন। বালক মধুসূদন জগন্নাথ-দর্শন-নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে মন্দিরে যাইতেন। সেই সময় তিনি বাবাজীর কাছে গিয়া বসিতেন ও তাঁহার নিকট ধর্মকথা শুনিতেন। বালকের এই ধর্মভাব দেখিয়া সাধু অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিতেন। সুবোধ বালক মধুসূদনের অনেক নীতিমূলক শ্লোক কণ্ঠস্থ ছিল। বাবাজী এইসকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া মধুসূদনকে বুঝাইয়া দিলে, তাহা এই বালকের অন্তরে চিরমুদ্রিত হইয়া যাইত। মধুসূদন আনন্দিত অন্তরে আরও নূতন শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইতেন। এইভাবে সাধুসঙ্গের ভিতর দিয়া ভক্তিপিপাসু বালকের প্রাণটি বিকাশের পথে অগ্রসর হইত। ভক্তকবি মধুসূদনের জীবনে পরবর্তীকালে যে অপূর্ব ভগবদ্ভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অঙ্কুরোদ্গম সাধু হরিদাস বাবাজীর সঙ্গলাভেই ঘটিয়াছিল।

(৫) উচ্চতর শিক্ষা

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন পুরী জিলা-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া এফ. এ. পড়িবার জন্য কটকে আসেন। কটকে তখন কলেজ স্থাপিত হয় নাই; কেবল ওড়িষ্যার ছাত্রগণের এফ. এ. পড়িবার সুবিধার জন্য কটকস্থ সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুইটি

* মধুসূদনের ওড়িয়া কবিতাটি নগেন্দ্রবালা সরস্বতী কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

অতিরিক্ত শ্রেণী সংযোজিত হইয়াছিল। রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., ও হরনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ. এই দুই শ্রেণীতে অধ্যাপকতা করিতেন।

রাজকিশোর ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন; ইনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী এবং ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'মিত্রবিলাপ' ও 'কাব্যকলাপ' নামক বাংলা পুস্তকদ্বয়ে তাঁহার কবিকৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল। অধ্যাপনার সময় তিনি কেবল ইংরাজীর ব্যাখ্যান প্রদান করিতেন না, পরন্তু হোমার-বাল্মীকি, ব্যাস-ভার্জিল, মিল্টন-মাইকেল (মাইকেল—'মেঘনাদবধ'-কাব্যপ্রণেতা মধুসূদন দত্ত) প্রভৃতি মহাকবিদিগের রচনা হইতে উপযোগী কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে ধরিতেন। রামায়ণ মহাভারত হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদিগকে উত্তর দিতে বলিতেন। এইরূপ অধ্যাপনাগুণে ছাত্রগণের ক্রমোন্নতির সহিত সমালোচনা-বৃত্তিও মার্জিত হইত।

হরনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। নবীন যুবক হইলেও ইঁহার বিদ্যাবত্তা, নির্মল চরিত্র ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া ছাত্রগণের অন্তরে ভয়ভক্তির সঞ্চার হইত। তিনি শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে, ছাত্রবর্গ তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিত। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হরনাথের দার্শনিক উপদেশ অভিনিবিষ্ট ছাত্রের হৃদয়ে উর্বরাভূমিতে রোপিত বীজের ন্যায় ফলপ্রসূ হইত।

পরবর্তীকালে শিক্ষক মধুসূদনের পাঠনায় এই উভয় অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত ও প্রভাব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

এই সময়ে মধুসূদনের সহাধ্যায়িবর্গের মধ্যে প্যারীমোহন আচার্য, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিপ্রচরণ চট্টোপাধ্যায়, চতুর্ভুজ পট্টনায়ক ও বলরাম দাস—এই কয়জন প্রধান ছিলেন। এই সহপাঠিগণের মধ্যে মধুসূদন সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিলেন।

এই সহাধ্যায়িগণের প্রত্যেকের রুচি বিভিন্ন। ভগবতী গম্ভীরস্বভাব, বিপ্রচরণ হাস্য-পরিহাস-রসিক, চতুর্ভুর্জ চঞ্চলচিত্ত, বলরাম উন্নতরুচিসম্পন্ন হইলেও রসিকতানিপুণ ছিলেন। এইরূপ বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন হইয়াও ইঁহারা কয়জন ঘনিষ্ঠ প্রীতিযোগে যুক্ত ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে পর ইঁহারা

দূরে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ছাত্রজীবনের সেই সুখময় স্মৃতি ইঁহাদের অন্তরে চিরমুদ্রিত ছিল, এবং ইঁহাদের সৌহার্দ্য আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু মধুসূদন ও প্যারীমোহন এই দুইজনের সংযোগ যেন মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের অবকাশ সময়ে এই দুই বন্ধু অন্য ছাত্রদের মতো ইতস্ততঃ ঘুরিয়া না বেড়াইয়া নিভৃতে বসিয়া নানা প্রসঙ্গ—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লেখা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত কোনও উৎকৃষ্ট রচনার অনুবাদ করিতেন। এই সমানধর্মা যুবকদ্বয় উভয়ে উভয়ের প্রাণপ্রিয় সখা ছিলেন।

অধ্যাপক হরনাথ ভট্টাচার্যের নির্মল চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার প্রভাবে প্যারীমোহন ও মধুসূদন উভয়ে ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হন। ইঁহাদের তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য :—

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে নবযুগের সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রাহ্মবিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি (বরের বয়স ১৮ ও কন্যার বয়স ১৪ বৎসর অপেক্ষা ন্যূন হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ) অনুযায়ী আইন বিধিবদ্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায়, দেশব্যাপী সংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের ফলে যখন জনসাধারণের মত জিজ্ঞাসিত হয়, তখন ওড়িষ্যা হইতে মধুসূদন ও প্যারীমোহন সৎসাহস প্রদর্শনপূর্বক প্রকাশ্যে উক্ত আইনের সপক্ষে মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আবার আচার্য কেশবচন্দ্র যখন স্বীয় চেষ্টায় বিধিবদ্ধ উক্ত আইনের বিরুদ্ধে নিজ অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত অপ্রাপ্তবয়স্ক কুচবিহার-রাজের বিবাহে উদ্যোগী হইলেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই দুই তরুণ যুবক সেই আন্দোলনকারীদের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন। যেকালে দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত, সেকালে এই যুবকদ্বয়ের তৎকালীন সমাজরীতির প্রতিকূলে এইরূপ কার্যে অগ্রসর হওয়া কিরূপ সৎসাহসের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্যারীমোহন মাত্র ত্রিশবৎসর বয়সে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কটক নগরীতেই অকালে পরলোকগমন করেন। মাত্র পাঁচটি দিন প্রবল জ্বর ভোগ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মধুসূদন সে-সময় কটকে থাকায় সর্বদা বন্ধুর নিকটে থাকিয়া অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ইঁহার রোগশয্যা, অন্তিমকালের করুণ দৃশ্য প্রভৃতি শোকাবহ ঘটনার কথা মধুসূদন

কত সময় অশ্রুপূর্ণনয়নে বর্ণন করিতেন। 'বসন্ত গাথা' নামক কাব্যে মধুসূদন ইঁহাকে যে কবিতাটি উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত হইল :—

"সংসার সাগর পারে পুণ্যানন্দময়
পরলোক ধামে সখা, আছ দেবদলে।
ভীম ভব-সিন্ধুকূলে ব্যাকুল সভয়
ভাসিতেছি একা আমি শোক-অশ্রুজলে।
সে সিংহ-বিক্রান্ত তব পুরুষ-হৃদয়
দিবা নিশি দীপ্ত পুণ্য উৎসাহ-অনলে,
দয়া-স্নেহ-বিগলিত সে তব আশয়,
সুন্দর মিলন আহা কঠোরে কোমলে!
ব্রহ্ম-পাদ-পদ্ম-তলে সে অমৃতধামে
হইয়াছে তাহা আহা কি রুচিরতর!
চিন্ময় নয়নে তব সে চিন্ময় ধামে,
ঝরিতেছে আহা কিবা প্রেমের নির্ঝর!
ব্যথিত তৃষিত আমি সংসার-সংগ্রামে
দিবে কিহে দীনে সখা, সে প্রেম-শীকর!"*

মধুসূদনের এফ. এ. পরীক্ষা দিবার সময় কটকে ঐ পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা ছিলনা বলিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তখন তিনি কলিকাতায় কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবকের সহিত একটি মেসে থাকিয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

বাবার নিকট শুনিয়াছি, ঐ মেসে তখন শশীভূষণ দত্ত মহাশয় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পার্বতীনাথ দত্ত-ও থাকিতেন। ইঁহারা উভয়ে মেধাবী এবং মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় নবাগত মধুসূদনের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার প্রতি ইঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন। এই সময়ে মধুসূদনের সহিত ইঁহাদের যে সৌহার্দ্য হইয়াছিল, তাহা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল ও এই সুখস্মৃতি তাঁহার অন্তরে এরূপ জাগরূক ছিল যে, তিনি বহুসময় তাঁহার পুত্রকন্যার নিকট ইঁহাদের কথা বলিতেন। এম. এ. পাসের পর শশীভূষণ কটক হাইস্কুলের সঙ্গে যে এফ. এ. শ্রেণী যুক্ত ছিল, সেখানে অধ্যাপকের কার্যে

* মধুসূদনের ওড়িয়া কবিতাটি নগেন্দ্রবালা সরস্বতী কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত।

নিযুক্ত হইয়া যান। তৎপরে ঢাকা কাওরাইদের জমিদার সাধু কালীনারায়ণ গুপ্তের (স্যার কে. জি. গুপ্তের পিতা) তৃতীয়া কন্যা চপলা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মধুসূদনের মুখে শুনিয়াছি, এতদুপলক্ষে তিনি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং উহা তাঁহাদের বিবাহ সভায় গীত হইয়াছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সুখ্যাতির সহিত এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন; এবং কটকে বি. এ. পড়ার সুবিধা না থাকায় কলিকাতায় গিয়া পড়িবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু তখন ওড়িষ্যায় রেলপথ স্থাপিত হয় নাই। কটক হইতে জলপথে মহানদীর কেনাল দিয়া বালেশ্বরের নিকটবর্তী চাঁদবালি নামক সামুদ্রিক বন্দর হইতে ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় আসিতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগিত এবং পথের কষ্টও খুব ভুগিতে হইত। সুতরাং পুত্রবৎসল পিতা মধুসূদনকে এত দূরে পাঠাইতে সম্মত না হওয়ায়, তাঁহার আর কলেজে পড়া হইল না। মানবীয় গণনায় ছাত্রাবস্থা এইখানে শেষ হইলেও, যে জ্ঞানপিপাসা তাঁহার জীবনে নিত্য জাগ্রত ছিল, তাহা আজীবন তাঁহাকে জ্ঞানলাভে নিয়োজিত রাখিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

(ক) যাজপুর বালেশ্বর ও কটকে সহকারী শিক্ষকতা

মধুসূদন এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরী জিলা-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকরূপে মনোনীত হইলেন; কিন্তু তদনীন্তন ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সাহেব (R. L. Martin) বঙ্গদেশ হইতে অপর একজনকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করায় মধুসূদন ঐ কার্যটি পাইলেন না। কর্মজীবনের প্রথমেই এইরূপ আশাভঙ্গ হওয়ায় মধুসূদন যে আঘাত পাইলেন, তাহা তাঁহার হিতকামী বন্ধু কবিবর রাধানাথ রায়কেও ক্লিষ্ট করিয়াছিল। তখন রাধানাথ বালেশ্বর জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর। ইহার পর মার্টিন সাহেব যখন ওড়িষ্যায় স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন, তখন বালেশ্বরে তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে রাধানাথ মধুসূদনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মধুসূদন রাওকে পুরী স্কুলে নিয়োগের ব্যাপারে হতাশ করা হইয়াছে; ইহা উচিত হয় নাই। তিনি এফ. এ. পাস করিলেও, অনেক বি. এ. উপাধিধারী অপেক্ষা তাঁহার যোগ্যতা অধিক বলিয়া আমি মনে করি। ওড়িষ্যায় তাঁহার মতো যোগ্য লোক নাই বলিলে হয়। সুতরাং সর্বাগ্রে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা উচিত ছিল।"

রাধানাথের কথায় মার্টিন সাহেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মধুসূদনকে উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করিবার কথাটি মনে রাখিলেন। কটক হাইস্কুলে তখন সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল নামে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক ছিলেন। তিনি কতকটা অপ্রকৃতিস্থ থাকাহেতু ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মধুসূদনকে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনে উক্ত পদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তৎপরেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে স্কুলের উক্ত পদটি উঠাইয়া দিবার নির্দেশ আসিল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব অনন্যোপায় হইয়া যাজপুরের মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ খালি হইয়াছে শুনিবামাত্র মধুসূদনকে মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে মধুসূদনের যাজপুরেই প্রথম সরকারী কার্যে প্রবেশের সুযোগ ঘটিল।

মধুসূদন যখন যাজপুরে আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র; পত্নীর বয়স মাত্র পঞ্চদশ। উদার-হৃদয় পিতা ভাগীরথী বধূকেও পুত্রের সহিত কর্মস্থলে প্রেরণ স্থির করিয়া স্বীয় পত্নী (অর্থাৎ মধুসূদনের বিমাতা) তুলসীবাঈয়ের বিধবা অগ্রজা ভগিনীকে ইঁহাদের অভিভাবিকাস্বরূপে এবং কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ ও তদীয় বালিকা-বধূকেও ইঁহাদের সঙ্গে দিয়া যাজপুরে পাঠাইলেন।

পুরী হইতে যাজপুর যাইতে তখন পাঁচ-ছয়দিন লাগিত; গো-যানে যাইতে হইত এবং মধ্যে মধ্যে ছোট-বড় অনেক নদী নৌকাযোগে পার হইতে হইত। সেসময় পথও বিপদসঙ্কুল ছিল। প্রতিদিন পথিমধ্যস্থ চটিতে (বিশ্রাম ও আহারাদির জন্য পর্ণকুটীর—মুদীদের দ্বারা পরিচালিত) নামিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় গোযানে উঠিতে হইত।

যাজপুরেই উৎকলের বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক ফকীরমোহন সেনাপতির সহিত মধুসূদনের প্রথম পরিচয় হয়, এবং ক্রমশঃ ইহা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। উভয়ে উভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে আজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

যাজপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ মধুসূদনের সমবয়স্ক, কেহবা তাঁহা-অপেক্ষা বয়সে বড়ও ছিল। সেকারণে এই অল্পবয়স্ক খর্বকায় শিক্ষকটিকে তাহারা প্রথমে শ্রদ্ধা- ও সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই। কিন্তু মধুসূদনের গম্ভীর স্বভাব এবং তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া তাহারা অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা- ও সম্মান-সূচক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। মধুসূদন দেড়বৎসর যাজপুরে কাজ করার পর, বালেশ্বর জিলা-স্কুলে হেড-মাস্টারের পদ শূন্য হয়। বালেশ্বর জেলা-সমিতির তদানীন্তন সভাপতি ম্যাজিস্ট্রেট বীম্‌স্ (Beams) সাহেব উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক উমাপ্রসাদ দে-কে হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত করিয়া, মধুসূদনকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মধুসূধন এই কার্যে যোগদান করিবার পূর্বেই আবার (তৃতীয়বার) বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তৎকালীন ইন্‌স্পেক্টর হপ্‌কিন্‌স্ সাহেব জেলা-সমিতির এই নিয়োগকে তাঁহাদের অনধিকার-চর্চা বলিয়া ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই অপ্রীতিকর ঘটনায় সাধু মধুসূদন ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু সেই সময় সৌভাগ্যবশতঃ বীম্‌স সাহেব ওড়িষ্যার অস্থায়ী কমিশনার পদে নিযুক্ত হওয়ায় সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া গেল। তিনি হঠাৎ কটক হইতে বালেশ্বরের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর

রাধানাথ রায়কে নিম্নলিখিত তার-সংবাদ প্রেরণ করেন :—"Let Madhusudan stay where he is." এইরূপে মধুসূদন উপস্থিত বিঘ্নসকল অতিক্রম করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর বালেশ্বর জিলা-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকপদে যোগদান করিলেন।

উৎকলের আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টারূপে যে তিনজনের নাম বর্তমানকালে উল্লেখিত হইয়া আসিতেছে—সেই ফকীরমোহন, রাধানাথ ও মধুসূদনের সাহিত্যিক মিলন বালেশ্বরেই প্রথম সংঘটিত হয় ও এখানেই যথার্থ সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত হয়। সেই যুগে ওড়িয়া ভাষায় বিদ্যালয়-পাঠ্য উপযোগী পুস্তক অতি অল্পই ছিল। স্বর্গীয় দামোদরপ্রসাদ দাসের পুস্তকালয় হইতে বহু বাংলা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ও তালপত্র-পুঁথিতে লিখিত রসকল্লোলাদি প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থাদির আলোচনা করিয়া তাঁহারা ওড়িয়ায় নূতন পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে উদ্যোগী হইলেন। কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে (পরবর্তীকালে মহারাজা) পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় ইঁহাদের এই প্রচেষ্টা সহজেই কার্যে পরিণত হইতে লাগিল। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতেই বয়োজ্যেষ্ঠ ফকীরমোহন কয়েকজন বন্ধুসহ মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া 'বোধদায়িনী ও বালেশ্বর সংবাদ-বাহিকা' পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। নূতন পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাতও ঐ সময়েই হইয়াছিল। এখন আবার বৈকুণ্ঠনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে রাধানাথ ও মধুসূদনের লিখিত নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইবার আয়োজন হইল। আমরা শুনিয়াছি এই দুই বন্ধুর যত্নে উক্ত মুদ্রণালয়ে 'উৎকলদর্পণ' নামে যে ওড়িয়া মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, বিষয়-গৌরবে ইহার সমকক্ষ সাহিত্যিক পত্রিকা ওড়িষ্যায় বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই দুই বন্ধু উক্ত পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন এবং উভয়ের প্রথম লেখাগুলি ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। রাধানাথের 'ইতালীয় যুবা', 'বিবেকী' প্রভৃতি গদ্যরচনা, মেঘদূতের পদ্যানুবাদ এবং মধুসূদনের 'প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস ও চন্দ্র-তারা, উল্কাপিণ্ড, সূর্য, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি প্রবন্ধ ও নিশীথ-চিন্তা, শ্মশান, রঘুবংশ হইতে রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের পদ্যানুবাদ এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতা সহযোগে এইসব প্রবন্ধ ও কবিতা সংকলিত হইয়া যথাক্রমে 'প্রবন্ধমালা' ও 'কবিতাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। এই ওড়িয়া পুস্তকদ্বয় স্কুল-পাঠ্যরূপে ওড়িষ্যায় দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল।

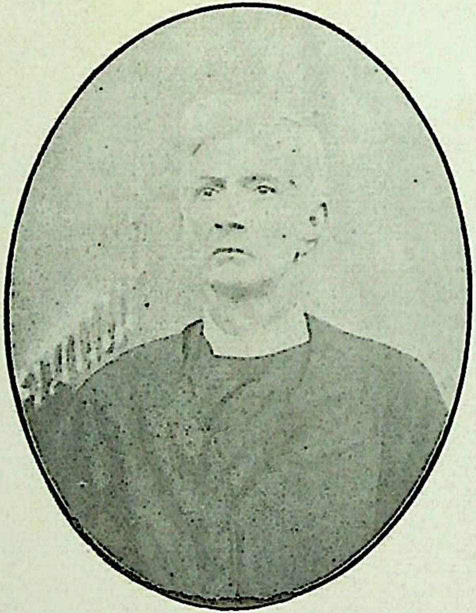

ফকীরমোহন সেনাপতি

(আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম জন্মদাতা)

জন্ম—১৭ জানুয়ারি, ১৮৪৩ খৃঃ ;

মৃত্যু—১৬ই জুন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ

ওড়িয়্যার কবিগুরু—রাধানাথ রায়

জন্ম—২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ খৃঃ ;

মৃত্যু—১৬ এপ্রিল, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ

৩৮ পৃঃ

LIBRARY
No............
শ্রীউমাশংকর সরকার

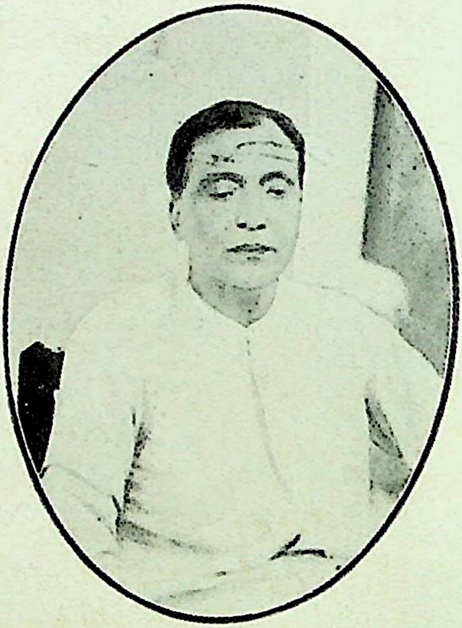

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(ভক্তকবির জ্যেষ্ঠ জামাতা)

জন্ম—২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ;

মৃত্যু--৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ।

(১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

মধুসূদনের যথার্থ বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যসেবার মূলভিত্তি এইখানেই স্থাপিত হয়। ওড়িয়া ভাষায় সুলেখক নামের প্রতিষ্ঠা তিনি এইখানেই লাভ করেন।

মার্টিন সাহেবের প্রস্তাবিত পূর্বোল্লিখিত কটক হাইস্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ দুইবৎসর পরে পুনঃস্থাপিত হওয়াতে মধুসূদনকে উক্ত পদে ৭৫৲ টাকা মাসিক বেতনে নিয়োগ করা হয়।

বালেশ্বর হইতে কটকে ফিরিবার পূর্বেই এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তীর জন্ম হয় (১৮৭৪, ৫ই জুন)।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমরণ (১৯১২) মধুসূদন কটকেই প্রায় স্থায়িভাবে বাস করিয়া গিয়াছেন ; কেবল মধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য বালেশ্বরে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের কার্য করিয়াছিলেন।

কটক হাইস্কুলে প্রশংসিতভাবে একবৎসর কার্য করার পর ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে, মধুসূদনের যোগ্যতায় সন্তুষ্ট কর্তৃপক্ষ অন্য প্রার্থী থাকাসত্ত্বেও মধুসূদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। তখন এই স্কুলে দুর্দান্ত ও দুঃশীল ছাত্র অনেকগুলি ছিল। তাহারা ইঁহার চরিত্র-প্রভাবে ও সস্নেহ শাসনে অল্পদিনের মধ্যে ইঁহার বশীভূত হয় ও তাহাদের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া তাহারা সৎপথে চালিত হয়। এই সময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কটক হাইস্কুলের বহু ছাত্র পরবর্তীকালে উৎকলের নানা স্থানে কার্য করিয়া সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

ঐ সময়ে মহামতি টি. র‍্যাভেন্‌শ', আই. সি. এস., ওড়িষ্যাবিভাগের কমিশনার এবং গড়জাতের দেশীয় রাজ্যগুলির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন (১৮৭০—১৮৭৮)। একজন লোকপ্রিয় সুশাসক এবং উৎকলের প্রকৃত বন্ধুরূপে সমগ্র ওড়িষ্যায় তিনি সুবিদিত ও সম্মানিত। ওড়িষ্যার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অপরিসীম। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রযত্নে এবং দুই বৎসরের আন্দোলনের ফলে, ময়ূরভঞ্জের মহারাজপ্রমুখ উৎকলের রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিগণের অর্থানুকূল্যে কটক জিলা-স্কুলের সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং র‍্যাভেন্‌শ' সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উহা "র‍্যাভেন্‌শ' কলেজ" নামে পরিচিতি লাভ করে। উক্ত বৎসর হইতেই কটক হাইস্কুল "র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

(খ) ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর পদে

কলেজের অধ্যক্ষের অধীনে এই কলেজিয়েট স্কুলে প্রশংসার সহিত প্রায় তিন বৎসর কাল দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম নির্বাহের পর অনুমান ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন কটক জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন তখন ৮০৲—১০০৲ টাকা ছিল। উক্ত সময়ে দেশের শিক্ষার যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, মধুসূদনের প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা কিরূপে পরিবর্তিত হয়, অতঃপর তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। তাহা হইতে উপলব্ধ হইবে ওড়িষ্যায় নবযুগের প্রবর্তনের মধ্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব কতখানি ছিল।

বাংলাদেশে যেমন উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারিগণ প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও গদ্যপুস্তকাদি রচনার পথপ্রদর্শক ছিলেন, ওড়িষ্যাতেও সেইরূপ খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের দ্বারাই প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়া ওড়িয়া ভাষায় পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছিল। ওড়িষ্যায় এই শ্রেণীর মিশনারিগণের মধ্যে প্রথমেই রেভারেণ্ড সাটন সাহেবের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই সাটন সাহেবের লিখিত ওড়িয়া অভিধান, ইতিহাস ও সাহিত্য-পুস্তকই তৎকালীন ওড়িয়া ছাত্রমণ্ডলীর অবলম্বন ছিল। অভিধানখানি তিনি ভুবনানন্দ ন্যায়ালঙ্কারের সহায়তায় রচনা করেন। তাঁহার লিখিত 'সার সংগ্রহ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইহার মধ্যে সংকলিত কয়েকটি রচনার নাম এইরূপ :— জলীয় বাষ্পর কথা, পক্ষীর কথা, মনর ধৈর্যর কথা। সম্ভবতঃ এগুলি বঙ্গভাষা হইতে অনুবাদিত। কিন্তু এই ওড়িয়া গদ্যরচনা এরূপ অদ্ভুত ছিল যে, কোনও অভিধান বা ব্যাকরণের সাহায্যে সরলভাবে তাহার অর্থবোধ করা দুষ্কর হইত। ইহার পরে পরলোকগত উৎকল-হিতৈষী বিচ্ছন্দ পট্টনায়ক-কৃত বাংলা 'চারুপাঠ' প্রভৃতির ওড়িয়া অনুবাদ পাঠ্য হয়। তাহার ভাষাও বিকৃত ও অশুদ্ধ ছিল এবং বহুস্থানে অনুবাদে প্রকৃত ওড়িয়া ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। অধ্যাপক রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-কৃত বাংলা 'পদ্যমালা', 'পদ্যপাঠ' প্রভৃতির ওড়িয়া অনুবাদ কবিতা-পুস্তকরূপে স্কুলসমূহে পঠিত হইত। এই অনুবাদেও ওড়িয়া ভাষার শুদ্ধতা যথাযথ রক্ষিত হয় নাই।

মধুসূদন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইয়া স্কুলসমূহের ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তকের এই শোচনীয় অবস্থা ও অভাব দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন, এবং এই অবস্থা

পরিবর্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। কবিবর রাধানাথ রায় এই সময়ে ওড়িষ্যার স্কুলসমূহের জয়েণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ; তিনি মধুসূদনের এই চেষ্টার সম্পূর্ণ অনুকূল ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও মধুসূদন কঠোর পরিশ্রম করিয়া, বর্ণশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণীর উপযোগী সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক উৎকলের বিদ্যালয়গুলিকে উপহার দিয়াছিলেন। তদবধি দীর্ঘকাল ধরিয়া এইগুলিই ওড়িষ্যায় পাঠ্য ছিল।

প্রথম খণ্ড 'ছান্দমালা'র কবিতাগুলি অল্পবয়স্ক শিশুদিগের জন্য রচিত। ইহা বর্ণপরিচয়ের পরের শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। ইহার প্রথম কবিতাটিতে জগৎপিতার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অতি সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের প্রতি এই প্রীতি ও ভক্তির ভাব বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে জাগ্রত হইলে মানবসন্তানের অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎপ্রীতি সঞ্চারিত হয়। এই পুস্তকের ষড়ঋতু বর্ণনা সরলতা ও স্বাভাবিকতায় অনন্যসাধারণ ; এই ঋতুগুলির প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ইহাতে অতি সরল-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিরাজ্যে বিভিন্ন ঋতুতে যে শোভা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ হয় ও তাহার মধ্য দিয়া বিধাতার কল্যাণহস্ত যে কিরূপে কার্য করিতেছে তাহার সুললিত বর্ণনা কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের অন্তর-গুলিকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া দেয়। বাল্যে পঠিত এই কবিতা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থাতেও আবৃত্তি করিয়া অনেককে ইহার ভাবরসে নিমগ্ন হইতে দেখিয়াছি। 'পৃথিবী-প্রতি' ও 'জন্মভূমি' কবিতাতে যে স্বদেশ-প্রেম প্রকাশিত, তাহাও বাল্যকাল হইতে শিশুচিত্তকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করে। 'মো জননী' কবিতাটি বাৎসল্যরসের অপূর্ব নিদর্শন।

দ্বিতীয় খণ্ড 'ছান্দমালা' অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদিগের জন্য লিখিত। ইহার প্রথম কবিতা 'স্তব'টি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির স্তুতি। ইহাতে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে বিভুকরুণার নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ কবির অন্তর হইতে যে প্রার্থনা ও ভক্তিরস উৎসারিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরূপ :—

সত্যপথে ধর্মপথে ঘেনি যাঅ মোতে,
ভসাঅ পরাণ মোর তব প্রেমস্রোতে ;
প্রভো পরম শরণ,
এ জীবন শ্রীচরণে কলি সমর্পণ।

কবিতার উক্ত কলিটি কত ব্যাকুলাত্মার কণ্ঠে নিত্য উচ্চারিত হইয়া তাঁহাদিগকে অন্তরে বল দিয়া আসিতেছে।

তাঁহার 'কবিতাবলী' পুস্তকটি বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পঠিত হইত। কিশোরপ্রাণ যখন বিশ্বপতির রচনার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, বহির্জগতের বিচিত্রতা যখন তাহাকে নানা বিষয়ে কৌতূহলী করে, আবার মানবসমাজে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও নানাপ্রকার অবস্থার পরিবর্তন দেখিয়া যখন তাহার জিজ্ঞাসুপ্রাণ কার্য-কারণ অনুসন্ধানে উৎসুক হয়, তখন সেই কিশোরপ্রাণকে ফুটাইবার জন্য ভক্তকবির প্রয়াস এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। শোভা, ধ্বনি, নিশীথ চিন্তা, জীবন চিন্তা প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জন্মভূমির গৌরবসূচক গাথা 'ভারত ভাবনা' কবিতার মধ্যে ভারতের অতীত সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া দেশের তৎকালীন দুরবস্থাদর্শনে ব্যথিত কবি ভারতের জন্য ভারতী-চরণে যে মর্মভেদী প্রার্থনা 'ভারতী বন্দনা'য় নিবেদন করিয়াছেন, সেই কবিতার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

আস মা আস মা আস মা, জননি,
আজি পুণ্য মাঘে পুণ্য শ্রীপঞ্চমী ;
সুচারু নবীন মধু আগমনে
হসই ধরণী আনন্দিত মনে।
আস মা ভারতে ভারতী রাণী !
তিমির সাগরু নব দিনমণি
হিরণ্ময় করে উদ্ধারি ধরণী,
ভারত আকাশ করু সমুজ্জ্বল,
উছলু ভারতে উৎসাহ চহল,
হসু এ ভারত শুণি তো বাণী !...

কিশোর বালক-বালিকার নবীন মানসসমক্ষে কবির এই প্রার্থনা-বাণী কী অপরূপ আশার জ্যোতি আনিয়া দেয় !

মধুসূদনের লেখনী-প্রসূত ওড়িয়া গদ্যপুস্তক 'প্রবন্ধমালা' তৎকালীন বিদ্যালয়পাঠ্য গদ্যসাহিত্যের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বি স্থান অধিকার করিয়া দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

তৎকালে গ্রামসমূহে যে সকল চাটশালী অর্থাৎ পাঠশালা ছিল, তাহাতে

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

যে অবধান (গুরুমহাশয়)-গণ পড়াইতেন, তাঁহাদের পাঠনরীতি শিশুদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী বলিয়া মধুস্থদনের চিত্তে ধারণা জন্মে। তিনি ঐ শিক্ষকদিগকে উপযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে 'অবধান-বন্ধু' নামে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। স্কুল পরিদর্শনে গিয়া তিনি সর্বদাই এই বিষয়ে অবধানদিগকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন।

মধুস্থদন-লিখিত পুস্তকগুলির বহুল প্রচার হওয়ায় পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণের পুস্তকগুলি আর পাঠ্য রহিল না। ইহাতে কোন কোন গ্রন্থকার আন্দোলন উপস্থিত করিয়া, জয়েণ্ট ইন্‌স্পেক্টর রাধানাথ ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মধুস্থদনের উপর দোষারোপ করেন। কিন্তু সে আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে কর্তৃপক্ষের নিকট যোগ্যতমের অগ্রাধিকারই স্বীকৃতি লাভ করে।

এইরূপে ওড়িষ্যার বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করিয়াই মধুস্থদন স্বীয় কর্তব্য সমাপন করেন নাই। বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনকালে শ্রেণী-গুলিতে নিজে পড়াইয়া শিক্ষকদিগকে পাঠন-রীতি শিখাইতেন। ছাত্রদিগের নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করিতেন। কোন বড় গ্রামে কেবল পাঠশালা আছে দেখিলে, তাহাকে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। ইহার ফলে তাহারা উদ্যোগী হইলে, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া উক্ত অঞ্চলে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে রাধানাথ ও মধুস্থদনের সম্মিলিত চেষ্টায় ওড়িষ্যার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছিল।

আদর্শ শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মধুস্থদন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কটক টাউন স্কুল নামে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুলে ভূপতিনাথ বসু, বিশ্বনাথ কর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী কৃতী যুবকগণ শিক্ষকতা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ কর যখন ইহার প্রধানশিক্ষক ছিলেন, তখন স্কুলটির এরূপ উন্নতি হয় যে, প্রতিবৎসর ঐ স্কুলের ছাত্রেরা বৃত্তি লাভ করিত। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উহাকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়, এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এ., তাহার প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু এই বহুব্যয়সাধ্য হাইস্কুলের গুরুভার বহন করা মধুস্থদনের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় দুইবৎসর পরে স্কুলটি পুনরায় মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

কটক জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর-রূপে কার্য করিবার সময় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে

মধুসূদন 'শিক্ষাবন্ধু' নামে একটি মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে অধ্যাপনার বিষয়ে নানারূপ উপদেশ দিয়া প্রবন্ধাবলী লিখিত হইত। তাহাতে শিক্ষকগণের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মধুসূদন ব্যতীত, সাধুচরণ রায়, বিশ্বনাথ কর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্যামসুন্দর নন্দ প্রভৃতি শিক্ষকগণ এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

(গ) র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক

১৮৮০ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মধুসূদন কটক জেলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক রামদাস চক্রবর্তী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় কর্তৃপক্ষ মধুসূদনকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উক্ত স্কুলের প্রধানশিক্ষক-পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে উক্ত পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯২-এর মার্চ মাসে মাসিক ১৫০৲ দেড়শত টাকা বেতনে তিনি ঐ পদে স্থায়ী হন এবং গেজেটেড অফিসার বলিয়া ঘোষিত হন। কটক র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুলে ওড়িয়া প্রধানশিক্ষক মধুসূদনই প্রথম।

ইতঃপূর্বে যখন তিনি ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তখন জেলা-সমিতি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর সভ্যরূপে এরূপ সুখ্যাতিসহকারে কার্য করিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য তিনি দীর্ঘকাল (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ঐ সভ্যপদে নির্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন।

মধুসূদন যখন কলেজিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক তখন হলোয়ার্ড সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেজ ও স্কুল তৎকালে একই স্থানে, অর্থাৎ বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুলটি যেখানে অবস্থিত, সেখানেই ছিল এবং কলেজের অধ্যক্ষই সর্বেসর্বা ছিলেন। হলোয়ার্ড সাহেবের শাসননীতি বেশ কঠোর ছিল। ইনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সকাল ১০টা ২৫ মিনিটের পূর্বে স্কুলের গেট খোলা হইবে না। তাহার ফলে গ্রীষ্মকালে বহু ছাত্রকে গেটের বাহিরে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কষ্টভোগ করিতে হইত। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় না পাইয়া রাত্রিতে কোনও ছাত্র গেটের তালা চুরি করিয়া লয়; অধ্যক্ষ মহাশয়ের অবিচারে বহু নির্দোষ ছাত্র শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে ছাত্রগণের অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভাসমিতি করিয়া অধ্যক্ষের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ চলে।

এ বিষয়ে 'উৎকল দীপিকা'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল :—

"আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কার্যে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। শোনা যাইতেছে, যে-ছাত্রেরা তালা চুরি করিয়াছিল তাহাদের ধরা হইয়াছে। তাহাদের অগ্রণীকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে; ৮।১০টি ছাত্রকে নিম্নশ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিরূপ প্রমাণ পাইয়া ইহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এইরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করা হইয়াছে, তাহা আমরা জানিনা। বালকগণ সর্বত্র অল্পাধিক চঞ্চল ও দুষ্টামিতে অভ্যস্ত। প্রিন্সিপাল সাহেব ১০টা ২৫ মিনিটের পূর্বপর্যন্ত গেট বন্ধ রাখায়, হাতার বাহিরে দাঁড়াইয়া রৌদ্রে কষ্ট পাইয়া তাহারা যদি তালা চুরি করিয়া থাকে, তাহা এতবড় একটা গুরুতর দোষ নহে যে, সেজন্য পিনাল কোডের ফাঁসিদণ্ড-স্বরূপ বালকদের ইহকালের গতি বন্ধ করা যাইতে পারে!"

এই ছাত্রশাসন ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের মতান্তর ও মনান্তর হয়। কোন কোন ছাত্রকে বেত্রদণ্ড দিতে আদেশ করায়, মধুসূদন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "আমি আপনার আদেশ পালন করিতে বাধ্য, কিন্তু আমার বিবেক ইহাতে সায় দেয় না।" ন্যায়ানুরোধে প্রধান-শিক্ষক মধুসূদন, অধ্যক্ষের আদেশ সম্পূর্ণ পালন করিতে না পারায়, অধ্যক্ষ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন—"He is a very good teacher but a weak disciplinarian,"—অর্থাৎ মধুসূদন খুব ভালো শিক্ষক হইলেও ছাত্রশাসনে দুর্বল।

দুই বৎসর প্রধানশিক্ষকের কাজ করিবার পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে উপরি-উক্ত কারণে মধুসূদনের প্রতি স্থানান্তরগমনের আদেশ হয় এবং তিনি বালেশ্বরের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। 'উৎকল দীপিকা' এই ঘটনাতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ :—"মধুবাবু ছাত্রদিগের প্রতি অন্যায় দণ্ডদানে সহায়তা না করিয়া সুবিচারপূর্বক শাসন করায় তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী কর্তৃক নিন্দিত হইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!" (৮।৭।১৮৯৩)

(ঘ) ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক

বালেশ্বরে তিনমাস কার্য করার পর, কটক ট্রেনিং স্কুলের হেডমাস্টার, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী মহাশয়, সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করায়, মধুসূদন উক্তপদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর ঐ কার্যভার গ্রহণ করেন। ইতঃপূর্বে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-নীতি সম্বন্ধে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্ট হইয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বিশ্বনাথ কর। তিনি 'সম্বলপুর হিতৈষিণী' পত্রিকায় এ বিষয়ে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ:— "সাহিত্য, গণিত, সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ের চর্চা অতি হীনভাবে হইতেছে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ শিক্ষকতা-শিক্ষণের জন্য এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে; কিন্তু যে-সাহিত্য তাহারা পূর্বেই পড়িয়া আসিয়াছে, তাহাই এখানে তাহাদিগকে চর্বিত-চর্বণ করিতে হয়। রচনার অনুশীলন প্রায় নাই বলিলেই হয়। গণিতের শিক্ষাও তদনুরূপ। ভূগোল-শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ শোনা যায় যে, কোন বুদ্ধিমান ছাত্র শিক্ষক-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে—'বইতে লেখা আছে যে, পৃথিবী শূন্যে আছে ও সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথিবী স্থির ও বাসুকি নাগ ইহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছে। এই দুই তথ্যের কোন্‌টি প্রকৃত সত্য?' পণ্ডিতমহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—'মূর্খ! পুরাণে কি মিথ্যাকথা বলে? বইতে যা লেখা আছে, তা শুধু পরীক্ষা পাস করার জন্য; মুখস্থ করিয়া যাও'।" এই সমস্ত উল্লেখ করিয়া বিশ্বনাথ কর ট্রেনিং স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন এবং পরীক্ষা-বিধি পরিবর্তনের দাবী জানাইয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিদ্‌রূপে বিশ্বনাথ কর তৎকালে ওড়িষ্যায় সুপরিচিত ছিলেন ও তাঁহার এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

মধুসূদন এই স্কুলের কার্যভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে, উপরি-উক্ত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ সত্য। স্কুলের এই অবস্থা দর্শনে ব্যথিত মধুসূদন ইহার প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মধুসূদন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর থাকাকালে প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও পাঠন-রীতিতে যে সমস্ত ত্রুটি ও অভাব দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, ও তাহা দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন, এখন ভগবান সেই ত্রুটি-অভাব

পূরণের ভার তাঁহার উপরেই দিলেন। তিনিও বিধিদত্ত এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া তিনি তাঁহার মনের মতো শিক্ষক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহন মহারাণা ও পণ্ডিত মধুসূদন দাস এই দুইজন দক্ষ সহকারী লইয়া তিনি এই স্কুলের যে অপূর্ব পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা কটক ট্রেনিং স্কুলের ইতিহাসে এবং উড়িষ্যার মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল।

'ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন'-এর লেখক মৃত্যুঞ্জয় রথ লিখিয়াছেন—"স্কুলের এই যুগটিকে 'মধুসূদনযুগ' বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" ট্রেনিং স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ওড়িষ্যার মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য করিতেন। মধুসূদন এই ছাত্রগণের জ্ঞানোন্নতির জন্য প্রথমেই উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিলেন। সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা এই কয়েকটি বিষয় তখন ঐ বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা তো তিনি করিলেনই, তদতিরিক্ত জ্যোতির্গণিত (Astronomy), অর্থনীতি (Political Economy), রসায়ন (Chemistry) এবং 'স্থিতি-গতি শাস্ত্র' (Statics and Dynamics) এই কয়েকটি বিষয়ও শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি, ইংলণ্ড গ্রীস ও রোমের ইতিহাস-পুস্তক তখন ওড়িয়া ভাষায় মুদ্রিত না হওয়ায়, বাংলাভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িতে হইত। এইসকল পঠিতব্য বিষয়ে ছাত্রগণের শিক্ষা কিরূপ অগ্রসর হইতেছে জানিবার জন্য তিনি অপর শিক্ষকগণের অধ্যাপনা-সময়ে তাঁহাদের শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেন, এবং প্রয়োজন বুঝিলেই নিজে তদ্‌বিষয়ের আলোচনার দ্বারা শিক্ষকগণের শিক্ষণ-কার্যের সহায়তা করিতেন। ইহা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে চিরমুদ্রিত হইয়া উত্তরজীবনে তাঁহাদের শিক্ষকতা-ক্ষেত্রে পরম সহায়তা করিত।

প্রাচীন রীতির সংস্কৃত অধ্যাপনার পরিবর্তে, ছাত্ররা যাহাতে ব্যাকরণে আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ করিয়া মাতৃভাষায় সংস্কৃতকে উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে কিংবা সার্থক অনুবাদ করিতে পারে, তিনি সেজন্য যত্নশীল ছিলেন। অনেক সময় শ্রেণীতে আসিয়া তিনি সংস্কৃত পাঠ্য 'উত্তররামচরিত' নাটক হইতে আদর্শ অনুবাদ করিয়া ছাত্রগণকে শিখাইতেন। সকল বিষয়ে ছাত্রগণের যথোচিত শিক্ষার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে হইত যে, অবসর থাকিলে, সমস্ত বিষয় তিনি নিজেই পড়াইতেন। ইতিমধ্যে ট্রেনিং স্কুলের গণিত-শিক্ষক

চন্দ্রমোহন মহারাণা বদলি হইয়া পুরী গমন করিলে, মধুসূদন কয়েকবৎসর স্বীয় স্কুলের সাহিত্য ও গণিত উভয় বিষয় শিখাইবার ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। অন্য সুযোগ্য সহকারী থাকা সত্ত্বেও, আগ্রহ সহকারে গণিত-শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের কারণ দেখাইতে গিয়া বলিলেন যে, ছাত্রাবস্থায় তিনি আশানুরূপ গণিত-চর্চা করিতে না পারায় যেসব ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এই সুযোগে অনুশীলন দ্বারা সেই ত্রুটি কতক পরিমাণে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিবেন। দেখা যাইত, শ্রেণীতে অঙ্ক কষিতে দিয়া তিনি নিজেও ছাত্রের ন্যায় অঙ্ক কষিতে লাগিয়া গিয়াছেন। ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রদিগকে তিনি প্রায়শঃ বলিতেন—"তোমাদের মধ্যে যাহারা অঙ্কে একটু অপরিপক্ক আছ, শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া, তোমরা যদি কিছুদিন অঙ্ক কষাইবার ভার লও ও তজ্জন্য সামান্য চেষ্টা কর, তাহা হইলেই দেখিবে যে, তোমাদের সেই ত্রুটি-দুর্বলতা বিদূরিত হইয়াছে।"

পাটীগণিতের প্রশ্ন-সমাধানের সহজ সুবোধ্য রীতি এবং শিশুগণের উপযোগী সরল ব্যাখ্যান-পদ্ধতি ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ শিক্ষক-জীবনে কত প্রয়োজনীয় হইবে, তাহা তিনি বিশেষভাবে ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। ফলতঃ, তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও পাঠনার গুণে, কটক ট্রেনিং স্কুলে গণিত এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ছাত্রগণের জ্ঞানদ্বার পূর্বাপেক্ষা প্রশস্ততর ও শিক্ষণ-পদ্ধতির অভূতপূর্ব উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল।

সাহিত্য পড়াইবার সময়ে তিনি কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতেন না; অধীতব্য বিষয়ের অনুরূপ ভাবসম্পন্ন উক্তিসমূহ অন্যান্য পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া, তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা ধারণা ছাত্রমনে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিতে সর্বদা প্রয়াসী হইতেন। এইজন্য কত সময়ে তাঁহার টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হইত—কত সংস্কৃত কাব্য নাটক উপনিষদ্ সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী! অলঙ্কার শাস্ত্র পড়াইবার সময় মধুসূদন সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীর আলোচনা তো করিতেনই, এমনকি তাঁহার ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও, তাহাদিগকে ঐ ভাষার অলঙ্কারের ব্যাখ্যান ও কাব্যোক্তি এবং সংস্কৃত অলঙ্কারাবলীর সহিত তাহার তুলনার দ্বারা বিষয়টিকে ছাত্রের বোধগম্য না করিয়া ছাড়িতেন না।

ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষোন্নতি ব্যাপারেও তাঁহার অনুরূপ সজাগ দৃষ্টি ছিল। এমনকি যে ড্রিল-শিক্ষা, যাহাতে ছাত্রগণ

সচরাচর বীতস্পৃহ থাকে, সেই ড্রিলের ঘণ্টায় ছাত্রদলে যোগদান করিয়া ড্রিল-শিক্ষকের আদেশানুযায়ী তাঁহাকে আগ্রহ-সহকারে ড্রিল করিতেও দেখা যাইত। ইহা দেখিয়া ছাত্রগণের কি আর ড্রিল-প্রতি উদাসীন হইবার উপায় থাকিতে পারে!

মধুসূদনের অধ্যাপনার বিশেষ রীতি ছিল—কিরূপে অল্পকালমধ্যে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাবরাশি নিহিত করা যায়। মনে হয়, এ বিষয়ে তিনি হিতোপদেশের এই নীতিটি সর্বদা স্মরণে রাখিতেন :—

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পম্ তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

(ঙ) উৎকল সাহিত্য-সমাজের উৎপত্তি

কটক ট্রেনিং স্কুলে আসিবার কয়েক মাসের মধ্যেই মধুসূদন ছাত্রগণের রচনাশক্তি ও তাহাদিগের অন্তরে উচ্চভাব বিকাশের সাহায্যের জন্য একটি আলোচনা-সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধুকে লইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেনিং স্কুলে একটি আলোচনা-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্যের, বিশেষতঃ ওড়িয়া-সাহিত্যের অনুশীলনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি শনিবারে ইহার অধিবেশন হইত। চন্দ্রমোহন মহারাণা ইহার প্রথম সম্পাদক। ট্রেনিং স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রগণ ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ ট্রেনিং স্কুলের বহির্ভূত যেসকল সাহিত্যামোদিগণ ইহার সভ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ কর, রাজমোহন বসু, নন্দকিশোর বল, মিছু নন্দ, কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই আলোচনা-সভা ট্রেনিং স্কুলের বহু ছাত্রের রচনাশক্তির উদ্বোধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ট্রেনিং স্কুলের সহিত সংসৃষ্ট থাকিলেও, ইহা তৎকালীন কটক নগরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সভা ছিল। প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন প্রায় নয়বর্ষকাল ইহার সভাপতির কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তৎপরে গঞ্জামে আহূত 'উৎকল সম্মিলনী' হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী ভদ্রব্যক্তি উৎকলে একটি সাহিত্য-সভার প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি করিয়া, নবীন উৎসাহে একটি বড় সাহিত্য-সভা স্থাপনের পরামর্শ করেন। তদনুসারে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে কটক ট্রেনিং স্কুলের এই আলোচনা-সভা প্রশস্ততর ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া 'উৎকল সাহিত্যসমাজ' নামে অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহার নামকরণ, সংগঠন, নিয়মাবলী প্রণয়ন প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই মধুসূদন অগ্রণী ছিলেন ; আমরণ রোগজীর্ণ দেহে ইহার সভাপতির কার্য তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

(চ) 'মহাযাত্রা' আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৯৮) কোন ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তি কবিবর রাধানাথ রায়-লিখিত 'মহাযাত্রা' নামক মহাকাব্যের কোন-কোন অংশ রাজদ্রোহমূলক বা ব্রিটিশ শাসনের গ্লানিকর বলিয়া রাজপুরুষগণের গোচরে আনয়ন করেন।

অষ্টাদশ সর্গে এই মহাকাব্যখানি শেষ করিবেন, কবির এইরূপ পরিকল্পনা ছিল। ইহার সাত সর্গ পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছিল এবং আরও পাঁচ সর্গের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রথম খণ্ড (সাতসর্গ) প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিরুদ্ধে ঘৃণিত আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত রাজরোষ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাধানাথ স্থানে স্থানে ইহার পরিবর্তন ও কতকাংশ পরিবর্জন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত চিত্তে তিনি অবশিষ্ট পাঁচ সর্গের পাণ্ডুলিপি এবং পরবর্তী ছয় সর্গের খসড়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। এইরূপে পরাধীন জাতির এক চরম দুর্ভাগ্যের ফলে ওড়িয়া সাহিত্য ও ওড়িয়া জাতি এক অমূল্য সম্পদ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ভক্তকবি মধুসূদন অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই কাব্যখানি ওড়িয়া ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রয়াস হইলেও, উক্ত ছন্দের যথাযথ প্রয়োগে রাধানাথ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ছন্দের নূতনত্ব ছাড়াও কাব্যখানির অধিকতর মূল্য এই কারণে যে, রাধানাথের কবিপ্রতিভা ইহাঁতে সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং ইহা তাঁহার দেশভক্তির সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

সূচনায়, কবি যেরূপে দেবী সারলা (উৎকল-ভারতী)-কে বন্দনা করিয়া কাব্যারম্ভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে অবশ্যই পূর্বসূরি মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে :

পঙ্কজবাসিনী দেবি, উৎকল-ভারতী
সারলে, কি কলে, কহ, কুরুচূড়ামণি
শুনিলে যেকালে বীর বার্তাবহ মুখে
প্রভাসে যাদবঙ্কর জ্ঞাতি-ক্ষয়কারী
মহাহব।...

প্রভাসে আত্মকলহে লিপ্ত যদুবংশের শোচনীয় বিনাশবার্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিবরণ দূতমুখে শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির সংসারত্যাগে দৃঢ়সংকল্প হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যখন মহাপ্রস্থান করিলেন তখন কবি পাণ্ডবগণকে লইয়া ওড়িষ্যায় আসিলেন। তাঁহাদের শুভাগমনে ওড়িষ্যার বহুস্থান পৌরাণিক মহিমায় মণ্ডিত হইয়া পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্ররূপে 'মহাযাত্রা' কাব্যে স্থানলাভ করিয়াছে। তারপর যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানোজ্জ্বলিত নিষ্কলুষ দৃষ্টিতে আসন্ন-প্রায় কলিযুগের সুপরিস্ফুট ছবি ফুটাইয়া কবি দেখাইতেছেন—ভারতের সুপ্রাচীন মহিমা ধ্বংসমুখে আপতিত, ধর্ম সত্য ন্যায় তপস্যা জ্ঞান দয়া ক্ষমা সরলতা ত্যাগ মৈত্রী বৈরাগ্য সন্তোষাদি আর্যসভ্যতার সদ্‌গুণাবলী ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে, তাহার স্থলে আসিতেছে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য হিংসা চৌর্য আলস্য মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনা, হত্যা ইত্যাদি পাপরিপুচয়।

দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যভারতের দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া যুধিষ্ঠির অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

প্রভু, ত্রিকালদরশি
তুম্ভে যেণু, কহ্ মোতে কিরূপে ভারতে
ঘটিব এ মহানর্থ—সুজলা সুফলা,
এ শস্য-শ্যামলা ধরা পর হাতে দেই
পরপাদানত কি হে হেবে আর্যসুতে!

একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর লেখনী হইতে এইরূপ রাজবিদ্বেষপূর্ণ রচনা বাহির হইয়াছে জানিয়া সরকারের ঘোর সন্দেহ এবং বিরক্তি রাধানাথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। মধুসূদন ঐ সময়ে মহাযাত্রার অযথা নিন্দিত অংশসমূহের নির্দোষ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কবির সদভিপ্রায় প্রতিপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে কোন-কোন রাজকর্মচারী মধুসূদনকেও সন্দেহভাজন মনে করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পেড্‌লার সাহেব (Sir Alexander Pedlar) পরিদর্শনের জন্য কটকে আসেন। তাঁহার মনে মধুসূদন সম্বন্ধে উক্ত সন্দেহ জাগ্রত থাকায়, সাহেব বিরক্তমনে ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শন করিয়া, অসন্তোষের কোন কারণ না পাইলেও,—কোন কোন বিষয়ে অনধিকারচর্চা করা হইয়াছে —মধুসূদনের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করেন। কিন্তু মধুসূদন দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ দিয়া সাহেবের বিরক্তি এরূপ দূর করিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয়বার স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া পেড্‌লার সাহেব অকপটচিত্তে মধুসূদনের সমস্ত কার্যের সুখ্যাতি করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উক্ত 'মহাযাত্রা' আন্দোলন ইহার পর থামিয়া যায়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ রায় বর্ধমান বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া চলিয়া যাওয়ায়, জগবন্ধু লাহা ওড়িষ্যার ইন্‌স্পেক্টর হইয়া কটকে আসেন। তৎপরে রুথার সাহেব (Ruther) ওড়িষ্যায় ইন্‌স্পেক্টর হইয়া আসেন। ইনি অল্প কয়েকমাস মাত্র ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তাহারই মধ্যে মধুসূদনকে তাঁহার অসদ্ব্যবহারে দারুণ অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই সময় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে সম্বলপুরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই পত্রে মধুসূদনের তৎকালীন অশান্তির কারণ সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে।—

কটক। ১৪।১১।১৯০০

প্রাণাধিকেষু,

বাবা, পত্র পাইয়াছি। একে শরীর শূলাদিরোগে কাতর, তার উপর সংসারের জঞ্জাল হৃদয়কে দিন দিন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এখন যে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছেন (Mr. Ruther), সে এক অদ্ভুত জীব। তিনি প্রথম-প্রথম আমার দ্বারা য়্যানুয়াল রিপোর্ট প্রভৃতি কঠিন কাজ করাইয়া লইয়া আমার উপর খুব প্রসন্নতা প্রকাশ করেন। এখন তাঁহার স্বার্থের সঙ্গে আমার কর্তব্যের সংঘর্ষ হওয়াতে আমার স্কুলের একজন মুসলমান শিক্ষকের চাটুক্তি প্রভৃতি কদুপায়ে বশীভূত হইয়া আমার স্কুলের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আমার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবেন, তাহা নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ দুর্নীতিপরায়ণ লোকের অধীনে কাজ করিতে হইতেছে। আমি তিন মাসের ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছি এবং শীঘ্রই রিটায়ার করিবার বিষয় ভাবিতেছি। আর্থিক অবস্থা বড়ই প্রতিকূল, অথচ শরীর ও মন উভয়ই আর এরূপ সার্ভিস-এ থাকিতে পরাঙ্মুখ। —শ্রীমধুসূদন

*

যাহা হউক, রুথার সাহেব অল্পদিন পরে ওড়িষ্যার কার্য হইতে যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি মধুসূদনের প্রতি যে অবিবেচনা করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত চিত্তে স্বয়ং মধুসূদনের গৃহে আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা একদিকে যেমন মধুসূদন-চরিত্রের শুদ্ধতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক, অপরদিকে ইহা ইংরাজ চরিত্রের ন্যায়নিষ্ঠারও অপূর্ব উদাহরণস্থল। কারণ, অধস্তন কর্মচারীর প্রতি অন্যায় দুর্ব্যবহার সংসারে বহুস্থলেই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিয়া অকপটে ত্রুটি-স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ট্রেনিং স্কুলে হেডমাস্টার থাকাকালেই মধুসূদন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত অস্থায়িভাবে ওড়িষ্যায় জয়েণ্ট-ইন্‌স্পেক্টরের কার্য করিয়াছিলেন। একই সময়ে এইরূপ দুইটি দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার বহন করা তাঁহার জীবনে কয়েকবারই ঘটিয়াছে।

(ছ) ওড়িষ্যা বিভাগের জয়েণ্ট ইন্‌স্পেক্‌টর

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের সরকারি কার্যের (বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস) সপ্তম শ্রেণীতে (বেতন ২৫০৲ টাকা) উন্নীত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-বিভাগীয় নূতন ব্যবস্থানুযায়ী তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন, তখন তাঁহার বেতন হয় ৩৫০৲ টাকা। তৎপরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুলাই পর্যন্ত তিনি অস্থায়িভাবে ওড়িষ্যার স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের কার্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তিনি বিভাগীয় পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ৪০০৲ টাকা বেতন পান এবং ১০ই অক্টোবর, ১৯০৭ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ মাস কাল অস্থায়িভাবে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের কার্য করেন। এই কয়েকমাস

তিনি ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের (Indian Educational Service) কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মাসিক একশত টাকা অতিরিক্ত ভাতা পাইয়াছিলেন। ১৪ই মার্চ (১৯০৮) হইতে তিনি ওড়িষ্যার জয়েণ্ট-ইন্‌স্পেক্টর রূপে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু ঐ সময়ে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া কেহ না আসা পর্যন্ত তিনি উভয় কার্যই সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়-পরিদর্শনকালে মধুসূদনের পরিদর্শন-রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। পরিদর্শন কথার অর্থ—পরি, অর্থাৎ সর্বদিকে, দর্শন। মধুসূদনের এইরূপ পরিদর্শন দ্বারা ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই পরীক্ষা হইত বলিয়া, তাঁহার পরিদর্শনের পূর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত। তিনি যে কেবল শিক্ষকগণের কার্য এবং শিক্ষাদানপ্রণালীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন তাহা নহে, তৎসঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রগণের আচরণের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতেন। ছাত্রগণের পোশাক-পরিচ্ছদ, বসিবার দাঁড়াইবার ও পুস্তক ধরিবার ভঙ্গী ও পঠন-রীতির মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশোধন করিতেন। শিক্ষকগণের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, শিক্ষাদান-ক্ষমতা ও শাসন-পটুতা প্রভৃতি বিষয়ে ত্রুটি দেখিলে, পরিদর্শনের পরে নির্জনে তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া সে-বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা করিতেন, এবং অনেক সময়ে শ্রেণীমধ্যে সুবুদ্ধি-পরিচায়ক নানা প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রগণের নিকট হইতে সন্তোষজনক উত্তর আদায় করিয়া, নূতন পাঠন-রীতির সংকেত দেখাইয়া দিতেন।

ওড়িষ্যার ইন্‌স্পেক্টর রূপে কার্যকালে মধুসূদনকে ‘মোগলবন্দী’[১] ছাড়া, গড়জাতের বিদ্যালয়গুলিও পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল। সেই সুযোগে তিনি গড়জাতের দেশীয় রাজ্য গুলিতে ভ্রমণ করিয়া কেবল যে রাজন্যগণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু উৎকল প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তাঁহার কবি-চিত্ত অশেষ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।

---

১ মোগলবন্দী—সমুদ্রোপকূলবর্তী তিনটি জেলা; যথা—কটক, পুরী ও বালেশ্বর। এই অঞ্চলেই মুসলমান শাসন (পরে মারাঠা এবং ইংরাজ শাসন) প্রবর্তিত হয় বলিয়া, এই অঞ্চলকে ‘মোগলবন্দী’ বলা হইত। ওড়িষ্যার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল চিরকালই দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। এই শেষোক্ত অঞ্চল ওড়িষ্যায় ‘গড়জাত’ নামে পরিচিত।

এইরূপে সমগ্র উৎকলের ঘরে ঘরে সাধুচরিত্র উদারচেতা শিক্ষাগুরু মধুসূদনের নাম সুপরিচিত হইয়াছিল ; তাহার অন্যতর প্রধান কারণ এই যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পর্যন্ত অধিকাংশ শ্রেণীর ওড়িয়া সাহিত্য, প্রবন্ধ ও কবিতা সম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত বর্ণবোধ, শিশুবোধ, বিজ্ঞানপাঠ, অঙ্ক-পুস্তক প্রভৃতি ওড়িষ্যার সমস্ত বিদ্যালয়ে অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য, কর্মদক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভুষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান এবং উচ্চতর উপাধি তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী তৎপূর্বেই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ; তাহা হইল 'ভক্তকবি'। এই আখ্যার দ্বারাই তিনি সমগ্র উৎকলে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

এইরূপে নিষ্ঠার সহিত মাতৃভাষা ও উৎকলীয় ছাত্র এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের সেবা করিতে করিতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মধুসূদন সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়াও স্বাধীনচেতা মধুসূদন কোনওদিন বিদেশী সরকারের তুষ্টিসাধনের জন্য দেশের অনিষ্টকর কোনও কার্য করেন নাই। তাঁহারই যত্নে প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও অস্পৃশ্য জাতিসমূহের জন্য বিদ্যালয় ইত্যাদি কত যে সদনুষ্ঠান তিনি নানা স্থানে করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দিকে তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'টাউন ভিক্টোরিআ হাইস্কুল'-এর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে অতঃপর উল্লেখিত হইল।

(জ) টাউন ভিক্টোরিআ হাইস্কুল

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আদর্শ শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মধুসূদন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কটকে 'টাউন স্কুল' নামে যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উহাকে হাইস্কুলে উন্নীত করিয়া অল্পকাল পরেই পুনরায় তাহাকে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে বাধ্য হন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধুসূদন আবার এই বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে উন্নীত করিতে প্রয়াসী হইলেন। সেই সময়ে ওড়িষ্যায় ইংরাজি শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের

আগ্রহ বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র প্রদেশে নিতান্তই অল্প। এইসমস্ত বিদ্যালয় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বলিয়া, বিভাগীয় নিয়মানুযায়ী ইহাদের ছাত্র-বেতনের হার, দরিদ্র ছাত্রগণের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। বিনাবেতনে বা অর্ধবেতনে ছাত্রগ্রহণ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও সরকারি বিদ্যালয়ে কঠোর ছিল। সে-কারণে অনেক দরিদ্র ছাত্র মফস্বল এবং নিকটস্থ গড়জাত অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য অঞ্চল হইতে কটকে আসিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বিফলমনোরথ হইতেছে দেখিয়া, বিদ্যোৎসাহী ও ছাত্রবন্ধু মধুসূদন প্রধানতঃ দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যকল্পে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী. সোমবার, তাঁহার মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়কে পুনরায় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করিলেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পূর্বেই তদানীন্তন ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিআ (২২ জানুয়ারী, ১৯০১) পরলোকগমন করিয়াছিলেন। মহারাণীর প্রতি সাধারণ-ভারতবাসীর ন্যায় মধুসূদনেরও প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধাভক্তিকে স্মরণীয় করিবার জন্য মধুসূদন এই সময়ে তাঁহার স্কুলটির সহিত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিআর নাম সংযুক্ত করিয়া, ইহার নূতন নামকরণ করিলেন—টাউন ভিক্টোরিআ হাইস্কুল।

কটক চাঁদনীচক থানার নিকটবর্তী ফাদারবক্স-এর পাকাবাড়ীর দ্বিতলে মধুসূদন এগারজন শিক্ষক ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে উপস্থিত হইলেন। তদ্গতচিত্তে ব্রহ্মোপাসনাপূর্বক, "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" বলিয়া ভগবানের নিকট শক্তি ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া সেদিন মধুসূদন যে প্রাণস্পর্শী উপাসনা করিয়াছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকের স্মৃতিতে তাহার কথা ও উপাসনাকালীন মধুসূদনের দিব্যজ্যোতি-উদ্ভাসিত মুখশ্রী আজীবন জাগরূক ছিল।

ইতঃপূর্বেই শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর এই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদত্যাগ করিয়া 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত শিক্ষকগণকে লইয়া নূতন বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল—

১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম.এ. (হেডমাস্টার); ২। শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বল, বি.এ.; ৩। শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ রায় (সহঃ সম্পাদক); ৪। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর নন্দ; ৫। শ্রীযুক্ত মাধবানন্দ কাব্যতীর্থ; ৬। শ্রীযুক্ত মিছু নন্দ; ৭। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রথ; ৮। শ্রীযুক্ত দামোদরপ্রসাদ তেজ; ৯। শ্রীযুক্ত চৈতন্যপ্রসাদ জানা; ১০। মৌলবী বসিরুদ্দীন।

শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ রায়—নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মধুসূদনের সহোদর জগন্নাথ রাওয়ের কনীয়ান জামাতা ছিলেন। তিনি বিনা-বেতনে এই স্কুলের শিক্ষকতা এবং সহকারী সম্পাদকের কার্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার এইরূপ ত্যাগ ও সাহায্যদান সর্বথা প্রশংসার যোগ্য।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণী ছাত্রগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও, স্কুলের আয় সেই তুলনায় বাড়িল না। কারণ ছাত্র-বেতনের হার অতি অল্প, তদুপরি বহু দরিদ্র ছাত্র নানা স্থান হইতে আসিয়া দরিদ্রবন্ধু মধুসূদনের নিকট স্কুলে পড়িবার জন্য আবেদন করিতে লাগিল। মধুসূদনও কাহাকে অর্ধবেতনে, কাহাকেও বা বিনা-বেতনে, পড়িবার আদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে স্কুলের যে ক্ষতি হইত তাহা তিনি নিজেই পূরণ করিতে লাগিলেন। সেসময় প্রতি শনিবার ছাত্রদিগকে কিছু নীতিশিক্ষা দিবার রীতি ছিল। তৎপরে, স্কুলের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য শিক্ষকগণের যে কমিটী ছিল, তাহার অধিবেশন হইত। এই কমিটীতে মধুসূদন আজীবন সভাপতি ছিলেন ও নিয়মিতভাবে কমিটীর কার্য করিতেন। কমিটী অনেক সময় অবৈতনিক ছাত্রবৃদ্ধি বিষয়ে আপত্তি তুলিতেন, কিন্তু মধুসূদন দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানে বিরত হইতে পারেন নাই।

তখন শিক্ষকগণ অল্পবেতনে কার্য করিলেও, স্কুলের মাসিক ব্যয় প্রায় তিনশত টাকার মতো ছিল। ছাত্রদত্ত বেতনের আয় মাসিক ২০০৲ দুইশত টাকার কাছাকাছি হইত এবং বামণ্ডার (দেশীয় রাজ্য) মহারাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব মাসিক চল্লিশটাকা সাহায্য দিতেন। তথাপি মধুসূদনকে মাসিক প্রায় পঞ্চাশটাকা সাহায্য করিতে হইত। মধুসূদন তখন ট্রেনিং স্কুলের প্রধানশিক্ষক, বেতন ২০০৲ দুইশত টাকা। সুতরাং তাঁহার পক্ষে মাসিক পঞ্চাশটাকা সাহায্যদান কষ্টকর ছিল। ছাত্রগণের বেতন কিছু বাড়াইয়া দিলে আয় বাড়িতে পারিত, কিন্তু তাহাতে তিনি স্বীকৃত হন নাই। কোন কোন বন্ধু স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতেও অসম্মত হইয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "সামান্য অর্থলোভে সমস্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা হারানো বুদ্ধির কার্য নহে"।

সরকারী সাহায্য লওয়া হইল না দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন

আগ্রহ বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র প্রদেশে নিতান্তই অল্প। এইসমস্ত বিদ্যালয় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বলিয়া, বিভাগীয় নিয়মানুযায়ী ইহাদের ছাত্র-বেতনের হার, দরিদ্র ছাত্রগণের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। বিনাবেতনে বা অর্ধবেতনে ছাত্রগ্রহণ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও সরকারি বিদ্যালয়ে কঠোর ছিল। সে-কারণে অনেক দরিদ্র ছাত্র মফস্বল এবং নিকটস্থ গড়জাত অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য অঞ্চল হইতে কটকে আসিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বিফলমনোরথ হইতেছে দেখিয়া, বিদ্যোৎসাহী ও ছাত্রবন্ধু মধুসূদন প্রধানতঃ দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যকল্পে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী. সোমবার, তাঁহার মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়কে পুনরায় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করিলেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পূর্বেই তদানীন্তন ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিআ (২২ জানুয়ারী, ১৯০১) পরলোকগমন করিয়াছিলেন। মহারাণীর প্রতি সাধারণ-ভারতবাসীর ন্যায় মধুসূদনেরও প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধাভক্তিকে স্মরণীয় করিবার জন্য মধুসূদন এই সময়ে তাঁহার স্কুলটির সহিত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিআর নাম সংযুক্ত করিয়া, ইহার নূতন নামকরণ করিলেন—টাউন ভিক্টোরিআ হাইস্কুল।

কটক চাঁদনীচক থানার নিকটবর্তী ফাদারবক্স-এর পাকাবাড়ীর দ্বিতলে মধুসূদন এগারজন শিক্ষক ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে উপস্থিত হইলেন। তদ্গতচিত্তে ব্রহ্মোপাসনাপূর্বক, "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" বলিয়া ভগবানের নিকট শক্তি ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া সেদিন মধুসূদন যে প্রাণস্পর্শী উপাসনা করিয়াছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকের স্মৃতিতে তাহার কথা ও উপাসনাকালীন মধুসূদনের দিব্যজ্যোতি-উদ্ভাসিত মুখশ্রী আজীবন জাগরূক ছিল।

ইতঃপূর্বেই শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর এই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদত্যাগ করিয়া 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত শিক্ষকগণকে লইয়া নূতন বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল—

১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম.এ. (হেডমাস্টার); ২। শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বল, বি.এ.; ৩। শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ রায় (সহঃ সম্পাদক); ৪। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর নন্দ; ৫। শ্রীযুক্ত মাধবানন্দ কাব্যতীর্থ; ৬। শ্রীযুক্ত মিছু নন্দ; ৭। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রথ; ৮। শ্রীযুক্ত দামোদরপ্রসাদ তেজ; ৯। শ্রীযুক্ত চৈতন্যপ্রসাদ জানা; ১০। মৌলবী বসিরুদ্দীন।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ রায়—নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মধুসূদনের সহোদর জগন্নাথ রাওয়ের কনীয়ান জামাতা ছিলেন। তিনি বিনা-বেতনে এই স্কুলের শিক্ষকতা এবং সহকারী সম্পাদকের কার্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার এইরূপ ত্যাগ ও সাহায্যদান সর্বথা প্রশংসার যোগ্য।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণী ছাত্রগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও, স্কুলের আয় সেই তুলনায় বাড়িল না। কারণ ছাত্র-বেতনের হার অতি অল্প, তদুপরি বহু দরিদ্র ছাত্র নানা স্থান হইতে আসিয়া দরিদ্রবন্ধু মধুসূদনের নিকট স্কুলে পড়িবার জন্য আবেদন করিতে লাগিল। মধুসূদনও কাহাকে অর্ধবেতনে, কাহাকেও বা বিনা-বেতনে, পড়িবার আদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে স্কুলের যে ক্ষতি হইত তাহা তিনি নিজেই পূরণ করিতে লাগিলেন। সেসময় প্রতি শনিবার ছাত্রদিগকে কিছু নীতিশিক্ষা দিবার রীতি ছিল। তৎপরে, স্কুলের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য শিক্ষকগণের যে কমিটী ছিল, তাহার অধিবেশন হইত। এই কমিটীতে মধুসূদন আজীবন সভাপতি ছিলেন ও নিয়মিতভাবে কমিটীর কার্য করিতেন। কমিটী অনেক সময় অবৈতনিক ছাত্রবৃদ্ধি বিষয়ে আপত্তি তুলিতেন, কিন্তু মধুসূদন দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানে বিরত হইতে পারেন নাই।

তখন শিক্ষকগণ অল্পবেতনে কার্য করিলেও, স্কুলের মাসিক ব্যয় প্রায় তিনশত টাকার মতো ছিল। ছাত্রদত্ত বেতনের আয় মাসিক ২০০৲ দুইশত টাকার কাছাকাছি হইত এবং বামণ্ডার (দেশীয় রাজ্য) মহারাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব মাসিক চল্লিশটাকা সাহায্য দিতেন। তথাপি মধুসূদনকে মাসিক প্রায় পঞ্চাশটাকা সাহায্য করিতে হইত। মধুসূদন তখন ট্রেনিং স্কুলের প্রধানশিক্ষক, বেতন ২০০৲ দুইশত টাকা। সুতরাং তাঁহার পক্ষে মাসিক পঞ্চাশটাকা সাহায্যদান কষ্টকর ছিল। ছাত্রগণের বেতন কিছু বাড়াইয়া দিলে আয় বাড়িতে পারিত, কিন্তু তাহাতে তিনি স্বীকৃত হন নাই। কোন কোন বন্ধু স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতেও অসম্মত হইয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "সামান্য অর্থলোভে সমস্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা হারানো বুদ্ধির কার্য নহে"।

সরকারী সাহায্য লওয়া হইল না দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন

যে, এই স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিবেনা; কিন্তু তাহাতে অনুমোদন লাভে কোন বাধা হয় নাই।

প্রথম বৎসরের শেষেই অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য যে কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়জন ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিল:—উমাকান্ত মহাপাত্র, প্রশান্ত রাও (মধুসূদনের দ্বিতীয় পুত্র), নগেন্দ্রনাথ শীল, আর্তবন্ধু মহান্তি, জগন্নাথ মহান্তি ও বৈদ্যনাথ পট্টনায়ক।

প্রথম বৎসরেই এইরূপ সফলতালাভ শিক্ষক ও পরিচালকবর্গের আনন্দের বিষয় হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত যে পাকাবাড়িতে স্কুল চলিতেছিল, ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায়, সেখানে স্থানাভাববশতঃ মধুসূদনের কালীগলিস্থ নিজগৃহে স্কুলটি কয়েক মাসের জন্য স্থানান্তরিত হয়। তৎপর সেখান হইতে জগন্নাথ রাও মহাশয়ের অধিকৃত বাঙ্কা-বাজারস্থিত 'শ্রীহাট' নামে পরিচিত স্থানে স্কুলটি উঠিয়া আসে। নিজস্ব গৃহ প্রস্তুত না-হওয়া পর্যন্ত, স্কুল এইখানেই চলিয়াছিল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মধুসূদন চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রাণপ্রিয় টাউন ভিক্টোরিআ হাইস্কুলের জন্য একটি নিজস্ব গৃহনির্মাণ-কার্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই গৃহনির্মাণে পনরো হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্য হইতে অর্থ সংগৃহীত হয়। দরিদ্রের সামান্যতম দানকেও তিনি কৃতজ্ঞতাভরে ও ধন্যবাদসহ গ্রহণ করিতেন। অর্থসংগ্রহের জন্য বাহির হইয়া, দুর্বল অসুস্থ দেহ সত্ত্বেও, কটকশহর ও তৎপার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম তিনি একাকীই ঘুরিয়াছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায়, তাঁহাকে সম্বলপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত ওড়িষ্যার রাজন্যবর্গের অর্থানুকূল্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এইরূপে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় চৌদ্দহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কটক শহরের মধ্যবর্তী কাজিবাজার অঞ্চলে স্কুলের জন্য একটি ইষ্টকনির্মিত নূতন বাটি নির্মাণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী স্কুলগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন-কার্য ওড়িষ্যার তৎকালীন কমিশনার লেভিঞ্জ (Levinge) সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেদিন ভক্ত, বিশ্বাসী, ব্রহ্মে চিরনির্ভরশীল মধুসূদনের কণ্ঠ হইতে যে প্রার্থনাবাণী নিঃসৃত হইয়াছিল,

তাহা উপস্থিত জনগণের বহু অন্তরকে দ্রব করিয়া স্কুলের প্রতি স্থায়ী সহানুভূতি জাগাইয়াছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি স্থাপন করিয়া ত্রিশবৎসর ব্যাপী ইহার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে এতদিনে তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা ভগবৎকৃপায় পূর্ণ হইল।

গৃহনির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইলেও, স্কুলের উন্নতির জন্য মধুসূদনের চেষ্টার বিরাম হয় নাই। সরকারী সাহায্যগ্রহণে অথবা বিদ্যালয়ের বেতন-হার বৃদ্ধিতে অসম্মত হওয়ায় স্কুলের আর্থিক অনটন দূরীকরণের জন্য শিক্ষোন্নতি-বিধান দ্বারা বিদ্যালয়টিকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলাই তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল। তদুদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আদর্শবান, অভিজ্ঞতা- ও খ্যাতিসম্পন্ন, সুদক্ষ প্রধানশিক্ষক-দিগকে ক্রমান্বয়ে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজেও মধ্যে মধ্যে স্কুলে গিয়া শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনমতো শিক্ষক ও ছাত্রগণকে সদুপদেশ দান তো করিতেনই, উপরন্তু কখনও কখনও কিছুকাল প্রত্যহ স্কুলে যাইয়া নিয়মিতরূপে উচ্চশ্রেণীতে ইংরাজি পড়াইবার ভারও গ্রহণ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগের আশায় অনেক ছাত্র আগ্রহান্বিত হইয়া স্কুলে ভর্তি হইত এবং বহু অভিভাবক স্কুলের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন দেখিয়া, স্ব স্ব সন্তানদিগকে সানন্দে তাঁহার স্কুলে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচশত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্তকবির—সাহিত্য-সাধনা

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন)

বর্তমান যুগের ওড়িয়া সাহিত্য যে কয়জন মনীষীর চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে, ভঞ্জযুগের রীতির প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাঁহারা নবযুগের নবসাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন—নূতন ছন্দ ও নূতন পদবিন্যাসে সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা দিয়াছেন, নবভাবনাকে রূপ দিয়াছেন—মধুসূদন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির সম্মুখে অবশ্য নিত্যকার সাধারণপাঠক অতীতকে ভুলিয়া বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কিন্তু ইতিহাস পূর্বসূরীদের ভুলিতে পারে না, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁহাদের কীর্তির কথা লিখিয়া রাখিতে চায়, তাহার প্রাণের সঞ্চারে যাঁহাদের অস্তিত্ব মিশিয়া আছে তাঁহাদের নাম ভবিষ্যবংশীয়দের সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে চায়; বলিতে চায়—'ইঁহাদের দেখ, ইঁহাদের রচনা দ্বারাই তোমাদের বর্তমান সমৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারিয়াছে'। এমনি একজন সূরী ছিলেন মধুসূদন রাও। এখনও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত মধুসূদনের কথা লোকে ভক্তির সহিত স্মরণ করে, ভক্তকবি নামেই তিনি পরিচিত।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের দেহান্তের তিন বৎসর পরে ১৯১৫ খ্রীঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের ছাত্রদের অন্যতম, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথ গ্রন্থাবলীর পূর্বভাগে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও মধুসূদন দাশ মহাশয় তাহার ভূমিকা লেখেন। দাশ-মহাশয় ভূমিকার শেষভাগে, কবি যে নবযুগে সুরুচিশিক্ষা বিষয়ে প্রকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ-রচনার কালানুক্রমও ভূমিকাতেই দেওয়া আছে।

ভক্তকবি সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শুধু অন্তরের প্রেরণায় নয়, প্রয়োজনের অনুরোধেও। ভারতীয় সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের সৃষ্টি তখনও বিশেষ কিছু হয় নাই। এদেশে শিশুসাহিত্যের জন্ম ও পরিপুষ্টি আধুনিক কালেই; শিশুসাহিত্য, অর্থাৎ শিশুরা যাহা বুঝিতে পারে, যাহা আবৃত্তি করিতে পারে। প্রভাত ও সন্ধ্যার সৌন্দর্য, এবং ঈশ্বরের সরল স্তবস্তুতি, আমরা কোমলমতি শিশুদের অবশ্যই বোধগম্য বলিয়া মনে করি, এবং তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে এইরূপ রচনার জন্য একটা স্থানও রাখিয়া দিই। কিন্তু

স্থান রাখিলে কি হইবে, বস্তুও তো চাই? তখনকার ওড়িয়া সাহিত্যে এরূপ কবিতার নিতান্তই অভাব ছিল। তিনি এবিষয়ে পথ করিয়া দিলেন—তাই 'পথিকৃৎ' নাম তাঁহাকে মানায়। গ্রন্থাবলীর ভূমিকালেখক বলিয়াছেন, কবিতাগুলির মধ্যে নিবেদিত ভক্তি ও প্রীতি শুধু শিশু কেন, বয়স্কদেরও উপভোগ্য ও অনুভবনীয়। আমাদের মনে হয়, কবির বৃহত্তর প্রয়াসের বীজও এখানেই নিহিত ছিল—প্রকৃতিসৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া বিশ্বপাতার জয়গান করার মধ্যেই।

তাঁহার 'ছান্দমালা'র দুই ভাগ একই উদ্দেশ্যে রচিত। শিশু এবং কিশোর অধিকাংশ সময়ই স্তব ও প্রার্থনাই কাব্যশিক্ষার বা কাব্যপাঠের অর্থ বলিয়া জানে। রবীন্দ্রনাথের কিছু কাব্য ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছিল Prayers; সুতরাং মধুসূদন তাঁহার কবিতার সূত্রপাত যদি প্রকৃতি বর্ণনা ও ভগবানের উদ্দেশে স্তবস্তুতির মধ্য দিয়া করিয়া থাকেন তাহা হইলে সঙ্গতভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার ছান্দমালা দ্বিতীয়-ভাগের স্তবটি যাঁহারা বাল্যকালে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থাতেও তার কয়েকটি স্তবক তাঁহারা বারম্বার আবৃত্তি করিয়া তার রসাস্বাদন করিয়া থাকেন; যথা,

হে আনন্দময়, কোটি ভুবনপালক,
অধম অক্ষম মুহিঁ অবোধ বালক,
জ্ঞানদাতা ভগবান,
দিঅ মোতে শুভবুদ্ধি দিঅ দিব্যজ্ঞান।
সত্যপথে ধর্মপথে ঘেনি যাঅ মোতে,
ভসাঅ পরাণ মোর তব প্রেমস্রোতে,
প্রভো পরমশরণ,
এ জীবন শ্রীচরণে কলি সমর্পণ।

ছান্দমালার সম্বন্ধে আরও চারটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, দেশভক্তি বা দেশপ্রেম অন্যান্য প্রসঙ্গের সমান পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে:

তুহি মা জনমভূমি পবিত্র ভারতভূমি
তোহর সন্তান আম্ভে অটুঁ সরবে;
তোর শ্রীচরণ সেবা পাঁই মন প্রাণ দেবা
গাইবা তোহর নাম আনন্দরবে।

তো আনন্দে হোইবা সুখী,
কান্দিবা দুঃখরে তোর হোইণ দুঃখী ॥

দ্বিতীয়ত, কবি এখানে পূর্বাচরিত ওড়িয়া ছন্দ ও রাগরাগিণী হইতে নিজেকে বিযুক্ত করেন নাই—শিশুগীতে যেমন করিয়াছেন। কলহংস কেদার, কেদার চক্রকেলি প্রভৃতি বৃত্তকে অবলম্বন করিয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতা স্বরলয়ে গাহিবার জন্যও বটে। এককালে গীত বা গানই ছিল কাব্যের প্রাণ, একালে সে প্রাণের স্থানে আসিয়াছে অন্য প্রাণ; কবিতা গাওয়া হইবে না, আবৃত্তি হইবে, পড়া হইবে। ছান্দমালায় দুই প্রবৃত্তি আসিয়া মিলিয়াছে।

তৃতীয়ত, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে—মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে কাব্যরচনা—ইহাও কবির রচনার দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। নবযুগের সাহিত্য সাধনা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড—রামায়ণ মহাভারতকে বাদ দিয়া নয়, তাহার উপাখ্যান অবলম্বনে ভারতীয় ভাবধারার নূতন রূপ দেওয়াও কবির একটা নিজস্ব পথ।

চতুর্থত, ঋতুবর্ণনা। বাংলায় বারমাসী বর্ণনা কবিদের স্বভাবসিদ্ধ; উড়িষ্যায় বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা, সাহিত্যে নানা অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত আছে, তাহার পার্শ্বে ছান্দমালার বসন্ত হইতে শিশির পর্যন্ত ছয় ঋতুর সরল সুন্দর বর্ণনা শুধু শিশুদের নয়, সাহিত্যামোদী পাঠকেরও আনন্দ বর্ধণ করিয়াছে ও করিবে।

ইহার পরবর্তী বালরামায়ণে বালকাণ্ড নবাধ্যায়ে ও অযোধ্যাকাণ্ড (অসম্পূর্ণ) এক অধ্যায়ে রচিত। বালকাণ্ডের প্রতি অধ্যায়ের শেষে সংস্কৃত কাব্যরীতির অনুযায়ী ভণিতা বা অধ্যায়-পরিচয়—ইতি শ্রীবালরামায়ণে বালকাণ্ডে অহল্যা-উদ্ধার নাম চতুর্থ অধ্যায়, বা ইতি শ্রীবালরামায়ণে বালকাণ্ডে পরশুরাম-পরাজয় নাম সপ্তম অধ্যায়, বা ইতি··· বালকাণ্ডে ভরত মাতুলালয়-গমন নাম অষ্টম অধ্যায়।

ইহার পরে দুইভাগে সমস্ত কবিতাবলী—প্রথম ভাগে সাতটি ও দ্বিতীয় ভাগে তিনটি। 'I am the monarch of all I survey' নামে Alexander Selkirk-এর Soliloquy ইংরাজি কবিতার ওড়িয়ায় অনুবাদ প্রথম ভাগের অন্তর্গত আছে। দ্বিতীয় ভাগের তিনটি কবিতার মধ্যে 'অযোধ্যা-প্রত্যাগমন' —রঘুবংশ হইতে অনূদিত। এই সকল রচনা হইতে সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষার সাহিত্যের প্রতি লেখকের যে অনুরাগ ছিল তাহা প্রমাণিত হয়।

'কুসুমাঞ্জলি' ১৯০৩ খ্রীঃ প্রকাশিত। অঞ্জলি অবশ্য কবি রাধানাথ রায়ের চরণে প্রদত্ত, অর্থাৎ উৎসর্গপত্র রাধানাথ রায় মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া লেখা: 'মোর পূজ্যপাদ কৈশোর গুরু / পরমাত্মীয় যৌবনসখা / চিরজীবনর পরমহিতৈষী / পবিত্র-সাহিত্য-সেবা-ব্রতরে পথপ্রদর্শক / বন্দনীয় কবি শ্রীরাধানাথ রায় মহোদয় শ্রীচরণ কমলরে / এ "কুসুমাঞ্জলি" শ্রদ্ধা-ভক্তিরে উৎসর্গ কলি।' কবিতাগুলি ১৮৯৪ হইতে ১৯০১ মধ্যে বিভিন্ন সময়ের রচনা। এগারটি কবিতার মধ্যে শেষ দুইটি শোক-গাথা—একটি মহারাণী ভিক্টোরিআর অন্যটি বামণ্ডাধিপতি সুচল দেবের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। কিন্তু অন্য নয়টি নূতন ভাবেই লেখা, অথবা নূতন ও পুরাতনের যোগসূত্র। 'এ সৃষ্টি অমৃতময় হে'-র মধ্যে আনন্দের ঝংকার আছে। 'নবযুগর অভিষেক' কবিতায় নবীন যুগকে স্বাগত জানানো হইয়াছে; মানবসন্তান যে ব্রহ্মসুত, সেই কথাটাই ঘোষণা করিতে হইবে; সত্য শিব সুন্দরের আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল, বিশ্বকবিরা অমর বীণা লইয়া অমৃতজয়ী অভিনন্দন গাহিতেছেন, তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইতে হইবে।

কিন্তু কুসুমাঞ্জলির দুইটি কবিতা পাঠকের দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করিবে—একটি হইল, 'ভারত ভাবনা'—দেশভক্তি বা অতীত ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ; দ্বিতীয় হইল, উপনিষদের প্রসঙ্গ—'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ'; সঙ্গে সঙ্গে ছন্দেরও কাজ আছে। ভারত ভাবনা কবিতাটি নয় পংক্তির একাদশ স্তবকে রচিত; প্রতি স্তবকের শেষ অর্থাৎ নবম পংক্তিটি অন্য গুলির হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, ইংরেজী ottava rima-র সঙ্গে একটা চরণ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—যেমনটি স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুইন'-এ আছে, ঠিক সেইরূপ। আর ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ—পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না ধবলিত ভুবনে পবিত্র উষাকালে পবিত্র ঋষিবংশে জাত সেই যুবকের প্রাণে যে কি অমৃত বাণী! কোথা হইতে কি করিয়া সেই বাণীর আবির্ভাব হইল, কে বলিবে! চোখ মেলিয়া ঋষি দেখিলেন—এক নির্মল জ্যোতি, বাহিরে ভিতরে সর্বত্র তাহার দীপ্তি:

ক্ষিতি অপ্ মরুদ্ ব্যোম তেজ একাকার,
নিরেখন্তি ঋষি আহা চিন্ময় সংসার।
মৃত জড় আজি আহা কি অমৃতময়!
ব্রহ্মনিঃশ্বসিতে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়।

এই কবিতার সম্বন্ধেই 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। ভারত ভাবনার দৃপ্ত ছন্দের মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে বঙ্গীয় কবি হেমচন্দ্রকে মনে হইতেও পারে, কিন্তু ব্রহ্মোপলব্ধির এই চিত্র বাস্তবিকই দুর্লভ, ইহা ভক্তকবির নিজস্ব অনুভূতি।

তাহার পর 'বসন্ত গাথা'—সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতা বসন্তকালে রচিত বলিয়া এই নাম—কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতার সমষ্টি। গণনায় সাতাইশটি। বিষয়ের গণ্ডী বৃহৎ, কবির কল্পনা ও আগ্রহের প্রসার সূচিত করে। ব্যক্তি বিশেষের প্রশস্তির সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে বসন্ত পূর্ণিমার অর্দ্ধ রাত্রি, একাম্রকাননের মাহাত্ম্য, নববর্ষের অভিনন্দন, যৌবনের স্বপ্ন, আরও কত কি। মিলের অবশ্য বহু প্রকারভেদ আছে—ক ক, খ খ, গ গ, ঘ ঘ,···অথবা ক খ ক খ, গ ঘ গ ঘ,···ইত্যাদি।

তাহার পর 'উৎকল-গাথা'র অন্তর্গত সাতটি কবিতা। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত তখনও অবরুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু এগুলি বৃহত্তর ভারতভূমিকে লইয়া নয়, একমাত্র ধর্মক্ষেত্র উৎকলেরই বন্দনা; সুতরাং নামও দিয়াছেন উৎকল-গাথা। শুধু একটিতে (পঞ্চম কবিতা) ভারত কন্যাদের উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল। 'হিমাচলে উদয়-উৎসব' একটু অন্য প্রকারের কবিতা—কাঞ্চন জংঘার সূর্যোদয় দেখিয়া কবির সম্মুখে বিস্তীর্ণ দৃষ্টিপটে ভাসিয়া ওঠে শংকরী-পরমেশ্বরের মিলন দৃশ্য, বর্ণের অপূর্বতায় সে দৃশ্য পরম মনোহর।

মধুসূদন রচিত 'শোকশ্লোক' ময়ূরভঞ্জাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের পরলোকগমনে রচিত; ব্রহ্মপ্রাণ, ব্রহ্মসখা, তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মনন্দন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাটিরও ঐ একই উপলক্ষ্য। বামণ্ডারাজপ্রশস্তি ও জয়মঙ্গলাষ্টক অবশ্য অন্য উপলক্ষে রচিত—শুভ কামনায় অভিনন্দন জানাইয়া।

তাঁহার 'সঙ্গীতমালা' একশত চারটি সঙ্গীতের সমষ্টি। সমাজে ঈশ্বরপ্রীতি উন্মেষিত করিবার জন্যই এগুলির রচনা। অধিকাংশই বাংলা ও ওড়িয়া রাগিণী অনুসারে লিখিত—তিনটি সংস্কৃত ছন্দে এবং তিনটি সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের 'বন্দনা' রীতি অনুসারে রচিত।

এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন, 'বঙ্গীয় সঙ্গীতলেখকেরা অন্যান্য ভাষার

রাগিণী ও বৃত্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সেই অনুসারে নিজ ভাষায় সঙ্গীত যখন রচনা করিয়াছেন, আশা করি তখন ওড়িয়া ভাষায় অন্য ভাষার রাগিণী-সংসৃষ্ট সঙ্গীত লেখা আমার পক্ষে দোষের বলিয়া বিবেচিত হইবে না।' সঙ্গীতমালার দুইটি সঙ্গীত বাংলার অনুবাদ বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশও করিয়াছেন। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতায়—'ভণ্ড রসায়নে' ও অন্য কবিতাটিতে হেমচন্দ্রের প্রতিচ্ছবি অস্বীকার করা যায় না, যথা—'সাবাস সাহিত্য চর্চা, সাবাস, সাবাস'—হেমচন্দ্রের 'সেলাম, টেম্পল চাচা, সেলাম, সেলাম'-এর সঙ্গে তুলনীয়। তেমনি, সরলা দেবীর 'বন্দি তোমারে ভারত জননী বিদ্যা-বিনয়দায়িনী·····অপমানক্ষত জুড়াইবে মাতঃ খর্পরকরবালিনি' এবং রবীন্দ্র-নাথের 'আট কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননি, রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি'—ইহাদেরও প্রতিধ্বনি মধুসুদন কাব্যের দুই এক স্থলে পাইয়াছি; যথা, বসন্তগাথার 'জয়গানে'—যুগযুগান্ত মোহ অন্তে জাগ মা বীর্যশালিনী, বিভুপ্রসাদে জ্যোতির্ময়ী হুঅ মা দীন-পালিনী। বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার কবিযশঃ ম্লান হয় নাই। কবি ভবভূতির উত্তররামচরিত নামক নাটকের তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। উত্তররামচরিতের গম্ভীর শব্দগুলির ঝনৎকার অনুবাদ করা সহজ কথা নয়। কিন্তু কবি এই কঠিন পরীক্ষায় সুন্দরভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়। 'প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম' ও 'হেমমালা' এই দুইটি হইল তাঁহার ওড়িয়া ভাষায় কথা সাহিত্যেরও সূত্র ধরাইবার প্রয়াস। ভাষার অগ্রসর হইবার কত পথ খুলিয়া দিবেন, তাহার চেষ্টা যে তিনি বহুবার করিয়াছেন, তাহারই নিদর্শন। প্রণয়র অদ্ভুত পরিণামর কথাবস্তু সিসিলির এক কাহিনী অবলম্বনে রচিত, আর হেমমালা তেলুগু হইতে অনুবাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা এ পর্যন্ত মধুসূদন গ্রন্থাবলীর ক্রম অনুসারে কবির সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। কবির রচনার সমগ্রতা বুঝিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। সাহিত্য জীবনের তিনটি কথা এখানে বাদ পড়িয়াছে। প্রথম, রাধানাথ ও ফকিরমোহনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠযোগ। রাধানাথ রায় যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ছাত্ররূপে পাইলেন মধুসূদনকে। মধুসূদন গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি ছিল তত্ত্বান্বেষী। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বালেশ্বরে শিক্ষকতাকালে মধুসূদন, রাধানাথ ও ফকিরমোহন

উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। দ্বিতীয় কথা, বালেশ্বর হইতে তখন 'উৎকলদর্পণ' নামে পত্রিকা বাহির হইত। রাধানাথ, ফকিরমোহন, চতুর্ভুজ ও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের নানা প্রবন্ধ ও কবিতায় দর্পণের কলেবর পুষ্ট হইতে লাগিল। রাধানাথের মেঘদূত, পবন, ইটালীয় যুবা, বিবেকী, কালিদাস প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের শ্মশান, নিশীথচিন্তা, নির্বাসিতর বিলাপ, অযোধ্যা প্রত্যাগমন, বুদ্ধদেব, সূর্য, উল্কাশিশু প্রভৃতি পদ্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। মধুসূদনের প্রবন্ধগুলি পরে প্রবন্ধমালা নামে একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন যাঁহাদের হইতে হয়, মধুসূদন তাঁহাদের মধ্যে অবশ্যই একজন। তৃতীয় কথা, রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'র সমালোচনা পত্রে অনুকূল সমালোচনা লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন "প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন, তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'ঋষিচিত্র' কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে"—সাধনা, পৌষ, ১২৯৮। অগ্রহায়ণের নব্যভারতে কবিতা প্রকাশিত হইল, আর পৌষ মাসেই বাহির হইল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা!

কিন্তু নব্যভারতে যে কবিতা বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ও ওড়িয়া কবিতাটি, যেমন আমরা গ্রন্থাবলীতে পাই, সর্বতোভাবে এক নয়—বাংলা কবিতায় তাহার আর এক স্তবক আছে; ছয় পংক্তি বাড়িয়াছে। আরও পরিবর্তন হইল এই যে, উদ্‌বোধন ও ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ গ্রন্থাবলীতে দুইটি পাশাপাশি বা পরপর, কিন্তু পৃথক কবিতা; পরন্তু নব্যভারতে উদ্‌বোধন দেবাবতরণেরই উদ্‌বোধন, আর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই তো হওয়া উচিত।

সমস্ত কবিতাগুলি একত্র দেখিলে অথবা কাব্যপুস্তক দেখিলে, বসন্তগাথা ও কুসুমাঞ্জলির কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সমালোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন (উৎকল সাহিত্য, পৌষ-মাঘ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) তাহার সারমর্ম এইরূপ:—"উড়িয়া সাহিত্যে বসন্তগাথা ও কুসুমাঞ্জলির তুলনা নাই, কিন্তু এই দুইটি সংগ্রহের মধ্যে আবার কবির মনের সৌন্দর্য, চিত্তের প্রসার, হৃদয়ের অনুভূতি, কল্পনার বিলাস, প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, ভাষার ঝঙ্কার, কুসুমাঞ্জলিতে যেমন সর্বত্র লক্ষিত, সুপরিস্ফুট, সুলভ,—বসন্তগাথায় তেমনটি নয়। ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণের বৈদিক মন্ত্রের

মত সারল্য, সামগাথার মত গাম্ভীর্য, ভাষার ওজস্বিতা, দৃষ্টির মহামহিমতা (grandeur) শুধু বসন্তগাথায় কেন, মধুস্থদনের অন্য কোনও গ্রন্থেই নাই। মধুস্থদনের বাণী এতখানি উচ্চভাবপূর্ণ আর কোথাও হয় নাই। 'নব-বসন্ত-ভাবনা'র যে ভাবনা তাহার তুলনা কোথায়?…'এ সৃষ্টি অমৃতময় হে', 'নবযুগ অভিষেক', 'আশা',—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব? বস্তুত, কুসুমাঞ্জলিতে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা দেশকালের অতীত, যাহা সর্বদেশের, সর্বকালের, সার্বজনীন, চিরন্তন। 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ' ও 'নববসন্তভাবনা' যে কোনও দেশের, যে কোনও কালের কবিলেখনীর উপযুক্ত।"

১৯২৫-২৬ সালের উৎকল সাহিত্য পত্রিকায় অন্নদাবাবুর এই ওড়িয়া আলোচনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স কম ছিল; কিন্তু দীর্ঘদিন পরে পড়িয়াও ঐ সকল মন্তব্য কোথাও অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। অন্নদাবাবু বলিয়াছেন, যাঁহারা কবিমানসের উচ্চতম স্তর দেখিতে চান, তাঁহারা কুসুমাঞ্জলি পড়ুন; কিন্তু বৈচিত্র্যের সন্ধান করিতে গেলে কুসুমাঞ্জলি অপেক্ষা বসন্তগাথাই ভালো লাগিবে। আরও কিছু আলোচনার পর তিনি বলিয়াছেন, "যাবৎ উৎকল সাহিত্য, তাবৎ 'বসন্তগাথা' 'কুসুমাঞ্জলি' 'হিমাচলে উদয়-উৎসব'। বিশ্বস্যাহিত্যে উৎকল সাহিত্যের দান জানিতে হইলে 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ', 'নব বসন্ত ভাবনা', 'হিমাচলে উদয়-উৎসব' ও 'বিচ্ছেদে' অবশ্যই দেখিতে হইবে।" অন্নদাবাবুর এই তালিকার সঙ্গে 'ভারত-ভাবনা'ও আমি যোগ করিতে চাই। ইহার একটি স্তবকের ইংরেজি অনুবাদ ভারত সরকারের 'যোজনা' (Yojana)-তে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহা সমাদৃতও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মধুস্থদন শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষাকর্মী ছিলেন, পত্রকার ছিলেন, ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার কবিপ্রাণ ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার স্বভাবগম্ভীর রচনার সঙ্গে ব্যঙ্গ কবিতা তেমন মানায় নাই বলিয়াই আমার ধারণা। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতমালারও একটা স্থান আছে—তাহার মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছি—বর্জন করিয়া নয়, গ্রহণ করিয়াই বড় হইতে পারে, এইরূপ একটা মনোভাব। সংস্কৃত হইতে অনুবাদে অথবা রামায়ণ মহাভারত হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া, ইংরাজি বাংলা ও তেলুগু সাহিত্যেরও চর্চা করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে তিনি আগ্রহশীল ছিলেন।

সাহিত্যের আর একদিকে মধুসূদনের দানের কথা স্মরণযোগ্য। সেটি সংগঠনের দিক। সাহিত্য সংগঠনের অন্যতর মাধ্যম হইল পত্রিকা। বালেশ্বরে যখন তিনি ছিলেন, উৎকল দর্পণের সংস্রবে আসিয়া তাহার মাধ্যমে রাধানাথ বাবুর সহযোগে তিনি ওড়িয়া লেখকদের গঠন করিলেন। তাঁহার সহযোগিতা উৎকল দর্পণের পক্ষে সামান্য ছিল না। তা ছাড়া মধুসূদন বালেশ্বরে থাকিবার সময় আরও দুইখানি মাসিকপত্র আরম্ভ করেন, অবশ্য দুইটিরই আয়ু বেশি ছিল না। একটির নাম 'শিক্ষক', অন্যটির নাম 'ধর্মবোধিনী'। মধুসূদনের বরাবরই শিক্ষাদানে এবং নীতির গৌরব প্রচারে আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল; মৃত্যুঞ্জয় রথ মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর উৎকলীয় পত্র-পত্রিকার পরিচয় দিতে গিয়া মধুবাবুকে এই দুইটির "জন্মদাতা" ও "প্রধান পোষক" বলিয়াছেন।* "সংস্কারক ও সেবক" পত্রিকাও তাঁহার সমর্থন পাইয়াছিল; 'শিক্ষাবন্ধু', 'আশা' এবং তৎপরবর্তী "নবসংবাদ" ও 'ব্রাহ্ম' পত্রিকাগুলির তো তিনি প্রবর্তকই ছিলেন। ইহারা প্রায়শ স্বল্পায়ু হইলেও 'সংস্কারক' ও 'শিক্ষাবন্ধু' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হইয়া তদানীন্তন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কার আনয়নে সহায়ক হইয়াছিল।

সংগঠনের আর একটা দিক, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা। কটকের উৎকল সাহিত্যসমাজ মধুসূদনের অন্যতম কীর্তি। আবার উৎকল সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র হিসাবেই 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার অভ্যুদয়। উৎকল সাহিত্যসমাজের সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন ছিল মধুসূদনের একান্ত আগ্রহ যত্ন এবং নেতৃত্ব, 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার জন্মও তদ্রূপ প্রধানত তাঁহার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার ফলেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতেই আশা, ভরসা ও উৎসাহ লাভ করিয়া, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, বিশ্বনাথ কর, এই পত্রিকার প্রবর্তন করেন। ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ মধুসূদনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা ওড়িষ্যায় প্রথম সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই সভায় পঠিত এবং আলোচিত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই বহুকাল পর্যন্ত "উৎকল সাহিত্য"-র কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। এই আলোচনা-সভাই প্রধানত মধুসূদনের উদ্যোগে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে "উৎকল সাহিত্যসমাজ" রূপে পরিণতি লাভ করে। আমরণ তিনি এই সমাজের

* উৎকল সাহিত্য ১৩২৭ মার্গশির সংখ্যা।

সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নব্য ওড়িয়্যার সাহিত্যিক প্রকৃতি সংগঠনে ও সাহিত্য-রুচির উন্নয়নে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, ১৯১২ খ্রীঃ তাঁহার দেহান্ত হয়। তখনকার ওড়িয়া সাহিত্যের অবস্থা স্মরণ করিলে ওড়িয়া সাহিত্যে মধুসূদনের স্থানের কথা খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি শুধু সাহিত্যের ইতিহাসের সম্পর্কে স্মরণীয় নহেন, অর্থাৎ শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। অবশ্য ঐতিহাসিক স্থানও উপেক্ষার বস্তু নহে! চল্লিশ বৎসরের বন্ধু ফকিরমোহন সেনাপতি মধুসূদনের বিয়োগে বিলাপ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"দরিদ্র উৎকলভাষা মধুঠারে ঋণী"। মধুসূদন দাশ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভূমিকা এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন :—"আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্ররে আভমানঙ্কর কবিঙ্ক স্থান স্বচ্চ, তাহাঙ্কর কবিতাগুড়িক এই নবযুগরে স্বরুচি-শিক্ষা বিষয়রে প্রকৃষ্ট আদর্শ এবং সেগুড়িক লাভ করি অধুনা অতি দীনহীন উৎকল সাহিত্য যে পুষ্ট হোইঅছি এবং স্বকীয় সৌরভ চতুর্দিগরে বিস্তার করিবা লাগি কিয়ৎপরিমাণরে হেলে ক্ষম হোইঅছি, এহা বোলিবা বাহুল্যমাত্র"।

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথও মধুসূদন গ্রন্থাবলীতে কবির জীবনকথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তাঙ্কর প্রত্যেক কবিতা ও প্রবন্ধ পুণ্যশ্রীমণ্ডিত এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন। মধুসূদন শুদ্ধ ভাবরাজ্যর প্রধান কবি"। মার্জিতরুচি সাহিত্যের তখন খুবই অভাব ছিল। জটিল হইতে জটিলতর অলঙ্কারে প্রাচীন কাব্যলক্ষ্মী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদনের অলঙ্কার স্বাভাবিক ভাবে কাব্য-লক্ষ্মীর দেহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে সমাজের সংশোধন ও সাহিত্য-রুচির পরিবর্তন একসঙ্গেই হইয়াছে। আজ সেই পরিবর্তনের ফল ওড়িয়া সাহিত্য উপভোগ করিতেছেন; সাহিত্যের এই নীরব অথচ সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের মূল্য তুচ্ছ করিবার নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে ইংরেজী সাহিত্যে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য ওয়ার্ডস্‌ওঅর্থ ও কোলরিজ প্রমুখ কবি-সমালোচকগণের চেষ্টার কথা স্মরণ করি। আর বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় স্মরণ করি—'একঃ শব্দঃ সুষ্ঠু জ্ঞাতঃ সম্যক্ প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামদুগ্‌ ভবতি'—ভাষ্যকার একটিমাত্র শব্দের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মধুসূদনের কোনও কোনও কবিতা সেই কারণে অল্প পরিসরের মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় সৌন্দর্য ও সরল রচনাগুণে সমৃদ্ধ হইয়া বিশ্বসাহিত্যে সমাদর-যোগ্য বলিয়া কি বিবেচিত হইতে পারে না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক জীবন

(ক) মাতাপিতার প্রতি ভক্তি

জ্ঞানী, ভক্ত, প্রেমিক, সাধক পিতৃদেবের পারিবারিক জীবনের কথা লিখিতে বসিয়া আমি যেন প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শৈশবে পাঁচবৎসর বয়সে মাতৃহীন সন্তানের অনন্যসাধারণ মাতৃভক্তির কথা ভাবিতে গিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার ভক্তিভাজন শ্বশুরমহাশয়ের ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত একত্র বাসকালে তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তির বহু পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার মুখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তির কথা অনুপ্রাণনময়ী ভাষায় বর্ণিত হইতে শুনিয়াছি। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে —ভক্তিভাজন লাহিড়ীমহাশয়ের মাতার রোগশয্যায় তাঁহার অপূর্ব সেবা ও মাতৃভক্তির কথা পড়িয়াছি। ইঁহারা সকলেই দীর্ঘকাল অজস্রভাবে মাতৃস্নেহ সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

কিন্তু যখন ভাবি, আমার পিতা শৈশবে মাত্র পাঁচবৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়াছিলেন, সজ্ঞানে মাতার স্নেহাদর সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই বলিলেই হয়—তাঁহার 'মো জননী' কবিতায় উল্লেখিত মাতার সম্বন্ধে তাঁহার শৈশবের স্মৃতিটুকুই মাত্র অবলম্বন—এইটুকু সম্বল লইয়া কিরূপে তাঁহার মধ্যে এত গভীর মাতৃভক্তির সঞ্চার হইল, ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই। তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তির পরিচয়, কেবল ঐ কবিতায় নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা বাল্যে এই পিতামহীর সমসাময়িকা আমাদের ঠাকুরমা-স্থানীয়াদিগের নিকট শুনিয়াছি— পিতামহী অম্বিকাবাঈ 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী' ছিলেন ; তাঁহারা ইঁহার কথা বলিবার সময় আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। পিতৃদেবও তাঁহার 'মো জননী' কবিতায় উল্লেখিত শৈশবের করুণ স্মৃতির কথা অনেক সময় আমাদের নিকট অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতেন। প্রতিবৎসর জননীর মৃত্যুবার্ষিক দিবসটি তাঁহার আকুল প্রাণের উপাসনায়, জননীর পবিত্র স্মৃতিচারণে ও দীন-দরিদ্রদিগকে অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্যের মধ্যে কাটিত। মাতৃভক্ত

সন্তানের সেদিনের সেই পবিত্র সুন্দর পুণ্যাভ মুখচ্ছবি এখনও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই মাতৃভক্ত সন্তান মাতার সেই স্বল্প পরিমাণ স্মৃতিটিকে কিরূপ অমূল্য সম্পদের মতো সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ইহার মধ্যে তাঁহার ভক্তপ্রাণ পরম জননীর স্পর্শ পাইয়া কিরূপ সার্থক হইয়াছিল, তাহা তাঁহার 'মো জননী' কবিতা পড়িলে অনুভূত হয়। কবিতাটি পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে (১৩-১৪ পৃঃ)। 'মা' নামটি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে বার বার 'মা' নাম উচ্চারণ করিয়া তিনি শান্তি অনুভব করিতেন। কন্যা ও বধূগণকে পত্র লিখিবার সময় 'মা আমার' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মধুসূদনের পিতৃভক্তিও বড় সাধারণ ছিল না। ভাগীরথী রাও দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি পুরী হইতে বৎসরে দুই-তিনবার কটকে আসিয়া বেশ-কিছুদিন পুত্র, বধূ, নাতি-নাতিনীদের সহিত কাটাইয়া যাইতেন। সে-সময়ের কত দৃশ্য কত ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। কটকে তাঁহার অবস্থানসময়ে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিত্যঅভ্যস্ত রীতিগুলি যাহাতে তাঁহার সুখকর ও প্রীতিদায়ক হয়, তাঁহার পূজা-উপবাস প্রভৃতি যাহাতে শুদ্ধাচারসম্মত হয়, সেসকল বিষয়ে বাবা, মা, কাকা, কাকী সর্বদা অবহিত থাকিতেন। পিতার পায়ে কোন কারণে বেদনা হইয়াছে জানিয়া, বহু ভৃত্য থাকা সত্ত্বেও, মধুসূদন নিজে তেলের বাটি লইয়া পিতার পদতলে বসিয়া বেদনাস্থানে তৈলমর্দন করিতে লাগিলেন; পুত্রের কোমল করস্পর্শে পিতা চাহিয়া দেখেন, পুত্র প্রসন্নমনে তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছান্দমালা' নামক তাঁহার কবিতা-পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড পিতৃদেবকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন: "এ পৃথিবীরে পরমারাধ্য, পরমতীর্থরূপ শ্রীপিতৃদেব-শ্রীপাদপদ্মরে এহি ক্ষুদ্রগ্রন্থ ভক্তিসহকারে অর্পিত হেলা।"

ইঁহার পিতৃভক্তি সম্বন্ধে বাল্যজীবনের একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠমাতুল নারায়ণজী মাতৃহীন ভাগিনেয় দুইটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একবার কোন কারণে তাঁহার সহিত ভাগীরথী রাওয়ের মনান্তর হওয়াতে, ভাগীরথী পুত্রকে মামার বাড়ী যাইতে নিষেধ করেন। এই নিষেধ-বাক্য পুত্রের অন্তরে দারুণ ব্যথা দিয়াছিল, কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য করিতে পারেন নাই। এই সময়ে একদিন পুরীর 'বড় দাণ্ড'তে (জগন্নাথ-

মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজপথটিকে ওড়িয়ায় 'বড় দাণ্ড' বলা হয়; এই পথে রথযাত্রার সময় রথ টানা হয়) মধুসূদনকে দেখিতে পাইয়া নারায়ণজী ভাগিনেয়কে জড়াইয়া ধরিয়া, 'তুই কেন আমার বাড়ী যাস না' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; বড়মামার বুকে মাথা রাখিয়া ভাগিনেয়ও কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতার আদেশ না-পাওয়া পর্যন্ত মামার বাড়ী যান নাই।

ভাগীরথী রাও অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠকন্যা বাসন্তী ও জগন্নাথের প্রথমা কন্যা রেবা এই দুইটি পৌত্রীর জন্মের পর তিনি পৌত্রমুখ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। এপর্যন্ত ভাগীরথী দাড়ি রাখেন নাই। পৌত্র জন্মিলে, দাড়ি রাখিবেন এইরূপ সংকল্প করেন। জ্যেষ্ঠ পৌত্র জয়ন্তের জন্ম হইলে, এই সংকল্প কার্যে পরিণত হয়। আমরা বাল্যাবধি তাঁহার লম্বা দাড়িই দেখিয়া আসিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালে তিনি পুরী হইতে কটকে আসিয়া বেশ কিছুদিন কাটাইয়া যাইতেন। তখন আমরা ভাইবোনেরা তাঁহার সঙ্গে যে আনন্দে দিনগুলি কাটাইতাম—তাহার কত ছবি মনে জাগিয়া এখনও প্রাণকে স্নিগ্ধ সরস করিয়া দেয়। উপবীতধারী সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের স্নানান্তে বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতে করিতে বৃক্ষে জলসেচন, পূজাহ্নিক, নির্মাল্য-সেবন প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার পরিচয়টি সম্যক্ বুঝিবার মতো বয়স তখন আমাদের হয় নাই, কিন্তু এই ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তের ইষ্টদেবতার পূজা, জপ, প্রণাম প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের ভিতরেও ভক্তি ও সম্ভ্রম জাগিয়া উঠিত। তাঁহার এই ছবিটি আমাদের অন্তরে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের নিকট তাঁহার সঙ্গ বড় মধুর ছিল। পড়াশোনা, স্কুল-যাওয়া প্রভৃতির ফাঁকে ফাঁকে আমরা তাঁহার নিকট ঘুরিয়া যাইতাম। তাঁহার কোন কাজে লাগিলে বড়ই আনন্দ বোধ করিতাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা ভাইবোনগুলি তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিতাম; তিনি তাঁহার জীবনের কথা ও অন্যান্য অনেক কাহিনী আমাদিগকে বলিতেন। সেই অবসরে আমরা সাধ্যানুযায়ী তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইতাম—পায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া, গা হাত পা টিপিয়া দেওয়া, হাতপাখায় বাতাস করা, প্রভৃতি দ্বারা। ছোটরা কোলে বসিবার জন্য কাড়াকাড়ি করিত। সর্বশেষে তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মসঙ্গীত করিবার জন্য বলিতেন। সরস্বতীদিদির (আমার কাকা জগন্নাথ রাওয়ের ছোট মেয়ে)

শ্রীউমাশংকর সরকার

গানের গলা বেশ ভাল ছিল। তিনি গাইতেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতাম। "মন একবার হরি বল, হরি বল" এইগানটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে বাল্যজীবনে সমস্বরে এই সঙ্গীত গাহিতে-গাহিতে আমাদের শিশুচিত্ত এক অপার্থিব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত। "হরিময় এই ভূমণ্ডল" এই পদটি গাহিবার সময় বিশ্বাসে তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। আজীবন তাঁহার এই পুণ্যস্মৃতি আমাদের জীবনে কত বল ও আনন্দ দিয়া আসিতেছে।

পুলিস-বিভাগে কর্ম করিলে মানবহৃদয়ের স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কোমল বৃত্তির বিকাশে বাধা ঘটিয়া থাকে, হৃদয় কঠিন হইয়া যায়, এইরূপ ধারণা জনসমাজে প্রচলিত; কিন্তু ভাগীরথীর জীবনে ইহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। তিনি কর্মোপলক্ষ্যে যখন যেখানে বাস করিয়াছেন, সেখানকার অধিবাসীদিগকে প্রগাঢ় স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই তাঁহার সদ্ভাব ছিল।

ভাগীরথীর দ্বিতীয়া পত্নী তুলসীবাঈও দীর্ঘজীবন পান নাই। দ্বিতীয় বিবাহের পুত্রকন্যাগুলির মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির চারবৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পুত্রগুলি বড় হইয়া বিবাহিত হইলে, ভাগীরথী বালিকা-বধূগুলির যথোচিত যত্ন লইতেন। বধূগুলিও কন্যার ন্যায় তাঁহার সহিত অসঙ্কোচ ব্যবহার করিতেন।

ভাগীরথীর জীবদ্দশাতেই জগন্নাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেও, ভাগীরথী আজীবন বধূদিগের হস্তে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যেসকল পৌত্রীর ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের পর আর তাহাদের হস্তে অন্নগ্রহণ করেন নাই।

৮২ বৎসর বয়সে, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, পুরী সহরে ভাগীরথী দেহত্যাগ করেন। তাঁহার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া মধুসূদন, পত্নী কনিষ্ঠকন্যা-সান্ত্বনা ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী-রেবাকে লইয়া পুরী যান ও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

সে-সময়ে জগন্নাথ রাও গড়জাতে 'বউদ' নামক দেশীয় রাজ্যে দেওয়ানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার অন্তিম সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে আসিতে পারেন নাই। শোককাতর মধুসূদনের অনুজকে লিখিত তৎকালীন পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"...সমাধিস্থভাবে প্রসন্নবদনে উর্দ্ধনেত্র হইয়া বাবা কখনও একাকী, কখনও বা আমার সহিত অনবরত হরিনাম বা গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন। প্রাণত্যাগের পাঁচ-ছয় মিনিট পূর্ব পর্যন্ত এইরূপ আনন্দে হরিনাম করিয়া প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সহজে ও সুন্দর ভাবে সংসারসমুদ্র পার হইয়া গেলেন। সেই আনন্দজ্যোতিপূর্ণ চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। কেবল ওষ্ঠ দুইটি যেন আরো হরিনাম করিবার জন্য ঈষৎ উন্মুক্ত রহিল। এইরূপে আমাদের পিতৃদেব আনন্দে চলিয়া গেলেন। আমরা আর কেন অসার শোক করিব? প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল। বাবা মোক্ষধাম হরিপাদপদ্ম পাইলেন। আর অধিক কি লিখিব। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, হৃদয় ব্যাকুল, আবার সংসারের কর্মজালে জীবন আবদ্ধ।

"তুমি সৎপুত্র হয়ে তাঁর কত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছ। আমি তো সেরূপ কিছু করিতে পারি নাই। সেজন্য ব্যাকুল হৃদয় কাঁদিতেছে। তবে এইমাত্র ভরসা যে সেই ক্ষমাপূর্ণ সন্তানবৎসল পিতা আমার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

"বাবা[১], প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে, তোমাকে বুকে ধরিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিবার জন্য কাঁদিতেছে। পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য ও তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য তুমি যাহা করিয়াছ[২] তাহা স্মরণ করিয়া আমার প্রাণ তোমাকে ধন্য ধন্য বলিতেছে। তুমি তাঁহার শেষবয়সে সৎপুত্রের কাজ কত করিয়াছ!"

১২।৬।১৯০৯

"বাবা[১], তোমার ৪ তারিখের পত্র ছয়দিন পরে পাইয়াছি। তখন অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহা পড়িয়াছি; এখন কাঁদিতে কাঁদিতে এ পত্র লিখিতেছি। আমাদের যাহা কিছু উন্নতি, তাহা কেবল পিতৃদেবের আশীর্বাদে। আমাদের পিতৃদেবের স্নেহ অপেক্ষা সংসারে কোন্ পিতার স্নেহ অধিক মঙ্গলকর ও

---

১ "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমো পিতুঃ" এই বাক্যটি ভ্রাতৃবৎসল মধুসূদনের জীবনে সার্থক হইয়াছিল। তিনি এই ভাবের বশবর্তী হইয়া কনিষ্ঠগণকে সন্তান-তুল্য মনে করিয়া 'বাবা' সম্বোধন করিতেন।

২ জগন্নাথ রাও বহু অর্থব্যয় করিয়া পিতার তীর্থদর্শন অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। পিতাকে স্বীয় কর্মস্থল বউদে লইয়া গিয়া আন্তরিক সেবাযত্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পিতার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধকালে জগন্নাথ একহাজার ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, প্রত্যেককে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আশীর্বাদময়? হায় হায়, তিনি যখন দেহজীবনে ছিলেন, তাঁহার মূল্য বুঝি নাই! এইটুকু সান্ত্বনা, তিনি পরলোকগত হইলেও আমরা তাঁহা হইতে দূরে নাই। প্রভুর কৃপায় তাঁহাকে নিকটতম বলিয়া অনুভব করিতেছি। পরমপিতার প্রতিনিধি পিতৃদেব, পরমপিতার ক্রোড়ে থাকিয়া, আহা কি পুণ্য স্নেহামৃতময় নয়নে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! তিনি আমাদের প্রাণে আছেন। তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের মতিস্থির থাকুক"[৩]

(খ) ভ্রাতৃস্নেহ

জগন্নাথের প্রতি মধুসূদনের ভ্রাতৃস্নেহ এক দিব্যানন্দরসে পূর্ণ ছিল, তাহার আভাব পূর্বেই দিয়াছি। অতি শৈশবে মাতৃহীন হওয়া অবধি এই কনিষ্ঠ সহোদরটির সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, অধ্যয়ন, প্রভৃতি করিয়া বড় হইয়াছিলেন; তখন এই কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার স্নেহ মাতৃস্নেহ অপেক্ষা কিছু অল্প ছিল না। জগন্নাথের গৃহে ফিরিতে কোনদিন বিলম্ব ঘটিলে, তিনি সেদিন অনাহারে সজলনয়নে জগন্নাথের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। অধিক বিলম্ব ঘটিলে, সহপাঠীদিগের নিকট বালকবৎ রোদন করিতেন ও খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই ভাইটির পাঠে অমনোযোগ ও গর্হিত আচরণ দেখিয়াও তিনি কখনও কঠোর শাসন বা তিরস্কার করেন নাই; কেবল অবিরল অশ্রুপাত করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই অপূর্ব ভ্রাতৃস্নেহে, পরবর্তীকালে জগন্নাথের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ যখন স্থানান্তরে থাকিতে বাধ্য হইলেন, তখন মধুসূদন যেসকল পত্র তাঁহাকে লিখিতেন, তাহাতে প্রায়ই দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা ও সস্নেহ আলিঙ্গনের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইত। একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"তুমি যে আমার কি ধন, তাহা কি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব? আর তুমি যে আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখ, তাহা কি প্রভু আমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন না? আর অধিক কি লিখিব, পরম পিতা আমাদের দুইজনকে একত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই পাদপদ্মের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখুন, এই প্রার্থনা।"

জগন্নাথের পঞ্চাশবৎসর-পূর্তির জন্মদিনে 'আশীর্বাদ' নামক যে কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল:

---

৩ উপরে উদ্ধৃত পত্রগুলি ওড়িয়া-ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল।

আশীর্বাদ

অর্দ্ধশত বর্ষ যার অশেষ আশিস
বরষিছি তো মস্তকে, বৎস ! অহর্নিশ,
স্বরগর প্রেম-সুধাধারা অবিরতে,
রখিছি আদরে তোতে এ মহাজগতে ;
সেহি বিশ্বজননীর শ্রীচরণপ্রান্তে
আজি তো জনমদিনে বসিণ একান্তে
আকুল অগ্রজ তোর কৃতজ্ঞ অন্তরে
আজন্ম জীবন-বার্তা স্মরি ভক্তিভরে,
স্নেহর প্রতিমা তার তোতে প্রাণে ধরি,
পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্নেহে আলিঙ্গন করি
স্নেহের চুম্বন দেই আননে তোহর,
বন্দই আনন্দে বিশ্বজননী পয়র।
ব্যাকুলে মাগই সেহি অভয় চরণে,
রখমা, রখমা, মোর অনুজ-জীবনে
অনন্ত মঙ্গলময় স্নেহছায়াতলে,
দিব্যালোক দিঅ মাতা হৃদশতদলে।
অনন্ত প্রেমর মধুময় আলিঙ্গনে,
অনন্ত স্নেহর পুণ্য অমৃতচুম্বনে
সার্থক সফল ধন্য কর তা জীবন,—
শ্রীপদে মাগই ভিক্ষা এ অধম জন।

সত্য-সত্যই কনিষ্ঠকে যে পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্নেহের আলিঙ্গন ও স্নেহচুম্বন দিয়াছেন, সেই পবিত্র দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

(গ) দাম্পত্য জীবন

অনুমান বারোবৎসর বয়সে বলরামজীর নয়বৎসর বয়স্কা কন্যা চম্পা—ওরফে পদ্মাবাঈ-এর সহিত মধুসূদনের বিবাহ হইয়াছিল। ওড়িষ্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত পতি-পত্নীর দেখা সাক্ষাৎ হইত না। বধূ বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পর পুনর্বিবাহ নামক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলে, ইহারা পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করিত। এই

রামকৃষ্ণ রাও
(ভক্তকবির শ্যালক এবং ভগিনীপতি)
জন্ম—২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ ;
মৃত্যু ২৮ নভেম্বর, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ।
(১৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভক্তকবির সহধর্ম্মিণী—পদ্মা বাঈ

জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ খৃঃ ; মৃত্যু—২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

(৭৭ পৃঃ)

মিলনের প্রথম রাত্রিটি মধুসূদনের কবিপ্রাণে কি আবেগ আনিয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহার 'যৌবনর স্বপ্ন' কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কবি নগেন্দ্রবালা সরস্বতী সেই কবিতাটির যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহার শেষ স্তবকটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

"সহসা দেখিনু পুন চমকি পুলকে
ষোড়শী সুন্দরী মূর্তি সম্মুখে আমার।
শোভিত আননপদ্ম ললিত অলকে,
সর্বাঙ্গে পতিত শুভ্র রশ্মি চন্দ্রিকার।
অমণ্ডনা, দীন বস্ত্রে, মনোজ্ঞ মণ্ডনা,
লজ্জা মূর্তিমতী, আঁখি অর্ধ মুকুলিত,
আপন হৃদয়ে বুঝি—এ হৃদি-কামনা
স্বর্গ হতে মোর কাছে যেন উপনীত।
হৃদয়ের লক্ষ্মী মোর, প্রাণ-সীমন্তিনী,
চিনিনু নিমেষে সেই নীরব-ভাষিণী ;
প্রেমাবেগে বাঁধি আমি বাহুর বন্ধনে
কহিনু 'পরাণ-সখি, এ প্রাণ তোমার'।
নীরবে অর্পিল বালা জীবন-যৌবনে
হৃদয়-কুটীর-রাণী প্রেয়সী আমার।"

এই কবিতার শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তিতে তিনি তাঁহার 'হৃদয়-কুটীর-রাণী', 'নীরব-ভাষিণী' 'পরাণ-সখী'র যে ছবিটি আঁকিয়াছেন, তাহাতে কিশোরী পদ্মার অনাড়ম্বর লজ্জারুণ মূর্তিটি প্রকাশিত। মধুসূদন শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত নবীন যুবক, পত্নী নিরক্ষরা, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আদর্শে গঠিতা। এই কিশোরীটির কথা মনে করিলে, "পতি-প্রিয়া হিতে রতা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া" —এই উক্তিটি মনের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদন যখন যাজপুরে গেলেন, তখন তাঁহার উদারহৃদয় পিতা দেশপ্রচলিত রীতি অমান্য করিয়া পুত্রবধূকেও পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। এই বধূটির জীবনটিকে সকল দিক দিয়া ফুটাইবার জন্য মধুসূদনের প্রয়াস ছিল। বধূরও স্বামীর মনোমত হইবার জন্য চেষ্টা ছিল। ইঁহার পরবর্তী জীবন তাহার বহু সাক্ষ্য দেয়। স্বামী যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন, ও সেই আদর্শে জীবনটিকে চালিত করিতে লাগিলেন, পত্নী পদ্মা তাঁহার সরল স্বচ্ছপ্রাণেও সেই উচ্চ

আদর্শের আভাস অনুভব করিলেন। পতির অবলম্বিত পথে তিনিও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্বামীর প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাঁহাকে ধীরে ধীরে স্বামীর সকল কার্যের মধ্যে সহযোগিতা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত সহধর্মিণী হইবার পথে অগ্রসর করিয়া দিল। স্বামীর নিকট তিনি ওড়িয়া ও বাংলা লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। বহু সন্তানের জননী ও বৃহৎ পরিবারের গৃহিণী হওয়াতে, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; কিন্তু ভক্ত, বিশ্বাসী বলরামজী ও তৎপত্নী নিষ্ঠাবতী মিছুবাঈ-এর এই কন্যা পিতামাতার বহু গুণের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন—মধুসূদনের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিবার পক্ষে তাঁহার প্রকৃতি অনুকূল ছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মধুসূদন পরলোকগমন করেন। তাঁহার সহধর্মিণী তৎপূর্বেই চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে একটি চক্ষু ও কয়েক বৎসর পরে অপর চক্ষুটিও নষ্ট হইয়া যায়। অন্ধ অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটাইয়া, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর আমাদের জননীদেবী পরলোকগমন করেন।

মধুসূদন ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। আঠারোবৎসর বয়স হইতেই তিনি সংসারের দায়িত্ব লইয়া পিতার ভার লাঘবের জন্য সর্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। ছোট ভাইগুলিকে শিক্ষিত করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা, ভগিনীদিগের বিবাহ দেওয়া ও ইহাদের সকলের কল্যাণের জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকার কতো দৃশ্য মনে পড়ে। এখানে এ-উল্লেখ খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের মাতৃদেবী আজীবন পিতৃদেবের সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী থাকিয়া, পিতৃদেবের পরলোকগমনের পরেও, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বৃহৎ রাও-পরিবারের সকলের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া, প্রাচীনকালের একান্নবর্তী পরিবারের গৃহিণীর আদর্শ-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) মধুসূদনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কর্মসূচী

প্রত্যুষে উঠা মধুসূদনের আবাল্য অভ্যাস ছিল। আমরা জ্ঞানোন্মেষের সময় হইতে দেখিয়াছি, তিনি প্রাতে সর্বাগ্রে ঈশ্বর স্মরণ করিতেন:

(১) জাগো সকলে এবে, অমৃতের অধিকারী,
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণা-নিধান, পাপতাপহারী।...

(২) জগতমোহিনী উষা আগত অবনীতলে,
নয়ন মেলরে মন জয় জগদীশ বলে।...

(৩) অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?...

—প্রভৃতি প্রিয় সঙ্গীতগুলি তাঁহার কণ্ঠে মৃদুস্বরে গীত হইয়া যেন পরিবারস্থ সকলের অন্তরকে বিভুমহিমা-স্মরণে নূতন দিবসের কার্যে উদ্‌বুদ্ধ করিত।

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কিছুক্ষণ তৈলমর্দন করিবার পরে স্নান করিতেন। তৎপরে একটু আদা-নুন খাওয়ার অভ্যাস ছিল। স্নানান্তে পারিবারিক উপাসনা। অধিকাংশ সময় তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া একতারা সহযোগে গান করিয়া যাইতেন। এই গান অনেকসময় কন্যাগণ লিখিয়া রাখিতেন। মনের যেভাবটি সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশিত হইত, আরাধনা-প্রার্থনার মধ্যে সেই সুরটি বাজিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।

উপাসনান্তে কিছু জলযোগ করিতেন। মধুসূদন নিরামিষাশী ছিলেন। তৎকালে বহু ব্রাহ্ম নিরামিষ আহার করিতেন। আমার বোধ হয়, মধুসূদনও ২০।২১ বৎসর বয়সের সময় হইতে আমিষ-ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের জননীদেবীও পতির পদানুসরণ করিয়া আমিষ-ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে মাছ খাইতে দেখি নাই। আমরাও ভাইবোনেরা সকলে বাল্যকাল হইতে নিরামিষ খাইতাম। বড় হইলে পর কেহ কেহ আমিষ-ভোজনে অভ্যস্ত হইয়াছেন। বাড়ীতে মাছমাংস রান্নার কোন বাধা ছিল না। কাকা, কাকী, পিসীমারা ও অন্য আত্মীয় যাঁহারা আমিষ খাইতেন, তাঁহাদের জন্য আমিষ রান্না হইত। এ বিষয়ে মধুসূদন কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

জলযোগের পর অন্নগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, পুত্রকন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অন্যান্য যেসকল আত্মীয় বালক তাঁহার পরিবারে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিত, তাহাদের পড়াশুনা দেখিতেন ও গৃহস্থালীর কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

হুঁকায় করিয়া তামাক খাওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল, কিন্তু সমগ্র দিনে তিন-চারি বারের অধিক খাইতেন না।

আহারান্তে কর্মস্থলে যাইবার পূর্বে অধিকাংশ সময় তাঁহার সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস ছিল। অপরাহ্নে কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যানের তত্ত্বাবধান করিতেন।

কবি মধুসূদন ফুল বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বাগানে গোলাপ, মল্লিকা, কামিনী, টগর, গন্ধরাজ, মালতী, শিউলি প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুতে প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও গন্ধে প্রাণ-মন হরণ করিত। শীতকালে গাঁদাফুল বাগান আলো করিয়া থাকিত। অশোকফুল তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তাঁহার রোপিত অশোকবৃক্ষ এখনও গৃহপ্রাঙ্গণে রহিয়াছে। আম, জাম, পেয়ারা, সপেটা, নারিকেল, জামরুল, বেল, গোলাপজাম, কামরাঙা, পেঁপে, লেবু, বাতাবী, কদলী, আতা প্রভৃতি নানাবিধ ফলের গাছ তাঁহার বাগানে ছিল। তাঁহার রোপিত কোন কোন ফলের গাছে এখনও ফল হইতেছে। শাক-সবৃজির বাগানেও বিভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ তরিতরকারি জন্মিত।

বহুদিনের পুরাতন জগু চাপরাসী প্রধানতঃ এই বাগানে কাজ করিত। বাবার সমসাময়িক অনেকে ইহাকে দেখিয়াছেন। দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরকাল আমাদের পরিবারে থাকিয়া সে এই পরিবারেরই একজন হইয়া গিয়াছিল।

বৈকালে দর্শনার্থী কেহ কেহ আসিলে, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিতেন। সন্ধ্যায় আবার পারিবারিক উপাসনা হইত; তৎপরে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত নিজের লেখাপড়া প্রভৃতিতে কাটিত। ইহার মধ্যে সুবিধামতো তিনি পুত্রকন্যাগণের সহিত নিজ জীবনের বহু কথা, দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা, যেসকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন, যাঁহাদের উপাসনা ও সঙ্গীতে যোগ দিয়া তিনি উপকৃত হইয়াছেন—সেইসকল কথা গল্পচ্ছলে বলিতেন। রাত্রে আহারের সময় প্রায়ই পুত্রকন্যাগণকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিতেন। সেদিনটি কাহার কিভাবে কাটিয়াছে, সে-বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়া, হাস্য-পরিহাস ও আনন্দের ভিতর দিয়া ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হইত। তৎপর কিছুক্ষণ শয্যায় শয়িত অবস্থায় পাঠ করিতে করিতে নিদ্রিত হইতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগের আক্রমণে ও অনিদ্রা-রোগে তিনি প্রায়ই ক্লেশ পাইতেন। শূলরোগের আক্রমণ তাঁহাকে বড়ই ক্লেশ দিত। জীবনের শেষ কয়েকবৎসর এই দুই রোগে দারুণ কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্যসূচীর যে বিবরণ দিলাম, এই দুই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বহুসময় তাহার ব্যতিক্রম হইত।

মধুসূদনের দৈনন্দিন পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা :—গীতা, বাইবেল, কোরাণ, উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মধর্মের বিবিধ সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ও জীবনচরিত প্রভৃতি বার বার পড়িতেন। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন ভাষায়

[stamp]

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের যেসকল পুস্তক তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার নামোল্লেখ করিতেছি :

১। ইংরাজীতে—মার্টিনো (Martineau), রাস্কিন (Ruskin), ইমর্সন (Emerson), ভয়সী (Voysey), ভিক্টর হ্যুগো (Victor Hugo), ম্যাথিউ আর্নল্ড (Mathew Arnold), আর্মস্ট্রং (Armstrong) প্রভৃতি মনীষিগণের দার্শনিক প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি এবং টেনিসন (Tennyson), ওয়ার্ডস্‌ওঅর্থ (Wordsworth), গ্যেটে (Goethe), শেক্সপীয়র (Shakespeare), শেলী (Shelley) প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিগণের কাব্য ও সাহিত্য গ্রন্থরাজি।

২। সংস্কৃতভাষায়—ভবভূতির 'উত্তররামচরিত', 'মালতীমাধব', কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌', বাল্মিকী-রামায়ণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, বেদান্তদর্শন, প্রভৃতি।

৩। বঙ্গভাষায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতির ও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ইত্যাদি।

৪। ওড়িয়া ভাষায়—সারলা দাসের মহাভারত, জগন্নাথ দাসের শ্রীমদ্‌-ভাগবত, দীনকৃষ্ণের রসকল্লোল, বলরাম দাসের রামায়ণ, প্রভৃতি।

৫। মহারাষ্ট্র ভাষায়—ভক্ত তুকারামের উপদেশাবলী এবং আধুনিক কয়েকজন পণ্ডিতের রচনাবলী।

৬। এতদ্ব্যতীত বহু বাংলা, ইংরাজী, ওড়িয়া ও মহারাষ্ট্র ভাষার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা (আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ) হইতে যেসকল পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাদি প্রকাশিত হইত, তাহার প্রায় সমুদয়ই তিনি লইতেন এবং সেগুলিও তাঁহার দৈনিক পাঠ্যের অন্তর্গত ছিল।

(ঙ) সন্তান-বাৎসল্য ও সন্তানগণের শিক্ষাব্যবস্থা

স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগী মধুসূদন কন্যাগণকে কিরূপ শিক্ষা দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দিতেছি :—

কটকে তখন র‍্যাভেন্‌শ' বালিকা বিদ্যালয়ে ওড়িয়া ও বাংলাতে মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ানো হইত। তিনি কন্যাগণকে ও ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবাকে

ঐ স্কুলে দিয়া উচ্চশ্রেণীতে একবৎসর বাংলা ও একবৎসর ওড়িয়া পড়ানোতে দুইটি ভাষায় ইহাদের সম্যক্ অধিকার জন্মিয়াছিল। এগার বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহাদের ঐ স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া যায়, এবং বাসন্তী, রেবা ও অবন্তী বিভিন্ন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু তখন কটকে বালিকাদিগের জন্য আর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে, ইহাদের স্কুলের শিক্ষা আর অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু মধুসূদন কন্যাগণের অন্তরগুলি শিক্ষায় উন্নত করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। বঙ্গদেশে সে-সময় যে-মহাকবিগণের কাব্য ও কবিতা, মনীষি-ব্যক্তিগণের যেসকল চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইত, সেসকল তিনি আনাইতেন ও মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণা এই কন্যাগণকে উহা ক্রমে ক্রমে পড়িতে দিতেন এবং নিজে আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। নিম্নোক্ত বইগুলির কথা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য : কবিবর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমস্ত রচনা; ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ', ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব'।

ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী', 'ধর্মতত্ত্ব', 'তত্ত্ব-কৌমুদী' এই তিন পত্রিকারই তিনি গ্রাহক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত কিছু রচনা প্রকাশিত হইত, সেসবই তিনি আনাইতেন। এতদ্ভিন্ন আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা লিখিত পুস্তকসমূহও তিনি কিনিতেন। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, মহর্ষির আত্মজীবনী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের লিখিত ভগবদ্‌গীতা, কেশবচন্দ্রের সুবৃহৎ জীবনী—তিন খণ্ড, ও অন্যান্য বহু মহৎব্যক্তির জীবনী আমাদিগকে পড়িতে দিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু কবিতা বাল্যকালে আমাদের কণ্ঠস্থ করাইয়া আবৃত্তি করাইতেন। ১৯।২০ বৎসর বয়সের পূর্বে কলিকাতায় যাই নাই, তৎপূর্বে ব্রাহ্মসমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভের সুযোগও পাই নাই; কিন্তু উপরোক্ত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাদি নিয়মিত পাঠের ফলে শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অপরিচিত বোধ হইত না এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধেও মোটামুটি জ্ঞান হইয়াছিল। একটু বড় হইলে পর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের লিখিত নাটক প্রহসন প্রভৃতি, স্বর্ণকুমারী

দেবীর উপন্যাস, প্রভৃতি পড়িতে দিয়াছিলেন। আমি যখন মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের পারিতোষিক পাই, তখন পিতৃদেবের অনুমোদনে মহিলা-কবি কামিনী সেন (পরে রায়)-এর 'আলো ও ছায়া', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাত-সঙ্গীত' পারিতোষিক পাইয়াছিলাম। বাল্যে পঠিত এই কবিতাগুলি আজীবন আমার অন্তরকে স্নিগ্ধ সরস করিয়া মহৎ ভাবের প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে।

কন্যাগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। পিতৃদেবের নিকট বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আসিতেন। মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির কাব্যালোচনা হইত। প্রভাকর মিশ্র নামক একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কালীগলিতে আমার পিত্রালয়ের সন্নিকটে যে বর্ধমান রাজবাটী এখনও পুরাতন অবস্থায় আছে, তৎসংলগ্ন জমিতে অবস্থিত গৃহে বাস করিতেন। তাঁহার বহু উদ্ভট শ্লোক কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি আলোচনাকালে এই সকল শ্লোক বলিতেন ; শুনিয়া শুনিয়া আমারও বহু শ্লোক কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—কিছু কিছু এখনও মনে পড়ে :

১। যা রাকা শশী-শোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী,
যা সৌন্দর্য-গুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।
যা গোবিন্দ-রস-প্রমোদ-মধুরা সা মাধুরী মাধুরী,
যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

২। প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্ন-নিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ,
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণাঃ ন পরিত্যজন্তি।

চাণক্য শ্লোক ও মোহমুদ্গরের অধিকাংশ শ্লোক আমার কণ্ঠস্থ ছিল।

নয়-দশ বৎসর বয়স হইতে বাড়ীতে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ-সহযোগে আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। হাইস্কুলে তখনকার দিনে যে সকল সংস্কৃত বই পড়ানো হইত, তাহাও ধারাবাহিকভাবে পড়িয়াছি। তৎপরে রঘুবংশ, উত্তররামচরিত, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রভৃতি বাবার নিকট পড়িয়াছি। সংস্কৃত উচ্চারণ তাঁহার অতি বিশুদ্ধ ছিল।

সংস্কৃত ছন্দানুযায়ী (অনুষ্টুভ্, শার্দুল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনীবৃত্ত প্রভৃতির) আবৃত্তি প্রাণমনকে মুগ্ধ করিয়া দিত। এই সকল

কাব্যপাঠকালে, রচনাগুলির সমালোচনার সহিত কবিগণের জীবনী ও তাঁহাদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি যাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সেগুলি গল্পচ্ছলে আমাদের নিকট বলিতেন। ইহার মধ্যে পুরাকালের স্বাধীন ভারতের রাজন্যবর্গের ও তাঁহাদিগের সভাস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর ও দেশের তৎকালীন অবস্থা আমাদিগের কিশোর-জীবনকে কতভাবে অনুপ্রাণিত করিত!

আমরা বাল্যকাল হইতেই ওড়িয়া ও বাংলা ভাষা একসঙ্গেই পড়িয়াছি। এই দুইটি আমাদের কাছে মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নিম্নশ্রেণী হইতে মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত রাধানাথ ও মধুসূদনের গদ্য পদ্য রচনা পড়িয়া আসিয়াছিলাম। স্কুল পরিত্যাগের পর ওড়িয়া ভাষায় ইঁহাদের যতকিছু রচনা প্রকাশিত হইত, সবই পড়িতাম। রাধানাথের নন্দিকেশ্বরী, চন্দ্রভাগা, কেদার-গৌরী, দরবার, মহাযাত্রা প্রভৃতির কত অংশ কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। এখনও তাহাদের কিছু কিছু স্মৃতিপথে উদিত হয়। মধুসূদনের কবিতার মধ্যে যে নীতি, ধর্ম, সত্যপথে চলিবার আহ্বান, ও কবির অন্তরের জড়-জীব-চৈতন্যের মধ্যে মহা সৌন্দর্যের অনুভূতি--তাহা আমাদের জীবনপথে আলোকস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কবি ফকিরমোহনের লিখিত পদ্য ও হাস্যরসের বই আমরা অনেকবার পড়িয়াছি। কবির রচনার মধ্যে তাঁহার পরিহাস-কুশলতা আমাদিগকে বাল্যে হাসির খোরাক যোগাইত। মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি—

"আদর্শ মনুষ্য যেবে দেখিবাকু চাহ
ধাঁই আসি থরে দেখিযাঅ মধুরাও!"

ইহার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি—

"ওজনরে হেব মধু অঢ়েই পশুরি,[১]
কেমন্তে রখিছি এত গুণ পেটে পূরি?"

এই দুই লাইন বলিয়া আমরা বাল্যকালে কত আমোদ উপভোগ করিতাম।

একটু বড় হইলে, তাঁহার লিখিত উপন্যাস 'ছ'মাণ আঠগুণ্ঠ' প্রভৃতি

১। পাঁচ-সের ওজনের বাটখারা।

পড়িয়া তৎকালীন ওড়িষ্যার গ্রামের ছবিটি চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়াছে। রামশঙ্কর রায়ের ওড়িয়া নাটক ও ওড়িষ্যার নবীন লেখকদের বহু রচনা—পুস্তক, সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হইত, তাহা পড়িতাম।

আমার অনুমান হয়, ওড়িষ্যার প্রাচীন কবিদের লিখিত বহু পুস্তক আমাদের বাল্যকালে মুদ্রিত হয় নাই। তালপত্রের পুঁথি হইতে পরবর্তী কালে ক্রমে ক্রমে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। 'কেশব কোইলি', 'দার্ঢ্যতা ভক্তি', 'জণান' (দেবদেবীগণের স্তুতিবন্দনা), ভাগবত (একাদশ স্কন্ধ) প্রভৃতি পড়িয়াছি, মনে হয়। কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতির রচিত কবিতা কিছু কিছু পিতৃদেবের মুখে অনেক সময় শুনিয়াছি; কিন্তু সমগ্র পুস্তক পড়িতে পাই নাই। ইঁহার রচনা সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হয়, ইনি প্রধানতঃ আদিরসের কবি বলিয়া সুনীতিপরায়ণ মধুসূদন সমগ্র পুস্তক আমাদিগকে পড়িতে দেন নাই।

আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন বাংলা এবং ওড়িয়াই পড়ানো হইত, ইংরাজী আদৌ ছিল না। বাড়ীতেই প্যারীচরণ সরকার-কৃত *First Book of Reading, Second Book of Reading,* প্রভৃতি অল্প অল্প পড়িয়াছিলাম। স্কুল ছাড়ার পর বাবা বাড়ীতেই ইংরাজী পড়ার ব্যবস্থা করেন; অধিকাংশ সময় নিজে পড়াইতেন। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, কটকের বাহিরেও কত সময় তাঁহাকে যাইতে হইত; এইসব কারণে এই পড়া নিয়মিত প্রতিদিন হইত না। কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর, তিনি শেক্সপীয়র, টেনিসন, বায়রন, গ্যেটে প্রভৃতি মহাকবির রচনা হইতে কোন কোন অংশ আমাদিগকে পড়াইতে বসাইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে বিদেশীয় এই কবিগণের রচনার রস ও সৌন্দর্য আমাদিগের প্রাণকে চমৎকৃত করিত।

সন্তানগণের চরিত্রগঠনবিষয়েও তাঁহার দৃষ্টি সজাগ থাকিত। একটু বড় হইলেই তাহাদের দৈনন্দিন 'রুটীন' করিয়া দিতেন। তাহার মধ্যে নিজে নিজে ঈশ্বর-স্মরণ, পাঠ ও গৃহস্থালীর কর্ম প্রভৃতির সময় নির্দিষ্ট থাকিত।

আমার যখন বারোবৎসর বয়স পূর্ণ হয়, সেই জন্মদিনে উপাসনার পর প্রতিদিন একাকী প্রার্থনা করিতে ও সেই প্রার্থনা একটি খাতায় লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে তিনি ঐ খাতা দেখিতেন ও আমার সঙ্গে

সে-বিষয়ে কথা বলিতেন। আমার দিদি বাসন্তী দেবী ও দাদা জয়ন্ত রাওয়ের ধর্মচেতনা উদ্‌বুদ্ধ করার দিকে তাঁহার প্রয়াসের কথা শুনিয়াছি।

দিদির চৌদ্দবৎসর পূর্ণ হওয়ার পরদিনেই বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পূর্বেই দিদিকে ব্রাহ্মধর্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তকসকল পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। দাদাকেও অনুরূপ শিক্ষা দিয়া, বোধহয় ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আমিও প্রায় কুড়িবৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। সন্তানগণকে দীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি নিজে ও ধর্মবন্ধুগণের সাহায্যে ধর্মশিক্ষা দিতেন। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি পড়িতাম তাহাও তাঁহারই আগ্রহে। আমার চৌদ্দ-পনরো বৎসর বয়সের সময় নববিধান সমাজের গৃহস্থ-প্রচারক, ভক্তিভাজন রাজমোহন বসু মহাশয় সপরিবারে কটকে আসিয়া বাস করেন। এই সমবিশ্বাসী সাধু রাজমোহনের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং তাহা গভীর ধর্মবন্ধুতায় পরিণত হয়। পিতৃদেবের অনুমোদনে আমরা তাঁহার নিকট বহুসময় ধর্মশিক্ষা পাইতাম। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মগণও মধ্যে মধ্যে কটকে আসিয়া আমাদের গৃহে অতিথি হইতেন। তখন সঙ্গীত, কীর্তন, উপাসনা ও আলোচনাদিতে বাড়ী যেন উৎসবময় হইয়া উঠিত। ইঁহাদিগের সঙ্গের পবিত্র প্রভাবে আমাদিগের বাল্য ও কৈশোর জীবন কাটিয়াছে। ভক্ত, প্রেমিক, সাধু রাজমোহন বসু মহাশয়ের নিকট আমি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হই।

মধুসূদনের জীবন যেমন একদিকে অমৃতময়, অপরদিকে তেমনি তেজোময় ছিল। এই প্রেমিক জীবনে যেমন প্রেমামৃতের রস প্রবাহিত হইয়া চলিত, তেমনি সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, তেজস্বী জীবনের তেজের প্রভাব নিকটস্থ সকলেই অনুভব করিতেন। পুত্রকন্যাগণের জীবন যাহাতে এই অমৃতময় ও তেজোময় পথে চালিত হয়, এইটি তাঁহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি এই আকাঙ্ক্ষাকে সন্তানদিগের জীবনে রূপায়িত করিতে কত ভাবে কত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

পরিবারে বালক-বালিকাদিগের মনের সদ্ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার যে অবিরাম চেষ্টা ছিল, তাহা যেমন একদিকে আন্তরিকতাপূর্ণ, প্রেমে সরস ও স্নেহ-কোমল ছিল, অপরদিকে তাহারা যাহাতে দৈনন্দিন

জীবনে সত্যপথে চালিত হয়, শৃঙ্খলা- ও নিয়মানুবর্তী হইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়, তজ্জন্য তাঁহার তেমনি দৃঢ়তা ছিল। আমার শ্বশুরদেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মানবজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে যে অমূল্য উক্তি আছে—"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম ও ভগবানে ভক্তি"—আমার মনে হইত পিতৃদেব এই আদর্শ নিজের সম্মুখে রাখিয়া ইহার সার্থকতা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধু, ছাত্র যেকেহ তাঁহার নিকট-সংসর্গে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ পথে টানিয়াছেন।

পুত্রকন্যাগণ যাহাতে বাল্যকাল হইতে সৎসঙ্গে সৎ ভাবের মধ্যে বর্ধিত হয় সে-বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। বাড়ীর বাহিরে গিয়া তাহাদের খেলাধুলা করার অনুমতি ছিল না। বাড়ীর মধ্যেই ইহাদের জন্য খেলার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। পরিচিত কয়েকটি আত্মীয়-বন্ধু-গৃহ ব্যতীত ইহারা অন্য কোথাও যাইতে পাইত না; তাহাতেও অনুমতি লইয়া যাইতে হইত ও তাঁহার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইত। এখনকার মতো সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির প্রাচুর্য তখন ছিল না, সিনেমার নামও তখন আমরা শুনি নাই। একবার 'সাঙ্গলি থিয়েটার' (কেবল পুরুষদিগের দ্বারা অভিনীত) নামে একটি নট-সম্প্রদায় কটকে অভিনয় দেখাইতেছিল। উহার প্রধান চালক মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে মধুসূদন কনিষ্ঠা কন্যা, দৌহিত্রী ও একটি বালক পুত্রকে লইয়া অভিনয় দেখিতে যান। কিছুক্ষণ অভিনয় দেখার পর, কোনও দৃশ্য সুনীতিপরায়ণ মধুসূদনের নিকট সুরুচি-বিগর্হিত বোধ হওয়ায় তিনি পুত্র, কন্যা ও দৌহিত্রীকে লইয়া উঠিয়া আসেন। মধুসূদনের ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি ও অকাল-নিষ্ক্রমণে অভিনেতাগণ কিছু সংকোচ বোধ করিয়াছিলেন এইরূপ মনে হইয়াছিল। দর্শকগণও মধুসূদনের পবিত্রতা ও সুনীতির প্রতি আদর ও তদ্বিপরীত ভাবের প্রতি ঘৃণার মধ্যে মধুসূদনের তেজস্বিতার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। বালক-বালিকাগুলি তখন অল্পবয়স্ক হইলেও, এই দৃশ্য তাহাদিগের অন্তরে চির-জাগ্রত আছে।

মধুসূদনের বাল্যবন্ধু ভগবতীচরণ ও বিপ্রচরণ—এই দুই ভাইয়ের কর্মস্থল গঞ্জাম-ব্রহ্মপুরে ছিল। সেখানে বাঙালী ছেলেদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়ায় অসুবিধা দেখিয়া, তাঁহারা মধুসূদনের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কটকে মধুসূদনের বাসগৃহের সন্নিকটে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়।

ভগবতীচরণের বিধবা শাশুড়ীঠাকুরাণী নাতিদিগকে লইয়া এই বাড়ীতে থাকিতেন। মধুসূদনের অভিভাবকত্বে এই বালকগুলি বহুবৎসর কটকের স্কুলে পড়িয়াছিলেন। বাবার বাল্যবন্ধু বলরাম দাসের কর্মস্থল বাঁকিতে (কটক জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা শহর) ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্র, মধুসূদনের পরিবারে থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। ফকিরমোহন সেনাপতির পত্নীবিয়োগ হইবার পর, কিশোরপুত্র মোহিনীমোহন ও বালিকা-কন্যা সরোজিনীকে মধুসূদনের পরিবারে কিছুকাল রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীনাথ দত্ত ওড়িষ্যায় কণিকা, বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ) প্রভৃতি রাজাদের রাজ্যে কয়েক বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারও কয়েকটি পুত্র কটকে অন্য একটি ব্রাহ্মবন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। মধুসূদন ইঁহাদেরও অভিভাবক ছিলেন। এইসকল পিতৃ-বন্ধুগণের সন্তানদিগের সহিত আমাদের যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল, এখনও তাহা স্মরণ করিলে আনন্দ হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ ইহজগতে নাই।

(চ) পারিবারিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

পারিবারিক জীবনের কত ঘটনা মনে পড়ে। পিতৃদেব পরিবারের কর্তা, পরিবারস্থ কনিষ্ঠগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কিন্তু মানুষ কত সময় ভ্রান্তবুদ্ধিতে চালিত হইয়া থাকে; কত সময় কত ভুল-বোঝা-বুঝি মানুষের ধারণাকে বিপথে লইয়া থাকে। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত কত অপমান তাঁহাকে কত সময় জর্জরিত করিত। কিন্তু প্রেমপূর্ণ ক্ষমাশীল প্রাণ তাঁর, সমস্ত বেদনা নীরবে বহন করিয়া, অপমানকারী কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, নিজ অশ্রুজলের সহিত ঐ অপমানকারীর অশ্রুজল মিশাইয়া সকল বিরোধের সমাধান করিতেন; সমস্ত জটিলতা অচিরে সরলতায় রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আমার ভক্তিভাজন শ্বশুরদেব—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি কবিতা, যাহা পিতৃদেবের আগ্রহে আমি বাল্যকালে কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতাম, তাহার দুই পঙ্‌ক্তি—

"যার খরতর শরে জরজর,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান—
নরত্ব দেবত্ব একসাথে তার"

—পিতৃদেবের ওই প্রেমপূর্ণ আচরণ দেখিয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিত

এই স্বর্গীয় দৃশ্যের স্মৃতি এখনও আমাদের জীবনে অনুরূপ মর্মবেদনায় বল দিয়া আসিতেছে।

মনে পড়ে, আমাদের বাল্য ও কৈশোরে পিতৃদেবের সঙ্গে পুরী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি দেখিতে গিয়া এই স্থানগুলি ও সেইসঙ্গে উৎকলের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যগুলির কথা। অতীত উৎকলের মহিমা সেই ভক্তকবির কণ্ঠে যে উদ্দীপনাময়ী বাণী আনিয়া দিত, সেই বাণী আমাদের কিশোর প্রাণে ঝংকৃত হইয়া কী অপূর্ব অনুভূতিতে আমাদের প্রাণমনকে পূর্ণ করিয়া দিত!

স্কুল-পরিদর্শন-কার্যে তাঁহাকে সমগ্র ওড়িষ্যা-প্রদেশ—দক্ষিণে গঞ্জামের উত্তরসীমানা হইতে সমগ্র মোগলবন্দী[১] ও গড়জাত[১] ভ্রমণ করিতে হইত।

একবার এইরূপ গড়জাত ভ্রমণের সময় বউদ (তৎকালীন ওড়িষ্যার একটি করদ রাজ্য) হইতে কটকস্থ ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে কবিতায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

সরস্বতী, কৃষ্ণা, শান্তি, প্রশান্ত, সান্ত্বনা,
সুখে থাক, ঈশ-পদে করি এ প্রার্থনা।
দয়াল বিধাতা মোর হইয়ে সহায়,
লয়ে যেতেছেন মোরে 'বাসন্তী' যথায়,
পথে দেখিতেছি কত বিচিত্র সুন্দর
গিরি নদ নদী তরু লতা মনোহর।
আমরা প্রফুল্ল মনে এ পার্বত্য দেশে
ফিরিতেছি প্রতিদিন স্মরি পরমেশে।
আশা করি, তোমরাও স্মরিছ তাঁহায়
প্রতিদিন সায়ংকালে পুণ্য প্রার্থনায়।
ভুলনা তাঁহারে কভু, ভুলনা, ভুলনা,
সরস্বতী, কৃষ্ণা, শান্তি, প্রশান্ত, সান্ত্বনা!

বৌদ শ্রীমধুসূদন
১৮।৫।৯৫

---

১ মুসলমান তথা ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষশাসনাধীন কটক, পুরী, বালেশ্বর এই তিনটি জেলাকে ওড়িষ্যায় 'মোগলবন্দী' ও দেশীয় রাজন্যগণের শাসিত করদ রাজ্যগুলিকে 'গড়জাত' বলা হইত।

জ্যেষ্ঠা কন্যা—বাসন্তী দেবী তখন বিবাহিতা হইয়া স্বামীর নিকট সম্বলপুরে থাকিতেন। প্রথমা ভ্রাতুষ্পুত্রী—রেবাও তখন বিবাহিতা হইয়া গিয়াছেন। সরস্বতী দ্বিতীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম। দ্বিতীয়া কন্যা কৃষ্ণার অপর নাম অবন্তী।

গড়জাত ভ্রমণের পথ সে-সময় অত্যন্ত দুর্গম ছিল। আমার ভাগ্যে সে সকল স্থান দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু সেইসব স্থানের ভীমকান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও রাজা, প্রজা, আদিবাসী প্রভৃতির জীবনযাত্রার কথা বাবা এমন সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন যে, সে-সব স্থান আর আমাদের নিকট অপরিচিত বোধ হইত না।

আমার মনে আছে, আমার যখন অনুমান নয় কি দশবৎসর বয়স, তখন বাবা একবার দুই কি তিন মাসের ছুটী লইয়া, জ্যেষ্ঠজামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তখন ওড়িষ্যায় রেলপথ স্থাপিত হয় নাই, জলপথে কলিকাতায় আসিতে চারি-পাঁচদিন সময় লাগিত। কটক হইতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণপথে তিনি যেসকল ব্রাহ্ম পরিবারে অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আতিথ্য, উপাসনাশীলতা, চরিত্রের মাধুর্য প্রভৃতির কথা তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগের নিকট গল্পচ্ছলে বলিতেন। নলহাটিতে নীলকণ্ঠ সিদ্ধান্ত[২] মহাশয়ের ও বাঁকিপুরে (পাটনায়) প্রকাশচন্দ্র রায়[৩] মহাশয়ের গৃহের কথা শ্রদ্ধাসমন্বিত প্রাণে এমন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের প্রাণও অপরিচিত এই পরিবারগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হইতে তিনি আমাদের মাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার 'অযোধ্যা প্রত্যাগমন' কবিতার (সংস্কৃত 'রঘুবংশ' হইতে ওড়িয়ায় অনূদিত) এই কয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত ছিল :

জাহ্নবী যমুনা যোগ দেখ গো সুন্দরি,
শুভ্র নীল জল দিশে রুচির কি পরি !
ইন্দ্রনীল পরে মোতি পুণি ইন্দ্রনীল,
গুন্থা হেলা মালা প্রায়ে দিশই সলিল।

২ নীলকণ্ঠ সিদ্ধান্ত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্‌সেলর স্বর্গীয় নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের পিতা।

৩ প্রকাশচন্দ্র রায়—সম্প্রতি পরলোকগত বঙ্গদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতা।

কিম্বা ইন্দীবরে মিশি শ্বেত শতদল
মালা পরি দিশে এহি কলা-ধলা জল।
কি অবা মানসগামী রাজহংস পঙ্‌ক্তি
কাদম্ব দল সংযোগে যেমন্ত দিশন্তি।
অথবা অবনীবর বদনে রচিত
চন্দন রচনা কৃষ্ণ অগুরু মিশ্রিত ;
কি অবা যেমন্ত প্রিয়ে শারদ গগন,
শুভ্র শরদভ্র রন্ধ্রে দিশই শোভন্।
অবা ধলা ভস্ম বোলা শঙ্কর-শরীর,
অসিত উরগে যথা রাজই রুচির।
কি অবা ছায়ারে মিশা চিত্র জ্যোৎস্নাপরি,
দিশই প্রেয়সি, গঙ্গা-যমুনা-লহরী।

প্রেমিক মধুসূদনের প্রৌঢ়বয়সে নাতি-নাতিনীদের সহিত কিরূপ সখ্যভাবে কাটিত, তাহার কত কথা মনে পড়ে। জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তীর প্রথম সন্তান দুইটিই অকালে চলিয়া গিয়াছিল। প্রথমটি কন্যা, তাহার একবৎসর চারমাস বয়স হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি পুত্রসন্তান, জন্মের কয়েক-দিনের মধ্যে সূতিকাগৃহেই তাহার মৃত্যু হয়। সে-সময় পরিবারের সকলে যে দারুণ শোকে কাতর হইয়াছিলেন, তাহা আমার এখনও মনে পড়ে। কিছুকাল পরে বাসন্তী দেবীর তৃতীয় সন্তান—সুনীতি, সম্বলপুরে জন্মগ্রহণ করে। ইহার নামকরণ উপলক্ষ্যে মধুসূদন জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কটক। ১০।১১।৯৪

প্রাণপ্রতিমেষু,

বাবা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আগামী রবিবার খুকীর নামকরণ হইবে জানিয়া সুখী হইলাম।…নামকরণ উপলক্ষ্যে এই গীতটি লিখিয়াছি—

হেরি নাই চর্মচক্ষে, হেরেছি প্রেমনয়নে,
তব করুণার দান, মাগো, তব কন্যাধনে।
আধ আধ ভাষা তার, শুনেনি কর্ণ আমার,
(তবে) কি শব্দে মা বেজে ওঠে প্রাণতন্ত্রী তার চিন্তনে!

সে কোমল তনুখানি, ধরি নাই বক্ষে আনি,
কিন্তু মা জুড়ায় প্রাণ যেন তার পরশনে।
একি মা অদ্ভুত লীলা, দুঃখীজনে দেখাইলা,
ধন্য ধন্য প্রীতি তব এ তব ভব-ভবনে!
কত আশা পূরি প্রাণে, চাহি তব ক্রোড় পানে,
মাগিতেছি করযোড়ে আশঙ্কা-ব্যাকুল মনে—
শিশুরে রাখ তোমার প্রেম ক্রোড়ে অনিবার,
হর দুঃখ পিতামাতার এই ভিক্ষা শ্রীচরণে।
এ শিশু যে পরিবারে, এসেছে আশিসাকারে
জাগায়ে রাখ মা সেথা পুণ্য 'সুনীতি' যতনে।

বিধাতার কৃপায় এই কন্যা (সুনীতি) এখনও তার পিতামাতার একমাত্র সন্তানরূপে জীবিত আছে, এবং বিদুষী সুলেখিকা বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। এই দৌহিত্রীটি তার দাদামহাশয়, দিদিমা ও মামাবাড়ীর সকলের খুবই স্নেহাদর পাইয়াছে।

সুনীতিকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

কটক। ১৫ই জুন ১৯০৫

দিদিমণি আমার,

দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাস হইয়া গেল। তুমি সম্বলপুরের গ্রীষ্মে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছ যে, একখানি পত্রও আমাকে লিখিতে পার নাই। কিম্বা আমাকে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছ। আমি কি এর জন্য অভিমান করতে পারি না? কিন্তু আমি এমনই ভাল যে অভিমান করা দূরে থাকুক, আগেই পত্র লিখিতেছি। অতএব তোমাকে বলিতেই হইবে, বড় ভাল দাদামশাই আমার। যাক সে কথা, এখন তোমার কাছে হিসাব তলব করি। সম্বলপুরে ফিরিয়া যাইবার পর তুমি কি পড়িয়াছ, কি শিখিয়াছ, কি করিয়াছ? আশাকরি তুমি যে হিসাব পাঠাইবে তাহা সন্তোষজনক হইবে। মাঝে মাঝে আমার নিকট একটা হিসাব দিয়ো। হিসাব না দিলে তোমার বাক্সের টাকাগুলি আমি ক্রোক করিয়া লইব!

তোমার কলিকাতায় থাকিয়া যে পড়িবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কি মীমাংসা হইল? বোধহয় তোমার কাকা, খুড়ীমা সম্বলপুরে আসিয়াছেন। তোমার খুড়ীমা কেমন আছেন জানাইবে। টুনু ভাল আছে তো?

তোমার বাবার শরীর কেমন? তাঁর কাছে প্রতিদিন দুবেলায় এক ঘণ্টা মাত্র পড়িলে কত বিষয় শিখিতে পারিবে। আশা করি তিনি তোমাকে কিছুক্ষণ পড়াইতে পারিবেন।

তোমার
সেই সেকেলে দাদা

আমার একমাত্র সন্তান অমরনাথ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কটকে জন্মগ্রহণ করে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রায় পাঁচমাসের শিশুপুত্রকে লইয়া আমি কলিকাতায় (বালিগঞ্জ, পদ্মপুকুর রোডে) আসি। সেই সময় বাবা আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

কটক। ২৯।৪।১৯০৩

মা আমার,

প্রথম কথা খোকার সম্বন্ধে। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাইবার পর তিন চার দিন পর্যন্ত বাড়ীর ভিতর আসিলেই তাহার অভাব তীব্ররূপে অনুভব করিতাম। এখন সে তীব্রতা গিয়াছে। স্মৃতির সাহায্যে তাহার প্রিয়দর্শন মুখের বিমল ভাব ও তাহার হাসির অমৃত কলতান মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি। আবার কবে তাহাকে দেখিতে পাইব! মঙ্গলময় তাহাকে নিরন্তর রক্ষা করুন!"

অমরনাথের মাথাটি বেশ বড় ছিল, সেইজন্যই বোধহয় তাহার হাঁটিতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হইয়াছিল। প্রায় দেড় বৎসর বয়সে সে হাঁটিতে আরম্ভ করে। তাহার হাঁটিতে পারার খবর পাইয়া যে-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"দাদাসাহেব অমরনাথ নাকি হাঁটিবার নবলব্ধ শক্তির পরীক্ষায় প্রায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। আমার মনে তাঁহার আছাড় খাওয়াটা দেখিবার সাধ বড়ই ছিল। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হোক, তিনি যে এতদিনের পর হাঁটিতে পারিয়া বাপ-মায়ের আনন্দ বর্ধন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একশত-এক চুমা ডাকে পাঠাইতেছি।"

১৭ মে, ১৯০৮

আর একটি পত্রের কিয়দংশ :

"খোকা চলিয়া যাওয়াতে ঘর কেমন আল্‌গা আল্‌গা লাগিতেছে। সেখানে পৌঁছিয়া সে কি বলিতেছে? আর কিছু দিনে সে আমাদিগকে

ভুলিয়া যাইবে। যাহা হোক, এখন তাহাকে সযত্নে রাখা তোমাদের প্রধান কাজ। নিকটে পুকুর—সে যেন একলা বাড়ীর বাহির না হয়।"

আমার দাদা—ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের প্রথম পুত্রসন্তান ছয়মাস বয়সে কটকে দারুণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার ডাকনাম ছিল 'নানা'। মধুসূদন এই পৌত্রের মৃত্যুর পর, আমার পত্র পাইয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ভক্তপ্রাণের কী সুন্দর পরিচয়! শোকাহত মধুসূদনের সেই চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

কটক। ৩০।৬।১৯১০

মা আমার,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তাহা পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। এই কয়দিন সেই দেবশিশুর মূর্তি এবং মুখ প্রায়ই চক্ষুর সম্মুখে যেন নাচিতেছে। তাহার নীলোজ্জ্বল চক্ষু দুটি যেন নির্মল শান্তি বিকিরণ করিতেছে। আর তাহাকে এ চর্মচক্ষে দেখিতে পাইব না, কিন্তু প্রভু এই করুন, যেন তাহার শুভ্র পবিত্র আনন-শ্রী আমার স্মৃতিকোষে সুরক্ষিত থাকিয়া আমাকে এই শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ পরব্রহ্মের দিকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করে। ···

অমরনাথকে আমার নিকট পত্র লিখিতে বলিবে। ···

শ্রীমধুসূদন

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তারিখে প্রথম পুত্র জয়ন্ত রাওয়ের দ্বিতীয় সন্তান, মধুসূদনের প্রথমা পৌত্রীর জন্ম হয়। ইহার এক বৎসর-পূর্তির জন্মদিনে মধুসূদন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে লইয়া ইহার নামকরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। জন্মাবধি বাবা ইহাকে 'বিবি' নাম দিয়াছিলেন। এই বিবি নামেই এখনো তাহাকে ডাকা হয়। তাহার নামকরণে বাবা তাহার নাম 'সুজাতা' রাখেন। বাবার জীবদ্দশায় পরিবারে আনন্দোৎসবের এইটিই শেষ অনুষ্ঠান।

এই উপলক্ষ্যে তাঁহার রচিত সঙ্গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

তোমারি আশিস্-সুধা বরিষ এ শিশুপ্রাণে
বাড়ুক জীবন তার সেই সুধা-রস-পানে।
আজি প্রভু বৎসরান্তে, তোমার চরণপ্রান্তে
কোমল মুরতি তার, গড়া তোমারি কল্যাণে,

হেরিয়ে হরষ ভরে, প্রীতি প্রফুল্ল অন্তরে
গাই সবে তোমারি হে মহিমারি জয়গানে।
তুমি তার পিতা মাতা, তাই হে তারে 'সুজাতা'
নামেতে চিহ্নিত করি চাহি তোমারই পানে।
এ গৃহে, এ ধরাধামে, সার্থক কর এ নামে,
এ শিশুরে রাখ সদা তব মঙ্গল বিধানে!

ইহার দুই মাস পরে ২৮শে ডিসেম্বর (১৯১২) তিনি পরলোকগমন করেন।

দ্বিতীয় পুত্র প্রশান্তের প্রথম সন্তান একটি পুত্রকে প্রায় তিনমাস বয়সে, রোগশয্যায় মৃত্যুর কয়েকদিনমাত্র পূর্বে তিনি দেখিয়াছিলেন; পরে এটিও এক বৎসর বয়সে মেনিন্‌জাইটিস রোগে পরলোকগমন করে।

এই কয়টি দৌহিত্রী, দৌহিত্র, পৌত্র ও পৌত্রীকে তিনি দেখিয়াছিলেন, অপরগুলিকে তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

অনুজভ্রাতা জগন্নাথ রাওয়ের কন্যাদ্বয় রেবা ও সরস্বতীর পুত্রকন্যারাও মধুসূদনের স্নেহাদর যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছিল; তাহাদের নামেও পরিহাসপূর্ণ ছোট ছোট কবিতা বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া কত আমোদ করিতেন, তাহার কিছু কিছু মনে পড়ে।

কটকে 'ইদ্‌গা পড়িয়া'র সন্নিকটে জগন্নাথ রাওয়ের বাগানবাড়ীতে তাঁর নাতনী ইন্দিরা (রেবা রায়ের কন্যা)-কে লইয়া মাধবীলতা সমাচ্ছন্ন এক আম গাছের তলায় বসিয়া বলিয়াছিলেন,

মাধবী তরু তলে বসন্তি মধু
পাশে বসি অছন্তি ইন্দিরা বধূ।"

ইন্দিরাকে আদর করিয়া রাণী বলিয়া ডাকিতেন। ইন্দিরার ডাক-নাম ছিল ইনা।" ইনাও তার বড়দাদুকে অত্যন্ত ভালবাসিত। মধুসূদনের কালীগলির বাড়ীতে আসিলে সে তাঁহাকে ছাড়িয়া নিজের মার সঙ্গেও বাড়ী ফিরিতে চাহিত না। আর একটি কবিতায় তাঁর নাতি-নাতনীদের সম্বন্ধে আছে— রবি ইনা ফুটন[১]

চড়ে গাড়ি ফীটন
খায় এগ্‌ মটন
বলে মধুসূদন।

১) রবি ও ফুটন রেবা রায়ের দুই পুত্র এবং ইনা (বা ইন্দিরা) তাঁর একমাত্র কন্যা।

জগন্নাথ রাওয়ের ছোট মেয়ে সরস্বতীর পুত্র অজিতানন্দ যখন পাঁচ বৎসরের বালক, তখন মধুসূদন তাহাকে বলিয়াছিলেন—

অজিতানন্দ রায়
ঘোড়ার ঘাস খায়।

বালক সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তর করিয়াছিল—

মধুসূদন রাও
ঘোড়ার ঘাস খাও!

মধুসূদন নিজে জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত। কত উচ্চ বিষয় সকল নিজে অধ্যয়ন করিতেন ও বয়স্ক ছাত্রগণকে সেই সকল বিষয় পড়াইতেন; কিন্তু শিশুদিগকে পড়াইবার সময় কিরূপ সরলভাবে শিশুচিত্তের উপযোগী করিয়া বুঝাইয়া দিতেন তাহার একটি নিদর্শন দিতেছি:

আমার একমাত্র পুত্র অমরনাথের বয়স যখন অনুমান পাঁচ বৎসর, আমি তখন পিত্রালয়ে, তাহাকে বর্ণ-পরিচয়ের যুক্তাক্ষর পড়াইতেছিলাম। আমার অভ্যাস ছিল, শব্দগুলির বানান শিখাইবার সময় তাহার অর্থও তাহাকে বলিয়া দেওয়া। একদিন 'একাগ্র" এই কথাটির অর্থ তাহাকে বুঝাইতে গিয়া, কি করিয়া বুঝাই ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাবার নিকট গেলাম। বাবা সব শুনিয়া বলিলেন, "খোকা, একটা সুতার গুলি নিয়ে এসো তো তোমার ছোটমাসীর কাছ থেকে।" সে লইয়া আসিলে, বাবা সেই সুতার গুলি হইতে চার-পাঁচ টুকরা সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া, সেই টুকরাগুলির অগ্রভাগকে পাকাইয়া মিলাইয়া দিলেন। তারপর তিনি তাহাকে সেইটি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, এই চার-পাঁচ টুকরা সুতা পাকিয়ে একটা সুতা হয়ে গিয়েছে। তেমনি তোমার মনে কত ইচ্ছা জাগছে—খেলার ইচ্ছা, গল্প করার ইচ্ছা, পড়ার ইচ্ছা, দেখার ইচ্ছা—এইরকম কত ইচ্ছা! কিন্তু সবগুলিকে এক ইচ্ছায় এনে ফেলতে হবে; এই সুতাগুলিকে পাকিয়ে যেমন একাগ্র করা হয়েছে, তেমনি। একেই বলে একাগ্রমনে।"

শিশুরা গল্প শুনিতে ও গল্প বলিতে ভালবাসে। গল্প বলার সময় উহাদের কল্পনাশক্তি কাজ করে। আমার ছেলে অমরনাথের বয়স যখন ৬।৭ বৎসর, তখন তাহার গল্প লেখার খুব ঝোঁক। আমার বাবার কাছে গিয়া "দাদামশায়, গল্প লিখব, খাতা দাও" বলাতে বাবা মুখে মুখে একটি

কবিতা রচনা করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি এই :

কি লিখিবে খোকা এই নূতন খাতায় ?
ভাল কথা, ভাল গল্প পাতায় পাতায়।
কারে বলে ভাল কথা, ভাল গল্প কিবা ?—
যাতে প্রকাশিত হয় কল্পনা প্রতিভা।
কারে বলে কল্পনা, প্রতিভা বা কারে ?—
কল্পনা প্রতিভা কথা কহিব তোমারে :
কল্পনা বানায় নিত্য নূতন প্রসঙ্গ,
প্রতিভা কল্পনা 'পরে ঢালে নবরঙ্গ।
খোকাকে খাতাটি দিয়া দাদামহাশয়,
বলেন লিখিয়া ফেল যত ইচ্ছা হয়।

ইতি অমর-মধুসূদন-সংবাদে প্রথম কল্প।

(ছ) মধুসূদনের গুরুভক্তি ও দেশপ্রেম

ছাত্রাবস্থায় বাবা যেসকল শিক্ষক ও অধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি যে কী ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, অনেক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইতাম।

স্বর্গীয় কবি রাধানাথ রায়ের প্রতি বাবার অসাধারণ ভক্তির কথা উৎকলে সর্বজনবিদিত। আমাদেরও কত দৃশ্য মনে পড়ে। রাধানাথ আমাদের গৃহে আসিয়া বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পূর্বে 'মধু' 'মধু' বলিয়া ডাকিলে, বাবা যে অবস্থাতেই থাকুন, সত্বর ছুটিয়া গিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ঘরে লইয়া আসিতেন। বাবার সেইসময়কার ভক্তি-বিনম্র মুখচ্ছবি এখনও আমার মনে জাগে। রাধানাথের সহধর্মিণী পরশমণি দেবীর নিকট গেলে, পিতা অগ্রে তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া পরে বসিতেন। ইনি আমার বাবা ও মাকে পুত্র ও পুত্রবধূর মতো দেখিতেন। আমাদের সহিতও নাতি-নাতনী সম্পর্ক করিয়া কত হাসি-ঠাট্টা আমোদ করিতেন। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র শশীভূষণ (ডাকনাম 'মধু') আজীবন এই পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মধুসূদনের প্রতি শশীবাবুর যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় বহুসময় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল রাত্রে কটকে রাধানাথ রায় পরলোকগমন করেন। ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার পুরীতে উৎকল সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন; গুডফ্রাইডের ছুটি থাকাতে সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য মধুসূদন কটক হইতে পুরী গিয়াছিলেন। ১৭ তারিখ প্রাতঃকালেই রাধানাথের বিয়োগ-বার্তা পুরীতে ছড়াইয়া পড়ে। মধুসূদন এ সংবাদ পাইয়া একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেদিন আর তিনি ঘরের বাহির হন নাই, সম্মিলনীতেও যোগ দেন নাই। পরদিন তিনি শশীভূষণ রায় (রাধানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র)-কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"বৎস! আমি শোক-সংবাদ পাইয়া বজ্রাহত-তুল্য এখানে পড়িয়া রহিয়াছি। তিনি আমার কী না-ছিলেন! হায়, অন্তিমকালে তাঁর পাদপদ্মে এই মাথা রাখিতে পারিলামনা! অধম হতভাগ্য পাপী আমি, সে পাদস্পর্শ আমার ভাগ্যে ঘটিলনা।

মার কথা ভাবিয়া ও তোমার কথা ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর আছি। [illegible] বোধহয় বাবাকে শেষকালে দেখিতে পান নাই। আহা! তাঁহার প্রাণের কি অবস্থা হইয়া থাকিবে! এ বিষম কালে পরাৎপর প্রভু বিনা কে আর সান্ত্বনা দিতে পারিবে? তিনি এ সংকট কালে তোমাদের শোকদগ্ধ প্রাণ শীতল করুন এবং তোমাদের চিরসহায় হউন।

পরাৎপর পরমাত্মা বাবার আত্মাকে তাঁর সেই পরমাভয় শান্তিময় পাদপদ্মের ছায়ায় নিরন্তর রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

মধুসূদন।"

অবিলম্বে মধুসূদন যখন কটকে ফিরিয়া আসিলেন, আমি তখন পিত্রালয়েই ছিলাম। রাধানাথের মৃত্যু পিতৃদেবকে কিরূপ শোকাহত করিয়াছিল তাহার অনুপম প্রতিচ্ছবি পরবর্তীকালে তাঁহার রচিত "রাধানাথ বিয়োগ" নামক কবিতার নিম্নোক্ত দুই পংক্তিতে অভিব্যক্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম—

শোকে মূঢ় মূকীভূত স্তব্ধ শব্দহীন
সন্তাপ মরুতে বাণী-নির্ঝর বিলীন।

গুরুশিষ্যের সম্পর্ক কত যে মধুর, কত গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে, তাহা উক্ত কবিতাটির নিয়োদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে সুপরিস্ফুট :—

কবি মাত্র রাধানাথ সাধারণঙ্কর,
কিন্তু দেবী, জাণু তুহি, কী থিলে মোহর !
কৈশোরর শিক্ষাগুরু, সদা সুবৎসল,
যৌবনর প্রাণ-বন্ধু একান্ত সরল।
সাহিত্য-সাধনা ক্ষেত্রে শিক্ষাদাতাসখা,
... ...
জীবনে সংসারধামে নিঃস্বার্থতৎপর
মহোত্তম হিতকারী থিলে সে মোহর।
পিতা, মাতা, গুরু, সখা যেহে একাধারে
লভিথিলি মাগো তাঙ্কু পাই তো কৃপারে !

তিনি যে রাধানাথকে পিতা, মাতা, গুরু, সখা বলিয়া লিখিয়াছেন, এটি তাঁহার প্রাণের উপলব্ধির অকপট বাণী। রাধানাথের বিয়োগে পিতৃদেবও পুত্রের ন্যায় অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফকিরমোহন, রাধানাথ ও মধুসূদন সমসাময়িক এই তিনজকে আধুনিক ওড়িয়া-সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া ওড়িয়া-সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়া আসিতেছে। আমি নিজে সাহিত্যিক নহি। উৎকলের সুযোগ্য সাহিত্যিকগণ সে-বিষয়ে উপযুক্তভাবে বলিতে পারিবেন। আমি কেবল নিজে ইঁহাদের যতটুকু দেখিয়াছি ও পিতৃদেবের সহিত ইঁহাদের যে প্রীতির যোগ দেখিয়াছি, তাহাই শুধু বলিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

ফকিরমোহন আমাদের পিতৃদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ। আমরা বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে জ্যেঠামহাশয়ের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি। সেই দীর্ঘায়ত দেহ, হাস্যপ্রফুল্ল মুখশ্রী ও উচ্চকণ্ঠের আহ্বান আজও যেন স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাবার কোন নূতন রচনা প্রকাশিত হইলে, ফকির-মোহন তাহা দেখিয়া, বাবার নিকটে আসিয়া আনন্দে কত যে ধন্য ধন্য করিতেন, সেইসকল দৃশ্য যেন চক্ষের উপর ভাসিতেছে। বাবা 'বসন্তগাথা' কবিতা-পুস্তকে ইঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—আদিকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি

দ্বৈপায়নের বিশ্বজয়ী বীণা ইঁহার হস্তে ধৃত, ও এই বীণার স্বরলহরী উৎকলকে অমৃতপ্লাবিত করিতেছে—

সরল তরল তব সঙ্গীত-তরঙ্গে
হরষে ভসাঅ কবি নানা রস রঙ্গে।
উৎকল-ধরণী জন-হৃদয়-তরণী
ধন্য হেউ বিভু-বরে তব সুলেখনী।

আমার ভক্তিভাজন দাদাশ্বশুর—সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী, ব্রহ্মণ্য তেজের প্রতীক, পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় (ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক ও তাঁহার বন্ধু ছিলেন) জগন্নাথ-দর্শনের জন্য ওড়িষ্যায় গিয়া আমার পিতার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ওড়িষ্যাতে আমার পিতৃদেবের জীবনের প্রভাব দেখিয়া এরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি ফিরিয়া আসিলে পর আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশে একজন বিদ্যাসাগর দেখিয়াছিলাম, এবার ওড়িষ্যার বিদ্যাসাগর দেখিয়া আসিলাম। আমি তোমার পিতাকে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর আখ্যা দিতেছি।"

বঙ্গদেশে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সাধুতা সর্বজন-বিদিত। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, সুকবি সুরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাজকার্যোপলক্ষ্যে ওড়িষ্যায় আসিয়া আমার পিতৃদেবের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি মধুসূদনের চরিত্র-মাহাত্ম্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সর্বদা মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "মধুসূদন রাও ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় রামতনু লাহিড়ী।"

জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম এই ত্রিধারায় মিলিত একটি সুসমঞ্জস জীবনের পরিচয় তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনে, দেশ- ও সমাজসেবার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশভক্তি 'উৎকল গাথা' পুস্তকের কবিতা ও অন্যান্য সঙ্গীতে প্রকাশিত। এইসকল গাথা ও সঙ্গীত ওড়িষ্যার জনহিতকর কত অনুষ্ঠানে গীত হইয়া সকলকে প্রেরণা দিয়া আসিতেছে। আমার মনে আছে, উৎকল-মিলন-মেলা-প্রবর্তক ভক্তিভাজন মধুসূদন দাস মহাশয়ের প্রবর্তনায় কটক নগরীতে যখন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, 'উৎকল সম্মিলনী'র প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভাতে পিতৃদেবের রচিত স্বদেশী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, কটকের বাঙালী জমিদার, সর্বজনমান্য বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সভার কার্যান্তে পিতৃদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

ইঁহার রচিত স্বদেশের গৌরবসূচক কত গাথা উৎকল সন্তানদিগকে দেশপ্রীতিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই মহোদার প্রাণ সংকীর্ণতার ও প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে থাকিয়া, স্বাদেশিকতার সহিত যে সর্বজনীনতার বিরোধ নাই—এই বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন : 'উৎকল জননী প্রতি' কবিতাতে—

শুণমা, শুণমা বারে ডেরিণ[1] শ্রবণ,
বিপুল বিশ্বর মধুময় আমন্ত্রণ।
'ওড়িয়া' 'ওড়িয়া' ক্ষুদ্র হুরি[2] ছাড়ি ক্ষণে
পশন্ত মা, তো সন্তানে বিশ্ব-সভাঙ্গনে ;
নিখিল মানব হৃদে মিশাই হৃদয়,
গাআন্ত বিশ্বাসভরে—জয় সত্য জয় !

'নবযুগ' কবিতাতে—

পৃথিবী ডাকই সকলে শুণ ভারতবাসী
মো জননী তুম্ভ জননী, হুঅ প্রেমে বিশ্বাসী।
... ...
কোটি কোটি কণ্ঠ মিলাই গাঅ আনন্দে মাতি
একমাত্র বিশ্ববিধাতা, এক মানবজাতি।

(জ) জনসাধারণের সহিত মধুসূদনের সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার

বহু দরিদ্র শ্রমিক পরিবার নানাবিধ কর্মসূত্রে আমাদের পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিত। গয়লা-গয়লানী, নাপিত-নাপিতানী, ধোপা-ধোপানী, দরিদ্র প্রতিবেশী প্রভৃতি কত লোকের মুখ আজ মনে পড়ে। ছোটবেলায় দেখিয়াছি, বর্ষীয়সী গয়লানী (তার নাম ছিল মুগী) বাবা ও কাকাকে "ছেলে" বলিত ও রাম-লক্ষ্মণ বলিয়া ডাকিত। ওড়িষ্যাতে "সুনিয়া" নামে যে শুভদিন পালিত হইত (বাংলায় জমিদারদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 'পুণ্যাহ' পর্বের অনুরূপ এটি একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান) সেদিন খুব সকালেই সে একহাঁড়ি দই লইয়া আসিয়া এই দুই ভাই-এর কপালে ফোঁটা দিয়া যাইত। সে আমার দাদা জয়ন্ত রাও-এর জন্মের আগে ধবলেশ্বর মহাদেবের নিকট মানত করিয়াছিল যে, মধুসূদনের পুত্রসন্তান হইলে, সে প্রতি বৎসর কার্তিক-পূর্ণিমাতে ধবলেশ্বর মহাদেবের

১ ডেরিণ শ্রবণ=কান পাতিয়া। ২ হুরি =ডাক।

পূজা দিবে। যতদিন বাঁচিয়াছিল, বর্ষে বর্ষে সে এই মানত পালন করিত। মুগীর মৃত্যুর পরেও, তার ছোট মেয়ে রাণী যতদিন ছিল, এই মানত পালন করিয়াছিল। মুগীর পৌত্র রঙ্গিয়ার কটকে খাবারের দোকান ছিল। সেও আজীবন আমার পিতৃগৃহের সহিত যোগ রাখিয়াছিল।

নর্ম্যাল ট্রেনিং স্কুলে থাকার সময় নন্দ বেহারা নামে একটি চাকর ছিল, সে যখন বৃদ্ধ ও অসমর্থ হইয়া পড়ে তখন বাড়ী যায় এবং আমার মার ইচ্ছানুসারে তাকে মাসিক তিনটাকা বৃত্তি আজীবন দেওয়া হইয়াছিল। সে মাংস খাইতে ভালবাসিত বলিয়া যখন সে গ্রাম হইতে আসিত আমাদের কাকী (জগন্নাথ রাওয়ের পত্নী রমাবাই) প্রায়ই মাংস রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন।

মধুসূদনের ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী যাগমারার বাগানে গোপী সিং নামে একজন সেখানে থাকিয়া বাড়ী, বাগান, জমি প্রভৃতি দেখাশোনা করিত। সে বৃদ্ধ হইয়া কাজে অসমর্থ হইলে আমার মার ইচ্ছানুসারে তাহাকেও মাসিক ছয় টাকা বৃত্তি আজীবন দেওয়া হইয়াছিল।

আমাদের শৈশব হইতে দেখিয়া আসিয়াছি, হরি মিস্ত্রীকে। কালীগলিতে (আমার পিত্রালয়ে) পাকাবাড়ীর ভিত্তিস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার হাতে আজীবন এই বাড়ীর কত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পন্ন হইয়াছে। কেবল তিনিই নহেন, তাঁহার ছেলে অপর্তি-ও এই বাড়ীর কাজকর্ম বরাবর করিয়া আসিয়াছে। কটকে 'সতীচৌরা' নামক শ্মশানঘাটে (কাঠজুড়ি নদীর তীরে) আমার বাবা-মার যে সমাধিস্তম্ভ আছে, তাহাও এই অপর্তি মিস্ত্রীর হাতে গড়া। কয়েক বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইহাদের পরিবারের সহিত আমার পিতৃ-পরিবারের যোগটুকু বজায় রহিয়াছে।

মনে পড়ে, বাবা যখন নর্ম্যাল ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন ফকীর বেহারা নামে গয়লা-জাতীয় একটি চাকর ছিল। তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, একমাত্র বালক-পুত্রটিকে আনিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিল। সেই ছেলেটি ১১।১২ বৎসর বয়সে কলেরা হইয়া মারা যায়। এই শোকার্ত ফকীর বেহারাকে জড়াইয়া ধরিয়া বাবা কাঁদিতেছেন,—এইরূপ কত দৃশ্যই মনে পড়ে।

কটকে কাঠজুড়ি নদীর ওপারের গ্রামের একটি কৃষক পরিবারের যুবতী বধূ শ্বশুরবাড়ীর গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হইয়া কোলের শিশুকে ফেলিয়া কাঁদিতে

LIBRARY
No.........
BANARAS

কাঁদিতে নদী পার হইয়া কটকে চলিয়া আসে। ঘটনাক্রমে সেইদিনই মধুসূদনের একজন ঘনিষ্ঠ প্রবীণ বন্ধু তাহাকে পাইয়া আমার মার নিকট লইয়া আসেন। মা সেই যুবতীটির নিকট সকল বিষয় জানিয়া বাবাকে জানাইলে, বাবা অস্থির হইয়া ওঠেন। বধূটির কাছে তাহার শ্বশুর-পরিবারের বিষয় জানিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া নদীর ওপারের সেই গ্রামে গিয়া, বধূটির শ্বশুরকে ডাকাইয়া আনিয়া ও বুঝাইয়া বধূটিকে তাহার শ্বশুরগৃহে রাখার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। বাবার প্রতি গ্রামের অশিক্ষিতদেরও এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে, সেকালে যখন ওড়িষ্যায় যুবতী বধূ ও কন্যার গৃহত্যাগ অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া তাহাদের সমাজে এবং গৃহ-পরিবারে গণ্য হইত, এবং যুবতীটিকে জাতিচ্যুত ও গৃহ-তাড়িত হইতে হইত, সেই সময় কেবল বাবার কথাতেই এই বধূটিকে তাহার শ্বশুরগৃহ ও তাহাদের সমাজ অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই বধূটির শ্বশুর বাবার কাছে কতসময় আসিয়া— "বাবু, আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন, আমার সংসার রক্ষা করেছেন" বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে।

(ঝ) মধুসূদনের অতিথি-সৎকার

পিতৃদেবের গৃহে অতিথি-সৎকারের কথা এখনও অনেকের মনে থাকিতে পারে। কত যে অতিথি জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে নিজ নিজ প্রয়োজনে আসিয়া একদিন দুইদিন হইতে একমাস দুইমাস পর্যন্ত বাস করিয়া যাইতেন! কত জ্ঞানী গুণী সুলেখক কবি ধার্মিক ব্যক্তিগণের আগমনে ও তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে এ-গৃহে এক নির্মল পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইত। কত সুধী ও সুলেখকদিগের আলাপ-আলোচনায় কতসময় এ গৃহ মুখর থাকিত! সুকবি, হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্মোপলক্ষ্যে একবার কটকে আসিয়া এই গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশভক্তিসূচক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমাদের গৃহেই সঙ্গীত-আসর বসিত এবং তাহাতে কটকের শিক্ষিতমণ্ডলীর সমাবেশ হইত। মনে আছে, এইরূপ সঙ্গীত-আসরে ভক্তিভাজন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় হারমনিয়ম বাজাইবার ভার লইতেন। এইরূপে আমার পুণ্যময় পিতৃগৃহের উৎসবমুখর কত স্মৃতি এই বৃদ্ধাবস্থাতেও আমাদের মনে কত আনন্দ আনিয়া দেয়! ব্রাহ্মসমাজের কত প্রচারক, কত দরিদ্র সাধকের ব্রহ্মনাম-কীর্তন ও মর্মস্পর্শী উপাসনা আমাদের

প্রাণকে কিরূপ ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দিত! ইহার মূলে ছিল—পিতৃদেবের মহোদার প্রাণের অপূর্ব প্রেম ও মাতৃদেবীর নীরব সেবা, যাহা সর্বদা নিজকে পশ্চাতে রাখিয়া অক্লান্তভাবে, প্রসন্নবদনে কার্য করিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত, রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দিগের রোগ-ব্যারামে চিকিৎসা ও অন্যান্য নানাবিধ নিজ-নিজ প্রয়োজনে আসা ও থাকা—সে তো নিত্যকর্ম ছিল। কত অনাত্মীয় এই গৃহে আত্মীয়ের অধিক সেবাযত্ন পাইয়া গিয়াছেন।

(ঞ) মধুসূদনের বন্ধুপ্রীতি

মধুস্থদনের প্রাণসখা দেবাত্মা প্যারীমোহন আচার্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু—ভগবতীচরণ, বিপ্রচরণ, বলরাম দাস প্রভৃতিকে আমরা বহুসময় দেখিয়াছি। ইঁহারা আমাদের কটকের বাড়ীতে যখন আসিতেন, তখন বন্ধু-সহবাসের বিমল আনন্দে ইঁহারা যেভাবে দিন কাটাইতেন ও আমাদিগের প্রতি তাঁহারা যে সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া মন যেন সেই অতীতকে জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিতে চায়।

মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বিপ্রচরণ গঞ্জাম ব্রহ্মপুরে পরলোকগমন করেন। মধুস্থদন এই সংবাদ দিয়া তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে ও দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তীকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কটক— ২।১।১৯০৬

প্রাণাধিকেষু,

... ...

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে আমার দুইজন প্রিয়তম বন্ধু বিপ্রচরণ ও ভগবতীচরণ এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর আছি।

কটক— ৬।১।১৯০৬

মা আমার,

প্রায় এক সপ্তাহ হইল আমি অনিদ্রার ক্লেশে দিন কাটাইতেছি। ভালরূপ কাজকর্ম করিতে পারিতেছি না। স্মরণশক্তির বিলক্ষণ অপচয় হইয়াছে। মনের মত পত্রাদি লিখিতে পারিতেছি না। বিপ্র এবং ভগবতীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া থাকিবে। তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ বিপ্রকে হারাইয়া

দুঃসহ শোকাঘাত পাইয়াছি। সারঙ্গগড়ের সেই মাসী[১] গতকল্য পরলোকগমন করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটুকু শৈথিল্য হওয়াতে অতিবিলম্ব হইয়া গেল। আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইতে পারিলনা। হায়, হায়, একটুকু শৈথিল্যে কি বিষময় ফল ফলে!

আমাদের পিতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন না। তিনি সরকারী কর্মচারী। রাজকার্যের গুরুভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত। কিন্তু তাঁহার জীবনের আদর্শে যেসকল যুবক আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীন বার্তা যে কিশোর ও যুবকদিগের প্রাণকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, দেশ-প্রচলিত সাকার পূজার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে দেয় নাই,—পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের স্নেহ ও আকুলতা এবং বিষয়সম্পত্তির আকর্ষণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই নিদারুণ সংগ্রামে বাবা আজীবন তাঁহাদের চিরসহায় ছিলেন। তাঁহারা বাবাকে যে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, বাবার নিজ সন্তানগণের শ্রদ্ধাভক্তির তুলনায় তাহা কিছু অল্প ছিল না। সাধুচরণ রায়, বিশ্বনাথ কর, রঘুনাথ সিংহ, অক্ষয়কুমার রায় প্রভৃতির কথা এইসূত্রে উল্লেখযোগ্য। সাধুচরণ আমার পিতার জীবদ্দশাতেই অকালে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। বিশ্বনাথ কর ও রঘুনাথ সিংহের পরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের যোগ রক্ত-সম্পৃক্ত আত্মীয় অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। পিতৃদেবের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ কর আমাদের সঙ্গে দিবারাত্রি যে ব্যাকুলভাবে কাটাইয়াছেন, তাঁহার সেই উদ্বেগাকুল দৃষ্টি ও শোককাতর মূর্তিটি আজও আমার মানস-চক্ষে সময়-সময় ভাসিয়া উঠে। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা (১৩০২—পৌষ ও মাঘ—নবম ও দশম সংখ্যা) 'মধুসূদন সংখ্যা' নামে প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশ্বনাথের প্রাণের

---

১ মধুসূদনের বিমাতা তুলসীবাঈ-এর অগ্রজা মধ্যমা ভগিনী। যাজপুরে পুত্রদ্বয় ও বধূদ্বয়কে পাঠাইবার সময় ভাগীরথী ইঁহাকেই অভিভাবিকারূপে উহাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি আজীবন মধুসূদন ও জগন্নাথকে নিজ সন্তান-তুল্য দেখিতেন। সারঙ্গগড় বা বারাঙ্গ হইতে বহুসময় কটকে আসিয়া আমাদের কাছে থাকিতেন। আমাদের লইয়া তিনি বহু গল্প-কাহিনী শুনাইতেন। ঠাকুরমার স্নেহাদর আমরা ইঁহার নিকটই পাইয়াছি।

আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই 'তিরোধান' লেখাটির কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম—

"মধুসূদন আমাদের জ্ঞানগুরু, কর্মগুরু, ধর্মগুরু, সাহিত্যগুরু, সকল বিষয়েই তিনি আমাদের গুরু ও জীবনপথের পরম সহায়। এ জীবন তাঁহার নিকট যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, তাহা প্রকাশ করার শক্তি আমার নাই। এ জীবন তাঁহার অপার্থিব স্নেহে চিরদিনের জন্য ক্রীত। দেশকালের ব্যবধান এ সম্বন্ধের মধ্যে নাই। মানবীয় ভাব, রক্তমাংসের সম্পর্ক ইহাতে নাই। মৃত্যুর এ সম্পর্ক ছিন্ন করিবার শক্তি নাই। মধুসূদন এ জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়া অনন্তকালের জন্য এ হৃদয়ের গুরুপদে—পূজনীয় দেবতাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।"

রঘুনাথ সিংহ তৎকালীন কটক মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া অনুমান ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বর্মায় চাকুরি লইয়া যান এবং সেখানেই আজীবন বাস করিয়া গিয়াছেন। ইনি দুই-তিনবৎসর ব্যবধানে কটকে আসিলে আমাদের বাড়ীতেই থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে নিজের বড়দাদার মতো মনে করিতাম। মনে পড়ে, আমার দাদা জয়ন্ত রাও এফ. এ. পাস করার পর, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ; অন্যদিকে এই তরুণ যুবককে তখনকার স্টীমার ও জাহাজে চার-পাঁচদিনের পথ কলিকাতায় পাঠাইতে ও রাখিতে পিতৃদেবের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। এই সমস্যায় যখন সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন রঘুনাথদাদা বাবা-মার বড়ছেলের মতো তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও প্রবোধ দিয়া, বাড়ীর সকলকে ভরসা দিয়া, দাদা (জয়ন্ত রাও)-কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার ডাক্তারি পড়ার সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। অনুমান ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়।

বাবার মৃত্যুর সময় রঘুনাথদাদা বর্মায় বেসিন শহরে ছিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বনফুল সিংহ আমাকে লিখিয়াছেন: "১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর জয়ন্তের নিকট হইতে টেলিগ্রামে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া উনি (অর্থাৎ রঘুনাথ সিংহ) বালকের ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে পরিবারস্থ সকলকে লইয়া প্রার্থনা করেন ও পরিবারের সকলে মিলিয়া অশৌচ পালন আরম্ভ করেন। অশৌচকালে উনি তাঁহার ধর্মপিতা পরলোকগত হইয়াছেন বলিয়া কোর্টে যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন।"

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়ে রঘুনাথদাদা বেসিনে গণ্যমান্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাগরিক হিসাবে, ইংরেজ সরকারকর্তৃক প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অক্ষয়কুমার রায় ওড়িষ্যাবাসী বাঙালী ব্রাহ্মণবংশজাত ছিলেন। ইনিও মধুস্থদনের প্রভাবে পঠদ্দশাতেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া, কলিকাতাবাসী একটি ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যাকে (ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক শ্যালিকা) বিবাহ করেন। অক্ষয়কুমার আজীবন মধুস্থদনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও তাঁহার পরিবারে পুত্রভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল ঢেঙ্কানাল (গড়জাতের একটি ছোট দেশীয় রাজ্য)-স্কুলে হেডমাস্টারের কার্য করিয়াছিলেন। পরে কটক টাউন স্কুলেও হেডমাস্টার হইয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠা কন্যার নাম কমলবাসিনী (ডাকনাম 'বাসি')—আমার মার নিকট থাকিয়া র‍্যাভেন্‌শ' বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িত; পরে কলিকাতায় ডায়োসেসন কলেজে আই. এ. পড়ার সময়, বঙ্গদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। দুইটি কন্যা রাখিয়া 'বাসি' অসময়ে পরলোকগমন করিয়াছে। কমলবাসিনী আমার মাকে ঠাকুরমা রূপে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। আমার মা চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমার নিকট ২৬নং বীডন স্ট্রীটের বাড়ীতে কয়েক মাস ছিলেন। সেই সময় প্রেমাঙ্কুরের পিতা এবং বাসির শ্বশুর, মহেশচন্দ্র আতর্থী-মহাশয়, পুত্রবধূ ও শিশু পৌত্রীকে লইয়া আসিয়া আমার মাকে দেখাইয়া গিয়াছিলেন এবং সদাসর্বদা আমার মায়ের সংবাদ লইতেন।

মধুস্থদন আত্মীয়স্বজন-বিয়োগে শোককাতর বন্ধুগণকে যে সান্ত্বনা দিতেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বহু শোক-দুঃখ-প্রপীড়িত বন্ধুগণের অন্তরে সে আন্তরিক সহানুভূতি চিরজাগ্রত থাকিবে। 'উৎকল সাহিত্য'-সম্পাদক বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের ভোলানাথ ও লোকনাথ নামে দুইটি সহোদরের অকালে মৃত্যু হইয়াছিল। ইঁহারা তিন ভাই আমার বাবার নিকট ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃবিয়োগ-বিধুর বিশ্বনাথকে সান্ত্বনা দিয়া তখন মধুস্থদন যে পত্র ওড়িয়াতে লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল:

ওঁ

পরত্র গৃহমস্মাকম্।

রঘুনাথপুর

প্রাণের বিশ্বনাথ,

কি সান্ত্বনা দিব? যাঁহার ধন তিনিই লইয়া গেলেন। একা তিনিই তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন। তোমার প্রাণের ভোলানাথ ও লোকনাথ তোমার প্রাণনাথের কোলে স্বর্গের অমৃত পান করিতেছেন। তাঁহারা এই উৎকলভূমিতে কি অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়া গেলেন! ধন্য তাঁহাদের জীবন!

তাঁহাদের উপরে তোমার কত আশা-ভরসা ছিল। কিছুই পূর্ণ হলনা! অন্তর্যামী ভিন্ন তোমার শোক কে বুঝিবে? আহা, দয়াময়ী মা তোমাকে তাঁহার কোলে বসাইয়া তোমার মুখচুম্বন করিয়া তোমার ভগ্ন হৃদয়কে আলিঙ্গন করুন। মাকে সর্বদা ডাক। তিনি ভিন্ন আর কে আছে?

প্রাণের বিশ্বনাথ, অধীর হইয়ো না। তোমার পিতামাতাকে তুমি ভিন্ন আর কে সান্ত্বনা দিবে? তাঁদের শোকের কথা যে ভাবিতে পারিতেছি না। ভাই, তোমার গুরুকর্তব্যভার স্মরণ করিয়া প্রভুর উপরে নির্ভর রাখিয়া উপস্থিত কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হও।

বাইবেলের 'জোব'-এর চরিত তো পড়িয়াছ? তোমার জীবনে প্রভু কি সেইরূপ ভাগবতী লীলা প্রকটিত করিতেছেন?

আমি তোমার বাড়ীতে পত্র লিখিতেছি।

তোমার অযোগ্য ভাই
মধুসূদন

(ট) মধুসূদনের সন্তান-সন্ততি

প্রথম সন্তান—বাসন্তী দেবী

মধুসূদনের প্রথম সন্তান বাসন্তী দেবী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে, মধুসূদনের কর্মস্থল বালেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন চৌদ্দবৎসর-পূর্তির পরদিনেই বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সহিত ইঁহার ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়। কটকে এই বিবাহই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় এই বিবাহে আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার পরবর্তিকালে সুকবি, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নানা ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া বিদ্বৎসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত খালকুলা গ্রামের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারবংশে বিজয়চন্দ্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র মজুমদারের জমিদারহিসাবে যথেষ্ট সম্মান, সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি ছিল। বিজয়চন্দ্রের প্রথম শিক্ষারম্ভ হয় কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। পরবর্তী কালের সুসাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমশঃ গভীরতা লাভ করিয়া আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জেনারল য়াসেম্ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশন হইতে বিজয়চন্দ্র বি. এ. পাস করেন। তৎপরে বামণ্ডা ও সোনপুর নামক ওড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যদ্বয়ে কয়েক বৎসর রাজকুমারদিগের শিক্ষকতা করেন। পরে কিছুকাল পুরী জিলাস্কুলে এবং কটকেও শিক্ষকতা করেন। অনুমান ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্বলপুর গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকাকালেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এল. পরীক্ষা পাস করিয়া সম্বলপুরেই ওকালতি আরম্ভ করেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সুপণ্ডিত আইনজ্ঞ বলিয়া অচিরেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। আইন-পরামর্শদাতারূপে বামণ্ডা এবং সোনপুর নামক দেশীয় রাজ্যদ্বয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আজীবন বজায় ছিল।

ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং মুণ্ডা ভাষায় বিজয়চন্দ্র বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে শ্রমসাধ্য গবেষণার কাজ করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। প্রথমে দৃষ্টিশক্তির এই ক্ষীণতাকে, ছানি পড়িতেছে এইরূপ মনে করা হয়; কিন্তু পরে জানা যায়, উহা ছানি নয়—গ্লকোমা রোগ, এবং অস্ত্রপ্রয়োগ প্রয়োজন। কলিকাতায় তখন উপযুক্ত চক্ষু-চিকিৎসকের অভাব থাকায়, অমৃতসরে গিয়া অপারেশন করানো হয়। অপারেশনের পর চক্ষু খোলা হইলে দেখা গেল, একটি চোখের দৃষ্টি একেবারেই নাই, অন্যটিতে অতি সামান্য ঝাপসা-ঝাপসা দৃষ্টি আছে, কিন্তু সেই চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণাও রহিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে সে-চক্ষুটিও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাইল।

দীর্ঘ আটাশবৎসর কাল বিজয়চন্দ্র অন্ধ অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু

অন্ধতা তাঁহাকে জ্ঞানান্বেষণে কিছুমাত্র নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। অন্ধ হইবার পর, তিনি ওকালতি ত্যাগ করিয়া সম্বলপুর হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং একজন ওড়িয়া ও একজন বঙ্গীয় সহকারীর সাহায্যে লিখন-পঠনের সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন।

দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পূর্বেই তিনি বাংলাভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ লেখায় ব্যাপৃত ছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর তিনি ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় এম. এ. পড়াইবার জন্য স্যর আশুতোষ বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিজয়-চন্দ্রের পাণ্ডুলিপিখানিতে বাংলাভাষায় তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া স্যর আশুতোষ তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করিলেন। বিজয়চন্দ্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই বক্তৃতাগুলি ছাত্রবর্গের নিকট সমাদৃত হওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্থায়িভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। বারোবৎসর কাল এই অন্ধ অবস্থায় তিনি অতি সাফল্যের সহিত নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও অধ্যাপনার কৌশল ছাত্রবর্গকে মুগ্ধ রাখিত।

অন্ধত্বকে বিজয়চন্দ্র কখনই বিধাতার অভিশাপ মনে করেন নাই, বা তাহার জন্য কখনও খেদ বা বিলাপ করেন নাই। বিধাতার বিধান বলিয়া কী দৃঢ় বিশ্বাসে, কী অসীম নির্ভরতায় এই অন্ধত্বকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বহু পরিচয় তাঁহার আটাশবৎসর-ব্যাপী অন্ধ জীবনকালের মধ্যে তাঁহার কবিতায় গানে ব্যবহারে ও আচরণে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। অন্ধাবস্থায় তাঁহার প্রথম গানটি এই :

"ওগো ও, দুঃখসুখের নিত্যসাথী, এসো কাছে,
পেয়েছি তোমার সাড়া, আঁধার কারাগারের মাঝে।
নিয়ে যাও ভেঙ্গে দুয়ার
এ ভীষণ বিজন গুহার,
(যেখানে) আকাশতলায় বাতাস খেলায়, নিবিড় সবুজ
পাতার ভাঁজে।

নিয়ে যাও লোক মাঝারে,
মানুষের হাট বাজারে ;
(সেখানে) প্রীতির ব্রতে শুনব কত কান্নাহাসির বাঁশী বাজে।
এসেছ, একটু দাঁড়াও,
ধরি হাত—হাতটি বাড়াও,
(পরশে) ফুটবে আলো, চোখের কোলে, রাঙিয়ে ধরা
সোনার সাজে।”

পরবর্তী গানটি—‘অন্ধের নিবেদন’—এইরূপ :

“আঁধার ঘরের মাঝে আমার সাঁঝের বাতি জেলে দাও !
ভেঙ্গে গেছে মাটির গড়া পুরাণ সেই দেলকো-সরা,
আন কিরণ হিরণ-রুচি, খোলামকুচি ফেলে দাও।
কুলগ্নে আজ কি কালরাত্রি আসছে, মাগো জগদ্ধাত্রী !
তোমার অভয় হাস্য আমার অমাবস্যায় ঢেলে দাও।
বিশ্বজনে করে সাথী, চলব আমি, জলবে বাতি ;
পথের বাধা, আঁধার রাতি, পিছন পানে ঠেলে দাও।”

১৩৪০ সালের মাঘ মাসে তাঁহার ‘জীবনবাণী’ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই অন্ধ মনীষীর দীর্ঘজীবনে প্রতিভাত সত্য, তাঁহার তপস্যালব্ধ গভীর জ্ঞান এবং মহোদার প্রেমিক প্রাণের অনুভূত বাণী এই পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সকল দিক দিয়া মানবজীবনকে কী সুন্দর করিয়া তিনি দেখিয়াছেন !

বিধাতা তাঁহার দেহটিকে সুন্দর করিয়া গড়িয়াছিলেন—তিনি রূপবান সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি বড়ই সুন্দর ও বুদ্ধিদীপ্তিতে উজ্জ্বল ছিল। অন্ধ অবস্থায়ও তিনি তাঁহার জীবন-দেবতার অপার কৃপায় বঞ্চিত হন নাই। বাহিরের দৃষ্টিশক্তি হারাইলেও তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে বিধাতা এক অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গীয় প্রভায় তাঁর জীবনের সকল বিভাগ প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহাকে মহাসুন্দরের প্রকৃত সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য দান করিয়াছিল। “মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় করি গো নমস্কার”—কবিগুরুর এই সুমধুর গানটি তাঁহার এতই প্রিয় ছিল যে, অনেক সময় তিনি নাতনীদিগকে ঐ গানটি করিতে বলিতেন। তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব

করিয়াছেন যেন ঐ গানটি তাঁহার অন্তরে নিরন্তর অনুরণিত হইয়া তদীয় মুখমণ্ডলকে শুভ্র সুন্দর ও পুণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

বিধাতা তাঁহাকে দাম্পত্য জীবনেও বড় সৌভাগ্যবান করিয়াছিলেন। আমার দিদি—বাসন্তী দেবীর প্রকৃতি সরল শান্ত ও স্নেহশীল ছিল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা- ও স্বাভাবিক ঈশ্বর-বিশ্বাস-বলে তিনি ভক্তকবির উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। পতির সকল অবস্থায় সাধ্বী পত্নীর প্রতি প্রগাঢ় নির্ভর ছিল।

ইঁহাদের বড় নাতনী তপতী, ডাকনাম 'তাজু', দিদির আদ্যশ্রাদ্ধে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"দাদা ২৮ বৎসর অন্ধ ছিলেন। দিদুর নীরব সেবা ও তাঁর ভগবদ্‌বিশ্বাসী, পুণ্যময় জীবনের সাহায্য না পেলে, দাদার মতো অত বড় জ্ঞানী ধীমান পণ্ডিত ভগবৎপ্রেমিকও কখনও জীবনে এত কাজ, এত নাম, এত গৌরব অর্জন করতে পারতেন না। কত লোক দিদুর এই সেবা দেখে বলেছেন, এ যেন মহাভারতে বর্ণিত গান্ধারীর পুণ্যময় জীবন।"

দ্বিতীয় সন্তান—শ্রীজয়ন্ত রাও

ডাক্তার জয়ন্ত রাও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর কটক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি র‍্যাভেন্‌শ' কলেজ হইতে এফ. এ. পাস করার পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। সেখান হইতে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওড়িষ্যার সরকারী মেডিক্যাল বিভাগে প্রবেশ করিয়া নানাস্থানে কার্য করিয়া অবশেষে সিভিল-সার্জন-রূপে যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যায় ইঁহার নিপুণতার খ্যাতি ওড়িষ্যায় সুবিদিত। ইনি বঙ্গদেশের সুলেখক, পত্রকার ও সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা—শিশুসাহিত্যজগতে সুপরিচিতা সুলেখিকা কলাকুশলা—শ্রীমতী সুখলতা দেবীকে বিবাহ করেন।

তৃতীয় সন্তান—শ্রীমতী অবন্তী দেবী (গৃহে প্রচলিত নাম কৃষ্ণা)

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ কটক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান নেতা, বঙ্গের সুপরিচিত সুসন্তান, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় (২৬নং বীডন স্ট্রীটে) প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য পরলোকগমন করেন।

চতুর্থ সন্তান—শ্রীমতী শান্তি দেবী—

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর কটকে জন্মগ্রহণ করেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের গৃহস্থ-প্রচারক রাজমোহন বসু মহাশয় দীর্ঘকাল ওড়িষ্যাকে তাঁহার কর্মস্থল করিয়া কটকে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র বসুর সহিত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। প্রফুল্লচন্দ্র বসু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে কটকে পরলোকগমন করেন।

পঞ্চম সন্তান—প্রশান্ত রাও—

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ কটকে ভূমিষ্ঠ হন। কনীয়ান সহোদর জগন্নাথ রাও-এর পুত্রসন্তান না থাকাতে ভ্রাতৃবৎসল মধুসূদন, পিতা ভাগীরথী রাও-এর ইচ্ছানুযায়ী, সূতিকাগৃহেই পত্নীদ্বারা এই সন্তানটিকে ভ্রাতৃজায়া রমাবাঈয়ের হস্তে সমর্পণ করইয়া দেন। ইনি কটকে র‍্যাভেন্‌শ' কলেজ হইতে বি. এ. পাস করার পর কলিকাতায় গিয়া কিছুকাল আইন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ স্টেটে কর্মে প্রবিষ্ট হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা, যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌত্রী এবং হিমাংশু চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী ইন্দুবিভা দেবীর সহিত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইঁহার বিবাহ হয়। ময়ূরভঞ্জ স্টেটের উদালা নামক মহকুমার এস্. ডি. ও. পদে কার্য করার সময় চারটি শিশুসন্তান ও অল্পবয়স্কা পত্নীকে রাখিয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগাস্ট তিনি কলিকাতায় ২৬নং বীডন স্ট্রীটে অকালে পরলোকগমন করেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তান

প্রশান্তের পরে দুই-দুই বৎসর ব্যবধানে দুইটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে ও দুইটিরই সূতিকাগৃহে মৃত্যু হয়। এই শোক মধুসূদন ও তাঁহার পত্নীকে অত্যন্ত কাতর করিয়াছিল।

অষ্টম সন্তান—শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী—

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল, চৈত্রপূর্ণিমা তিথিতে কটকে ভূমিষ্ঠ হন। এই কন্যাটি সুস্থদেহে থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন। শোক-কাতর মধুসূদন এজন্য ইঁহার নাম 'সান্ত্বনা' রাখেন।

মধুসূদনের মৃত্যুর পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে জগন্নাথ রাও কন্যাকর্তার কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।

নবম সন্তান—শ্রীসুকান্ত রাও—

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে কটকে জন্মগ্রহণ করেন। কটক র‍্যাভেন্‌শ' কলেজ হইতে আই. এস্‌সি. এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস্‌সি. ও এম. এস্‌সি. পাস করিয়া ইনি ওড়িষ্যার সরকারী শিক্ষাবিভাগে কর্মজীবন যাপন করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দৌহিত্রী, করুণা দেবীর সহিত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে করুণা দেবী কলিকাতায় ২৬নং বীডন স্ট্রীটে পরলোকগমন করেন।

দশম সন্তান—শ্রী শ্রীকণ্ঠ মধুসূদন রাও—

শ্রীকণ্ঠ মধুসূদন রাও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে কটকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই।

মধুসূদনের সহোদর ভ্রাতা জগন্নাথ রাও-এর দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছিল। ইঁহারাও মধুসূদনের ক্রোড়ে কন্যা-নির্বিশেষে পালিতা হইয়াছিলেন :

প্রথমা কন্যা—রেবা; ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে কটকে ইঁহার জন্ম হয়। পনেরো বৎসর বয়সে উৎসাহী ব্রাহ্মযুবক সাধুচরণ রায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিদ্যোৎসাহী মধুসূদনের প্রবর্তনায়, স্বামী সাধুচরণের সহযোগিতায় এবং রেবা রায়ের সম্পাদনায় 'আশা' নামে একটি ওড়িয়া মাসিকপত্রিকা ওড়িষ্যায় নারীশিক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে র‍্যাভেন্‌শ' বালিকা-বিদ্যালয়ের (তখন উহাই কটকে একমাত্র মধ্য-ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়) অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ায় এবং তাহার আশু উন্নতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রেবা রায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ওড়িষ্যায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই ওড়িষ্যায় বালিকাদিগের জন্য প্রথম উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় হইতে চন্দ্রমুখী ষড়ঙ্গী ও জ্যোতির্ময়ী ঘোষ নাম্নী দুইটি বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বপ্রথম উত্তীর্ণ হন। দুই পুত্র ও এক

কন্যা রাখিয়া সাধুচরণ ৩৭ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন অকালে পরলোকগমন করেন। রেবা রায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগাস্ট ৮১ বৎসর বয়সে কটকে দেহরক্ষা করেন।

দ্বিতীয়া কন্যা—সরস্বতী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ কটকে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অমৃতানন্দের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তিন কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া অমৃতানন্দ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই গড়জাতের অন্তর্গত বউদে অকালে পরলোকগমন করেন। এই দুঃসহ শোকে অভিভূত হইয়া সরস্বতী দেবীও পতিবিয়োগের একবৎসরের মধ্যেই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই কলিকাতায় নববিধান-প্রচারাশ্রমে লোকান্তরিত হন।

LIBRARY
No.............
BANARAS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভক্তকবি

মধুসূদন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর ষাট বৎসর বয়সে (ষাট বৎসর পূর্তির একমাস পূর্বে) পরলোকগমন করেন। 'ভক্তকবি' এই আখ্যাটি তাহার পূর্বেই তাঁহাকে—উৎকলের সুধী, মনীষী, সাহিত্যিক, লেখক ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনরূপে—প্রদত্ত হইয়াছিল। 'ভক্তকবি' বলিতে উড়িষ্যায় মধুসূদন রাওকেই চিহ্নিত করে।

পূর্বেই বলিয়াছি মধুসূদনের জীবনের মূল ভিত্তি ভগবদ্ভক্তি। মনে পড়ে তাঁর কবিতা—

> "হে আদি জননী কাব্যময়ী সরস্বতি,
> জগতের কবিকুল তোহরি সন্ততি।
> অগাধ অতলস্পর্শ জঠরু তোহরি,
> জনম্ লভই কবি নররূপ ধরি।" (রাধানাথ বিয়োগে)

তিনি যে তাঁর পরমারাধ্যা জগৎজননীকে কবিকুলের জননী বলিয়া অনুভব করিয়া উপরিউক্ত কবিতা লিখিয়াছেন সেই ভাবের প্রতিধ্বনি অন্য একটি কবিতায় পাওয়া যায়:—

> জয় জয় জয় ব্রহ্মাণ্ড জননী
> অনন্ত মানস-কমল-বাসিনী
> চিদানন্দময়ী অরূপ ধারিণী
> নিত্য নব নব দৃষ্টি প্রকাশিনী
> দিব্য জ্ঞানময়ী অমৃত ভাষিণী
> অচেতন জন জাগ্রত কারিণী
> আস মা ভারতে ভারতী সতী।

('ভারতী বন্দনা'—কবিতাবলীর প্রথম ভাগ)

সেই চিদানন্দময়ী অরূপ-ধারিণী জগজ্জননীর ভারতী-রূপের মধ্যেই তাঁহার কবি-রূপের প্রকাশ, তিনি নিত্য অন্তরে অনুভব করিতেন। এই অনুভূতির ভিতর দিয়াই তাঁহার কবিতা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার যত কিছু রচনা,—কি শিশুদের জন্য, কি কিশোর-কিশোরীদিগের জন্য, কি বয়স্ক

পাঠক-পাঠিকাদিগের জন্য, কি উৎসবে কি বিপদে কি শোকগাথার মধ্যে,—সর্বত্রই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার অন্তর জুড়িয়া আছেন, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমদেবতা। সকলের মধ্যেই তিনি তাঁহার কল্যাণ হস্তের স্পর্শ পাইতেছেন। এইটিই হইল তাঁহার সমগ্র জীবনের অনুভূতির মর্মকথা।

কবির দৃষ্টি দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তপ্রাণ এই সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বপিতার হস্তের কার্য দেখিয়া সেই মহিমময়ের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ' কবিতাটির কথা মনে হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বেকার উপনিষদের যুগের ঋষির যেচিত্র তিনি এই কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভক্তকবির সাধনালব্ধ অনুভূতিরই মর্মবাণী।

ক্ষিতি অপ্ মরুৎ ব্যোম তেজ একাকার,
নিরেখিলা ঋষিবর চিন্ময় সংসার।
মৃত জড় আজি আহা কি অমৃতময়
ব্রহ্ম নিঃশ্বসিতে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-হৃদয়!
ব্রহ্মাণ্ড-হৃদয়-তন্ত্রী বাজে একতানে,
ওঁকার-ঝংকারময় মর্মভেদী-গানে।

প্রকৃতিরাজ্যে ও অন্তর রাজ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের প্রকাশে মুগ্ধ বিহ্বল যুবক ঋষির কণ্ঠ হইতে এই প্রার্থনাবাণী উৎসারিত হইয়াছে :—

এক অদ্বিতীয় প্রভু সর্ব-মূলাধার
একমাত্র পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরাকার।
জয় হে মঙ্গলময়, মহা মহেশ্বর,
জয় জয় সত্য রূপ পরম সুন্দর।
বিরাজ বিরাজ দেব, হে অমৃতময়,
তোমারি অমৃতে পূর্ণ করি এ হৃদয়।
তোমারি ওঁকারময়ী বাণী নিরন্তর,
পবিত্র ঝংকারে পূর্ণ করুক অন্তর।

এই 'ঋষি প্রাণে দেবাবতরণ' কবিতা ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা নব্যভারতে 'ঋষি চিত্র' নামে প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় ইহার সমালোচনা করিয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। (বিশদ বিবরণ ১২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাঁহার কবিচিত্ত যে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র পরমদেবতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহারই চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া মানব সন্তানকে তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইবার জন্য ডাক দিয়াছে, তাহা তাঁহার 'শোভা' 'ধ্বনি' 'পদ্ম' ও 'এ সৃষ্টি অমৃতময় হে' কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত।

চিত্তের পবিত্রতা, শুদ্ধতা, যাহা ভগবদ্ভক্তের জীবনে নিত্য কাম্য, সেই পবিত্রতা ও শুদ্ধতা ভক্তকবির রচনায় নানাভাবে প্রকাশিত। তাঁহার 'পরলোক বাসিনীর প্রতি' কবিতাতে পাই :—

কি অমৃত তত্ত্বদীক্ষা অশান্ত যৌবনে,
দিলে পুণ্যময়ি, স্বর্গ হতে অবতরি
সে দীক্ষাপ্রভাব মোর সমগ্র জীবনে,
মরমে মরমে, দেবি, যাক গো সঞ্চরি ;
পুড়ে যাক জগতের বাসনা বিকার,
জাগুক জগতে শুদ্ধ প্রেম অনিবার।

পাপের প্রতি ঘৃণা ও পাপীর প্রতি করুণা—ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তজীবনে এটি বিধাতৃ-দত্ত মহতী প্রেরণা-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুসূদনের 'পতিতা রমণী' কবিতাটি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :—

যে চাহে চাহুক তোরে গর্ব অবজ্ঞায়,
তোর দুঃখে লো ভগিনি, এ প্রাণ কাতর,
আহত এ প্রাণ তোর মরম ব্যথায়,
কান্দয় আকুলে মোর ব্যথিত অন্তর।
কাতরে স্মরিয়ে তোরে চাহিনু আকুলে
পতিত-পাবনী বিশ্ব জননী-চরণে।
আশার অমৃত জ্যোতি সে পদ কমলে
দেখিনু, অভয় বাণী শুনিনু শ্রবণে,
কহিলা মা জগদম্বা পতিত-পাবনী—
'পতিতা হলেও নারী আমারি তনয়া,
উদ্ধারিব ক্ষণে তারে দিয়া মুক্তি-মণি,
মোর কন্যা মোর হ'বে লভি মোর দয়া ;
সতীত্ব, দেবীত্ব তার ললাটে লিখিত—
কে তারে তা'হতে বিশ্বে করিবে বঞ্চিত!'

পাপীর প্রতি কেবল করুণা নয়, পতিত-পাবনী বিশ্বজননীর মহা প্রেম-স্রোত পাপীর উদ্ধারের জন্য নিয়ত প্রবাহিত, বিশ্বাসনয়নে ইহা দর্শন করিয়া ভক্তপ্রাণ আশার অমৃত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত : এই কবিতা তাহারই নিদর্শন।

'উৎকল গাথা' পুস্তকের কবিতাগুলিতে আছে উৎকল জননীর বন্দনা ও উৎকল সন্তানকে দেশের সুসন্তান হইবার জন্য আহ্বান। কিন্তু প্রাদেশিকতা ও সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া কবি গাহিয়াছেন :—

'ওড়িয়া ওড়িয়া' ক্ষুদ্র হুরি ছাড়ি ক্ষণে
পশস্ত মা তো সন্তানে বিশ্ব সভাঙ্গনে ;
নিখিল মানব-হৃদে মিশাই হৃদয়
গাআন্তু বিশ্বাসভরে—জয় সত্য জয়।

ভক্তকবির অন্তর হইতে প্রার্থনা উঠিয়াছে—

হে ভূমা, ভুবনেশ্বর, উদ্ধার উৎকলে।
জণাঅ মানব-সন্তানে—
উচ্চকুল তাহার,
সে যে ব্রহ্মসুত—এ বার্তা
কর ভবে বিস্তার ;
ব্রহ্ম-সুত ব্রহ্ম-তনয়া
নরনারী নিকর,
কর এ সংবাদ ঘোষণা,
সত্য শিব সুন্দর।
স্বরগর প্রেম-আলোক
দশদিকে প্রকাণ্ড,
বিধাতার পুণ্য-আনন্দ-
স্রোতে জগত ভাসু।

ব্রহ্ম-ভক্ত কবি আশাবাদী ; নিরাশার অন্ধকার তাঁর বিশ্বাসনেত্রের আলোকে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। 'আশা' কবিতাতে তাই দেখি—

"দেখরে নয়ন ফেড়ি   মো নয়নপ্রভা
আশা প্রভা-ময়ী
বিনাশি তিমির রাশি,   বিশ্বাস-সুলভা
বিশ্ব উজলই।"

'হিমাচলে উদয়-উৎসব' কবিতাটি—

কাঞ্চনজংঘায় সূর্যোদয় দেখিয়া লিখিত। নিশান্তে উষার উদয় দর্শনে, উৎসবানন্দে বিভোর ভক্তকবির অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে সেই মহামিলন দেবতার এই অপরূপ সৃষ্টির মধ্যে—

এবে দ্যাবাপৃথিবীর পরিণয়োৎসব
চির পুরাতন, পুণি নিত্য নবনব।

দ্যাবাপৃথিবীর এই মিলনোৎসবের মধ্যে ভক্তকবির অন্তর তাঁহার প্রিয়তম পরমাত্মার সঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়াছে :

দ্বৈত-অদ্বৈতর অনুভব মহোৎসবে
পবিত্রিত জীবনর অপূর্ব গৌরবে,
উদার গম্ভীর স্তব্ধ মুগ্ধ প্রেমাবেশে
অনাইলা পরাৎপর পতি পরমেশে।

* * *

প্রকৃতি সঙ্গতে মিলি যহুঁ এহি প্রাণ
অনুভবি কি অদ্ভুত অমৃত আহ্বান
অনাইলা প্রেমনেত্রে, সে প্রেমনিধান
সে অন্তরতম সখা নিখিল-নিদান
অনন্ত প্রেমরে মুগ্ধ স্নিগ্ধ আকর্ষণে
অলক্ষিতে পাশে প্রাণ টানি নেলে ক্ষণে।
রোমাঞ্চে পূরিলা তনু, পুলকে পরাণ।
মর্মরি উঠিলা মর্ম-ভেদী স্তবগান
উৎস প্রায়ে উৎসারিত বিদারি পাষাণ,
নৃত্যগীতে কল্লোলিত নিত্য বহমান।
বোইলি, হে প্রাণস্বামি, আহে অনুপম,
ধন্য হেলা আজি এ অধম প্রাণ মম।

* * *

হে অনাদি, হে অনন্ত রস-প্রস্রবণ,
মোর আদি-অন্ত রসে রসে নিমগন।
আজি মোর নেত্রোৎসব, শ্রীনেত্রে তুম্ভর
নিমগন মুগ্ধ দৃষ্টি এ মো নয়নর!

দেখই এ প্রভাতর দ্যুলোকে ভুলোকে
পূর্ণ এ নিখিল তব আলোকে আলোকে।

* * *

এ নিখিল বিশ্ব আজি নিজস্ব মোহর
এ বিচিত্র, এ সুকান্ত ধরণী অম্বর।
আজি মো শ্রবণোৎসব এ প্রাণকন্দরে
কি অমৃত রাগিণীরে কি মহাছন্দরে,
এ প্রাণ-বীণারে তব শ্রীকর-পরশে
গায়ত্রী ওঁকারময়ী ধ্বনিত রভসে!
বংশীধ্বনি শুণুছি মুঁ প্রাণর শ্রীহরি—
'মোহরি মোহরি তুহি মোহরি মোহরি।'

এই ভাবের প্রতিধ্বনি অন্য একটি ব্রহ্মসঙ্গীতে পাই :—

প্রার্থনা, প্রভু চরণে তব প্রার্থনা—
লাগিথাউ প্রাণে তুম্ভ উৎসব ;
বসাই অভয় চরণ পোতে
ভসাঅ হে তুম্ভ আনন্দস্রোতে।
বিশ্বজয়ী তুম্ভ জয় নিশাণ
দরশনে মুগ্ধ হেউ মো প্রাণ।
অনন্ত গৌরব মহিমা তব
ঘোষু প্রাণ নিত্য, দীনবান্ধব।
অমৃত উৎসব বিধানকারী
ঢাল হৃদে পুণ্য অমৃতবারি।

(মধুসূদন গ্রন্থাবলীর সঙ্গীতমালা ৩৬৫ পৃঃ)

ভক্তকবির সমগ্র রচনার মধ্যে ভক্ত অন্তরের সুগভীর ভক্তিরস প্রবাহিত। তাঁহার রচিত 'পরম প্রমাণ' কবিতায় আছে—

শাস্ত্র যুক্তি প্রমাণের অতীত, অগাধ
সে অন্তরতম, ডুবে যাও সে অতলে।
দূরে ফেলি অভিমান প্রমাণ-প্রমাদ
পড় আসি সে অনন্ত পাদপদ্মতলে।

হে চতুর সুধী, ছাড়ি বিচার-চাতুরী
ভুঞ্জ মহানন্দে মহা বিশ্বাস মাধুরী।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির বিশ্বব্যাপী মহাপ্রেমলীলার মধ্যে নিমগ্ন ভক্ত প্রাণটি সমস্ত অভিমান, প্রমাণ-প্রমাদকে দূরে ফেলিয়া, অনন্তদেবের পদতলে পড়িয়া সেই বিশ্বাস-মাধুরী সম্ভোগ করিবার জন্য মানব-সন্তানকে ডাক দিয়া আসিতেছে।

জ্ঞান, প্রেম, কর্ম ও তপস্যালব্ধ, বিভু-প্রেম-রসে নিমগ্ন এই কবিকে ওড়িয়্যাবাসী সর্বসাধারণের "ভক্ত কবি" আখ্যা দান সার্থক হইয়াছে।

(খ) রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগ

১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'নব্যভারত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মধুসূদনের "ঋষিচিত্র" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তদনন্তর রবীন্দ্রনাথ ঐ সালের পৌষ সংখ্যার, **সাধনা** পত্রিকার সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে এই কবিতাটির যে সমালোচনা করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

" 'ঋষিচিত্র' একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব-প্রয়াস আর কোন অ-বাঙ্গালী দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশির-স্নাত পবিত্র ঊষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন, তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত রসাস্বাদন পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে।"

এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় ছিল না সম্ভবত। ইহার প্রকাশের পর উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইয়া থাকিবে।

অনেকেই বোধহয় জানেন যে উড়িষ্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতে ঠাকুরবাবুদের জমিদারী ছিল। অনুমান ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে লইয়া জমিদারী পরিদর্শন কার্যে উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। কটকে তখন শ্রীযুক্ত বি.এল. গুপ্ত, আই.সি.এস. ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতিথি হইয়া কয়েক দিন সেখানে ছিলেন। বি. এল. গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী সৌদামিনী গুপ্তা বিদুষী ও মনস্বিনী মহিলা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শুনিবার জন্য ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তা স্থানীয় কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁহার বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেন। আমার বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ-আলাপ এই বারেই হয়। সেই বারেই কটকের ওড়িয়াবাজারস্থিত ব্রহ্মমন্দিরে এক রবিবাসরীয় উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত গাহিবার ভার লইয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত মধুসূদনের যোগ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। মধুসূদন কলিকাতায় আসিলে সুবিধা পাইলেই রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হইত। উভয়ে পরস্পরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বাবা শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার মুখে রবীন্দ্রনাথের অতিথি সৎকারের যে বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বাবা তাঁহার ডায়েরীতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"Had a talk with our host about Bengali grammar, and some literary and religious matters. Listened to some hymns of Rabi Babu's sung by Dinendra Babu. Rabi Babu is no mere poet and writer only. He has become a true saint (Rishi). His humility and faith, his single-hearted devotion to the work of ব্রহ্মচর্যাশ্রম, his simple beautiful life impressed me as few lives have done. 9. 3. 1911."

ভাবার্থ :—রবিবাবুর সহিত বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্য, ও ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা হইল। দীনেন্দ্রবাবু কর্তৃক গীত, রবিবাবুর রচিত কয়েকটি ধর্মসঙ্গীত শুনিলাম। বুঝিলাম, রবিবাবু শুধু সাধারণ কবি বা লেখক নহেন ; তিনি সত্যকারের ঋষি। তাঁহার বিনয়, বিশ্বাস, ও ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের কার্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং সাধারণ সাদাসিধা সুন্দর জীবন আমাকে যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল এরূপ খুব কম জীবনই করিয়াছে।

(গ) উৎকলের বাহিরে ভক্তকবির সন্মান

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার বিবাহ হয়। তদবধি আমি এই

দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিতেছি। আমি আসিয়া অবধি দেখিয়াছি, সেকালে মাঘোৎসবের সময় মহিলাদিগের উৎসবের দিন সিটি কলেজে পুরুষদিগের জন্য স্বতন্ত্র উপাসনার ব্যবস্থা হইত। মধুসূদন যেবৎসর কলিকাতায় মাঘোৎসবের সময় উপস্থিত থাকিতেন, সেই সময় প্রায়শ এই-দিনের উপাসনায় আচার্যের কাজ করিবার জন্য তিনি আহূত হইতেন। তাঁহার এই উপাসনায় যোগ দিয়া সকলে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশিষ্ট সভায় সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল।

বাগ্মী, মনীষী, বঙ্গের সুসন্তান—আনন্দমোহন বসু আমার পিতাকে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ—He is one of the pillars of the Brahmo Samaj—বলিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে অন্ধ্র একেশ্বরবাদী সম্মেলনে (Andhra Theistic Conference) সভাপতি হইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মধুসূদন অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাইতে পারেন নাই। তৎকালে ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অধিবেশন যেসকল স্থানে হইত, ব্রাহ্মসম্প্রদায় কর্তৃক একেশ্বরবাদী সম্মেলনের অধিবেশনও সেই সকল স্থানে বসিত। বারাণসীতে যখন কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সর্ব ভারতীয়-ধর্ম-মহাসম্মেলন বসিবার প্রস্তাব হয়, তখন মধুসূদনের নিকট সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ পত্র আসিয়াছিল। তিনিও অভিভাষণের কিছু অংশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্মেলনে যাইতে সমর্থ হন নাই।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকিপুরে যখন এই সম্মিলনীর অধিবেশন হয় তখনও সভাপতি হইবার জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান আসিয়াছিল। কিন্তু অধিবেশন আরম্ভের পূর্বেই তিনি সংকটজনক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ২৮শে ডিসেম্বর কটকে লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে, এই সম্মিলনীর সফলতার জন্য তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি তারবার্তা দ্বারা জানাইতে একজন বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে মধুসূদন তিনবার এই মহাসভার পুরোধা পদে আমন্ত্রিত হইয়াও যোগ দিতে পারিলেন না; বিভিন্ন প্রদেশবাসীর কর্ণে উড়িষ্যার ভক্তকবির অন্তরবাণী ধ্বনিত হইবার সুযোগ লাভ করিল না। উৎকলের ধর্ম-মর্যাদা ও গৌরব-কাহিনী ভক্ত-দৃষ্টির স্বচ্ছ অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহাদের প্রাণে আকুলতা জাগাইতে পারিল না, এ দুঃখ ভুলিবার নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্তিম রোগশয্যায় মধুসূদন

পার্থিব গণনায় মধুস্দনের জীবন মাত্র ষাট বৎসর ব্যাপী ছিল। বাল্যাবধি তাঁহার দেহের স্বাস্থ্য খুব সবল ছিল না। অনুমান তাঁহার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স হইতেই তিনি অম্লশূলরোগে আক্রান্ত হন; কিন্তু এই পীড়ার মধ্যেই তিনি সকল কার্য করিতেন; কোন বাধাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। দেহত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সময়-সময় ভীষণ রোগযন্ত্রনা তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিত ও জীবন-সংশয় ঘটিত। কিন্তু তিনি কার্য হইতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও টাউন স্কুলটিকে সকল রকমে উন্নত করিবার জন্য ও তাহাকে নিজ আবাসে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি দিয়া খাটিতেছিলেন। ইহার ফলে, তাঁহার স্বাস্থ্য আরও ভগ্ন হইয়া পড়ে, এবং শূলবেদনার দারুণ যন্ত্রণা বারবার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে থাকে। শীতকালেই ইহার প্রকোপ অধিক হইতে থাকে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রে হঠাৎ উদরে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এত শীঘ্র যে তিনি চলিয়া যাইবেন তাহা কেহই মনে করিতে পারে নাই। কিন্তু সেই রাত্রে সকলের আশঙ্কা হয় যে, এই আক্রমণ হইতে তাঁহার রক্ষা পাওয়া কঠিন।

যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বমি হয়। আমার দাদা শ্রীজয়ন্তরাও আসিয়া বাবার চিকিৎসা ও সেবায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সিভিল সার্জন ও কটকের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ আসেন। অবস্থা সঙ্কটজনক মনে হওয়ায় দূরস্থিত পুত্রকন্যা জামাতা ও আত্মীয়গণকে তারে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারাও অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হন। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়া ১৮ই প্রাতে বাবার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে দাদা বলিলেন, "বাবা, কিঞ্চা এসেছে।" (আমার ডাক নাম কৃষ্ণা, কিন্তু কিঞ্চা নামেই ডাকা হইত)।

বাবা চক্ষু খুলিয়া 'মা এসেছিস' বলিয়া আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া আমার ললাট চুম্বন করিলেন। দেখিলাম দাদার ব্যাকুল দৃষ্টি আমাকে

সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। বুঝিলাম বাবার রোগবৃদ্ধির আশঙ্কায় দাদার এই ব্যাকুলতা। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলাম।

মধুসূদনের বৈবাহিক—ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের শ্বশুরমহাশয়—প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও পত্রকার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই পীড়ার সংবাদ পাইয়া মধুসূদনকে দেখিবার জন্য কলিকাতা হইতে কটকে আসিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী প্রবীণ ব্রাহ্মসাধু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় তখন কটকে আসিয়া তাঁহার কন্যা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভক্তিলতা চন্দের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণও তখন সপরিবারে কটকে বাস করিতেন :—অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, লালমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজমোহন বসু, হরিমোহন ঘোষাল, কুঞ্জবিহারী গুহ, ডাক্তার রামকৃষ্ণ সাহু, ফকীরমোহন সেনাপতি, বিশ্বনাথ কর, রামকৃষ্ণ রাও, অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার রায় প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই প্রায় প্রতিদিন মধুসূদনের পীড়ার সংবাদ লইতে আসিতেন।

১৯ তারিখ হইতে যে-কেহ তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইঁহার পরলোকগমনের সময় নিকটবর্তী। একদিন ঔষধ খাওয়াইবার সময় একজন বন্ধুকে বলিলেন, "দেখুন, আর কি ধরে রাখা ভাল দেখায়?" ১৯ তারিখে তৃতীয় জামাতা প্রফুল্লচন্দ্রের করতলে "২৮শে ডিসেম্বর" এই কথাটি লিখিয়াছিলেন। সেখানে দ্বিতীয় পুত্র প্রশান্ত উপস্থিত ছিলেন; তাহাকে বলিলেন,—"আর ন'দিন"। আর একদিন উদরে ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত বলিলেন, 'একটু পরে এনিমা দেব, তাহলে কিছু ভাল বোধ হবে'। মধুসূদন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এনিমা জানিনা, জানি সেই চিনিমা (চিন্ময়ী মা)"। মধুসূদনের তৎকালীন মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি সেই চিন্ময়ী মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতেছেন।

২২শে ডিসেম্বর ডাক্তার সাহেব তাঁহার রোগযন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত কম ও নাড়ীর অবস্থা কিছু ভাল দেখিয়া বলেন,—"I see you have much improved." উত্তরে মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, The frog says, "Frogling, the world is changing every moment"; তৎপরে ডাক্তার সাহেবকে বলিলেন, "এটি একটি ওড়িয়া প্রবচনের অনুবাদ"।

২৭ তারিখ প্রাতঃকালে নাড়ীর অবস্থা মন্দ দেখিয়া পরিবারস্থ সকলে

শোকাকুল হওয়াতে বলিলেন, "আমার যেতে দেরি আছে। তোমরা কেন এখন ব্যাকুল হচ্ছ? যাও, আহারাদি কর।"

ইতঃপূর্বে ডাক্তার নীরদবাবু নাড়ী দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে ইন্‌জেক্‌শন দেবার মত নাড়ীর অবস্থা নাই। কিন্তু নাড়ীর এই অবস্থাতেও তিনি দেড়দিন কাটাইয়াছিলেন।

আমাদের কাকা জগন্নাথ রাও কটকেই বাবার কাছে কাছে ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে দুইদিন পূর্বে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর উষাকালে, কাকা কাকী জ্যেষ্ঠ জামাতা—বিজয়বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

তখনও সমস্তদিক ম্লান জ্যোৎস্নায় আচ্ছন্ন, সূর্যালোক তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত; এই উষাকালে ইঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই শ্বাস আরম্ভ হইল। পূর্বদিনে প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাঁহার কথাবার্তা সুস্পষ্ট ছিল, পরে ক্রমে বাক্য জড়িত হইলেও জ্ঞান ছিল। ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল নয় ঘটিকার পরে নীরবে শান্তভাবে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

তিনি যে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তেরদিন শয্যাশায়ী ছিলেন, এ সংবাদ কটক নগরে প্রথমাবধি প্রচারিত হইয়াছিল। বহু ব্যক্তি মধুসূদনের সংবাদ লইতে নিয়ত আসিতেন। কেহ কেহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিতেন। উড়িষ্যার সর্বজনমান্য নেতা কুলবৃদ্ধ মধুসূদন দাস তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনা কেহ করিলে সে সময় তিনি শান্তভাবে যোগ দিতেন। মনে হইত, যেন সে-সময় তিনি রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা তাঁহার নিকট গেলে তিনি আমাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিতেন। আমরা সজল নয়নে সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করিতাম।

প্রাতঃকালে সূর্যালোক দেখিবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। দরজা জানালা খুলিয়া দিলে ঘরে সূর্যালোক প্রবেশ করিলে তাঁর মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিত। একদিন ঐ সময় পুত্র সুকান্তকে বলিলেন, "More light, more air, may German Father—Goethe come."

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও ঐ সময়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কটকে আসিয়া তুলসীপুরে একটি বাড়ীতে কয়েক মাস ছিলেন। এই রোগশয্যায়

তাঁহার প্রতি মধুসূদনের শেষ কথা হইল, "সকল সাধু ভক্ত আপনার অন্তরে বাস করুন।" তার পরেই বলিলেন—"অবন্তী আপনার চরণতলে রহিল।"

মধুসূদনের 'নীরব ভাবিণী' সহধর্ম্মিণী, আমাদের জননী দেবী, মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে শান্তভাবে বসিয়া অবিরল অশ্রুপাত করিতেছিলেন। এই নিদারুণ শোকে তিনি বিহ্বল হন নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন একখানি মূর্তিমতী শোকপ্রতিমা।

(খ) মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ-বিবরণ

মধুসূদনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বহু পরিবার হইতে তাঁহাদের উদ্যানজাত পুষ্পরাশি আসিতে লাগিল। কালীগলিস্থ আমাদের বাড়ীতেও মধুসূদনের রোপিত বৃক্ষ-জাত পুষ্প অনেক ছিল। মধুসূদন পদ্ম বড় ভালবাসিতেন—কবি রাধানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশীভূষণ রায় তাহা জানিতেন। তিনি তখনই লোক পাঠাইয়া দূরস্থিত কোন সরোবর হইতে পদ্মরাজি আনাইয়া দিলেন। মধুসূদনের নশ্বর দেহ এই সকল পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত হইলে দেহ বাহির করিবার পূর্বে গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হয়। "যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি"—এই সংগীতটি গীত হইলে পর আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন :—

যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ
যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

উপাসনান্তে শাস্ত্রী মহাশয়ের গম্ভীর কণ্ঠে উদাত্ত স্বরে—"আমরা এখন এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া চলিলাম" এই বাণী উচ্চারিত হইলে, শোকযাত্রা মধুসূদনের মরদেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল।

মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়িলে ব্রাহ্মসমাজ এবং সর্ব-সাধারণ এই শোকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম, ওড়িয়া বাঙ্গালী—শত শত দেশবাসী অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত শবানুগমন করিয়া সতীচৌরা নামক শ্মশান ঘাটে আসিলেন। বহু উচ্চ বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণপণ্ডিতও শবদেহ বহন করিয়া ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে

করিতে লাগিলেন। ছাত্রসমাজ, শিক্ষকমণ্ডলী, দীন-দরিদ্র, অন্ধ-খঞ্জ, কুষ্ঠ রোগী—সকলে নিজকে অসহায় বোধ করিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। কটকে ইতঃপূর্বে এরূপ দৃশ্য আর দেখা যায় নাই।

কাঠজুড়ি নদীর তীরে সতীচৌরা নামক শ্মশানে তাঁহার নশ্বর দেহের অগ্নিসৎকার করা হয়। পরে সেই স্থানে কবি রাধানাথের সমাধির সন্নিকটে মধুসূদনের সমাধি নির্মিত হয়।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বিশেষ উপাসনা চলিতে থাকে। বালেশ্বরবাসী বহু ব্রাহ্ম কটকে আসিয়া এই গৃহে অতিথি হন। পুরী হইতে বহু আত্মীয়-আত্মীয়া মধুসূদনের কঠিন পীড়ার সংবাদে পূর্বেই আসিয়াছিলেন; মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অবশিষ্ট অনেকে আসেন। প্রতিদিন ইঁহারা সকলে এই শোকার্ত পরিবারের সহিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। আমাদের কাকী (জগন্নাথ রাও-এর স্ত্রী) ও আমার ভগিনী শান্তি সকলের আহার্যের ব্যবস্থা করিতেন। ছোট কাকা রঘুনাথ রাও সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন। সঙ্গীত, সংকীর্তন ও উপাসনার ভিতর দিয়া কটক ও বালেশ্বরবাসী ব্রাহ্মগণ মধুসূদনের আত্মীয় ও পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এই গৃহকে যেন পুণ্যতীর্থ করিয়া তোলেন। কলিকাতা হইতে ভবসিন্ধু দত্ত সদলে আসিয়া শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে সংকীর্তনের ভার গ্রহণ করেন।

৫ই জানুয়ারী, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার প্রাতে কালীগলিস্থ আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে এই শ্রাদ্ধসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্বেত চন্দ্রাতপ তলে সুবিস্তৃত ফরাসে সকলে আসন পরিগ্রহ করেন। "নয়ন অতীত সেহি পরলোক মহালয়ে, আস যিবা সশরীরে তেজি সকল সংশয়ে"—মধুসূদনের রচিত এই ব্রহ্ম-সংগীত প্রথমে গীত হইলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করেন। তিনি উদ্বোধনে মধুসূদনকে লাইট হাউস অর্থাৎ বাতিঘরের সহিত তুলনা করেন। বিপৎসঙ্কুল সমুদ্রপথে জাহাজ-স্টীমারের পথ নির্দেশের জন্য যেমন বাতিঘর দেখা যায়, তদ্রূপ এই পাপ প্রলোভন ও সংগ্রামসঙ্কুল জীবন-সমুদ্রে সাধারণ মানুষের জীবন-তরীকে প্রকৃত পথে চলিতে সাহায্য করিবার জন্য মধুসূদনের ন্যায় মহাপুরুষদিগের জীবন এই বাতিঘরের কাজ করে।

বিশ্বনাথ কর মহাশয় তৎপরে ওড়িয়া ভাষায় আরাধনা সমাপন করিলে

জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার-লিখিত "শ্রাদ্ধবাসরে" লেখাটি জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজয়ন্ত রাও কর্তৃক পঠিত হয়। তৎপরে ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবা রায়-লিখিত "পরলোকগত পুণ্যাত্মা জ্যেষ্ঠতাত" শীর্ষক রচনাটি দ্বিতীয় পুত্র, প্রশান্ত রাও পাঠ করেন। তৃতীয় পুত্র সুকান্ত 'পিতৃস্মৃতি' পাঠ করেন। ইহার মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসংগীত গীত হইতে থাকে। এই রচনাগুলি এবং মধুসূদনের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎকল সাহিত্যের মধুসূদন সংখ্যায় (উৎকল সাহিত্য, ১৬শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ—১৩২০ সাল, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কটকবাসী বহু নরনারী এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দান করেন। ইঁহাদিগের জন্য জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। আমাদের কাকা রঘুনাথ রাও এই অনুষ্ঠানে সমাগত সকলের অভ্যর্থনার ভার লইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। দুই একদিন পরে কটক মিউনিসিপ্যালিটির সুপ্রশস্ত বহিরঙ্গণে কাঙ্গালী বিদায়ের আয়োজন হয়। মধুসূদনের অনুজ রঘুনাথ রাও ইহার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া, 'মুকুর'[১]-সম্পাদক ব্রজসুন্দর দাস ও কবিবর রাধানাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশীভূষণ রায় এতদুভয়ের সহায়তায় সহস্রাধিক কাঙ্গালীবর্গকে সযত্নে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করেন।

'শ্রাদ্ধ-বাসরে'

(জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার-রচিত এই শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজয়ন্ত রাও কর্তৃক শ্রাদ্ধ-বাসরে নিবেদিত হইয়াছিল)

ব্রহ্মকৃপা সকল মানবের ললাটে বিধিলিপি রূপে অঙ্কিত থাকে; কিন্তু আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে যাঁহার জীবনের দুই চারিটি কথা উক্ত হইতেছে, তাঁহার সকল কার্যে ব্রহ্মকৃপা যেরূপ পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছি, এদেশে অন্যত্র সেরূপ লক্ষ্য করি নাই। যিনি এই ক্ষুদ্র গৃহের প্রতিষ্ঠাতা, এই শোকার্ত পরিবারটিকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেন, এই গৃহ ও পরিবারটিকে যিনি ব্রহ্মপ্রীতির ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যাদ্বারা উৎকলে সত্যের নব আলোক প্রতিভাত হইতেছিল, তিনি শৈশব কাল

(১) 'মুকুর' একখানি ওড়িয়া মাসিক পত্রের নাম। ইহাতে মধুসূদনের অনূদিত উত্তররামচরিত নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল।

হইতেই ভগবদ্‌ভক্তি লইয়া বর্ধিত হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের বাল্যজীবনের কথা যাঁহারা বিশেষরূপে জানেন, তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, যখন তিনি অতি অল্প বয়স্ক বালক, তখন হইতেই দেশপ্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে যাহা কিছু প্রাণপ্রদ, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি পুরী নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যকাল সেখানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পুরীতে বানাবর মহাদেবকে দর্শন না করিয়া তিনি বাল্যকালে আহারাদি করিতেন না। তাঁহার সে সময়ের সঙ্গী-সহচরদিগের কথা দূরে থাক, অনেক বয়স্ক লোকও এইরূপ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করিতেন কি না বলা দুষ্কর। যে আস্তিক্য বুদ্ধি ও ভগবদ্‌ভক্তি তাঁহার জীবনের বিশেষ গৌরব ও অলঙ্কার, তাহা যেন শিক্ষা-নিরপেক্ষভাবেই শৈশব হইতেই স্বতঃ তাঁহার প্রাণে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

যে-দুইজন বাল্য সহচর তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ইঁহার বাল্য-জীবন-কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, সত্যের কঠোর ভিত্তির উপর বিধাতা তাঁহার কোমল প্রাণটিকে গড়িয়াছিলেন। ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা কখনও ইঁহাকে মিথ্যাকথা বলিতে শুনেন নাই। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বন্ধুগণকে ভালবাসিতেন। বিনয় এবং কোমলতার জন্য সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন মনে করিতেন। অপরদিকে সত্য পালনের জন্য তাঁহার কঠোরতা এবং প্রতিজ্ঞার তেজ দেখিয়া তাঁহার অতি নিকট বন্ধু ও আত্মীয়রাও অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। বাল্যজীবনের এই সদ্‌গুণগুলি তাঁহার চরিত্রে কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা এ প্রদেশের সকলে জানেন। তাঁহার ধর্মমত-বিরোধী ব্যক্তিরাও ইঁহার হৃদয়ের কোমলতা ও বিনয়ের জন্য ইঁহাকে স্নেহ করিতেন। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এ প্রদেশের সর্ব শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

আমাদের ভক্তি এবং প্রীতি অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যকে অতিরঞ্জিত করিতে পারে; সেজন্য তাঁহার কর্ম ও ধর্ম-জীবনের মহিমার উল্লেখের সময় নিরপেক্ষ সাক্ষীগণের উক্তি স্মরণ করিতেছি: পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ পরিবারের গুরু ও আত্মীয়; কিন্তু ইঁহার স্বর্গীয় সত্যনিষ্ঠ পুণ্যশ্লোক পিতা কখনও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কদাপি অনুকূল দৃষ্টি নিক্ষেপ

করেন নাই। এই স্বর্গীয় সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ, তাঁহার বন্ধু অমরকীর্তি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সত্যনিষ্ঠা, লোক-হিতৈষণা এবং দানশীলতা প্রভৃতি গুণের জন্য তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা জগন্নাথ দর্শনের জন্য উৎকলে আসিয়া যখন পিতৃদেবের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তদবধি তিনি "মধুসূদন উৎকলের বিদ্যাসাগর" বলিয়া প্রশংসা করিতেন। বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সরকারী কর্মোপলক্ষে একবার কটকে গিয়া কিছুদিন পিতৃদেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; দ্বিজেন্দ্রলাল যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পৃক্ত নহেন, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেবের চরিত্র-মাহাত্ম্য দেখিয়া তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সর্বদা মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "মধুসূদন রাও ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় রামতনু লাহিড়ী"। সাধু রামতনু লাহিড়ী যে সব সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন তাহা সর্বজন বিদিত। যে সকল ব্রাহ্মণ সযত্নে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য প্রথা রক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও নমস্কার করিয়া অভিবাদন করেন না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উৎকলের এই শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ পিতৃদেবকে নমস্কার করিয়া অভিবাদন করিতেন। চরিত্রনিষ্ঠা ও ভগবদ্‌ভক্তির জন্য তিনি যে সর্বশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়সে পুরী জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কটকে আসিয়া এফ. এ. পড়ার সময় তিনি ব্রাহ্মধর্মের নবসংবাদ অবগত হন এবং ব্রাহ্মসাধনার নবপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। কোনও নূতন ঘটনা ঘটিলে অনেকে কেবল নূতনত্বের আকর্ষণে তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রতি পিতৃদেবের আকর্ষণ সেরূপ ছিল না। এই সময় তিনি তাঁহার সকল সাধুসংকল্পের সহায় ও উৎসাহ-দাতারূপে একটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার নাম প্যারীমোহন আচার্য। পিতৃদেবের এই বন্ধু যদি অকালে পরলোকগমন না করিতেন, তবে জানিনা, এই দুই বন্ধুর সমবেত সাধনার ফলে উৎকলের মুখশ্রী আজ কিরূপ উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারিত। এই প্যারীমোহন কটকে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ও উড়িষ্যার ইতিহাস প্রভৃতি লিখিয়া অল্প বয়সেই যে কীর্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ দেশে চিরদিন স্মৃত হউক। এই বন্ধুর স্মৃতি পিতৃদেবের রক্তমাংসের সহিত জড়িত ছিল। মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইঁহাকে সস্নেহে স্মরণ করিয়াছেন।

প্রিয়জনদিগের বিয়োগে পরলোক তাঁহার নিকট মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল; স্বপ্নে এবং জাগরণে তিনি যেন পরলোকের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেন।

তিনি পুত্ররূপে, স্বামিরূপে, ভ্রাতৃ-রূপে, পিতামহাদি-রূপে এবং বন্ধুরূপে যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, আজ এখানকার অনেকে তার সাক্ষী। অতিথি-সৎকার ও দানশীলতা ব্রতে তিনি যে আনন্দ লাভ করিতেন, তাহা অকথনীয়। দরিদ্র বালকদের উচ্চশিক্ষার জন্য টাউন ভিক্টোরিআ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জরাগ্রস্ত দেহে যেরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করিতেন, তাহা কোনও সবলদেহ যুবক করিলেও প্রশংসার বিষয় হইত। অনেকের বিশ্বাস যে, তিনি রুগ্নশরীরে এরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিলে হয়তো আরও কিছুকাল এসংসারে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে হৃদয়ের কোমলতার মধ্যে যে বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞার বল দিয়াছিলেন, যে অবিচলিত লোকহিতৈষণা দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই, আলস্য সম্ভোগ করিতে দেয় নাই। তাঁহার জরাগ্রস্ত ও ব্যাধি-প্রবণ দুর্বল দেহযষ্টিটির মধ্যে বিধাতা যে তেজঃপূর্ণ আত্মাটি রাখিয়াছিলেন, আত্মার সেই তেজঃপ্রভাবে দুর্বল দেহযষ্টি যে আরও আগে ভস্মসাৎ হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য। প্রতিনিয়ত প্রার্থনা দ্বারা তিনি ভগবৎকৃপায় যে শান্তি লাভ করিতেন, সেই শান্তির শীতল অভিষেকে এই জর্জর দেহটি ষাটটি বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল বুঝি! শান্তিময়ের সুশীতল ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি, পূর্ণ বলে শরীর মধ্যে বিরাজ করিতেছিল বুঝি! শারীরিক স্বাভাবিক দুর্বলতা, অকালসংক্রান্ত-জরা ও বহুকালব্যাপী দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, বিধাতৃ-বিহিত কর্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের এই দৃষ্টান্ত, সকল সবল ও দুর্বল মানবের নিকট অমূল্য ও অনুকরণীয়। জ্ঞানপিপাসাতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; ধর্মপিপাসাতে অশ্রান্ত সাধনা দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; এবং লোকহিতৈষণা ব্রতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মানবসমাজে স্বীয় প্রীতি বিস্তার করিয়াছিলেন। শিশুর প্রফুল্লতা এবং সরলতা, যুবকের কর্মশীলতা, বৃদ্ধের সুবিবেচনা কোনও অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জীবনের সমস্ত কথা বলা অসম্ভব। তিনি যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন তাহারও বিশেষ বিবৃতি দেওয়া অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর পরে দায়াদগণ উত্তরাধিকারের চিন্তা করিয়া থাকে। আমরা আজ সেই উত্তরাধিকারের কথা ভাবিতেছি। তিনি যে ধনসম্পদ অকাতরে দান করিয়া সুখী হইতেন, সে সম্পদের উত্তরাধিকারের কথা অতি তুচ্ছ; তিনি যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, আমরা উত্তরাধিকারে সেই অতুল্য সম্পত্তি হইতে কে কতখানি পাইতে পারি, সে জন্য যদি পরিজনবর্গ সকলে ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইতে পারি, তবেই এই বংশের দায়াদ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। যে পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও, এই পরিবারের কেন্দ্রশক্তিরূপে, এই গৃহের প্রত্যেকের অন্তঃকরণে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাকে যদি আমরা নিরন্তর আমাদের পরিবারের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি এবং প্রতিদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী লক্ষ্য এবং ইষ্টদেবতা, অনন্ত অমৃতময় মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মের প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহারই মত—সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে—পরমব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়া সম্ভোগ করিতে পারি, তবে এই শোকের আঘাত, বিয়োগের দুঃখ আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

হে আমাদের পিতৃদেব-পূজিত অমৃতময় পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পিতৃদেবের স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত থাক; আমরা যেন তোমাকে পিতৃ-লব্ধ অনন্ত সম্পদ জানিয়া নিরন্তর লাভ এবং সম্ভোগ করিতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধর্মজীবন

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে মধুসূদনের জীবনের মূলভিত্তি ছিল ভগবদ্ভক্তি। পুরী নগরীর যে পল্লীতে (পথুরিয়াসাহী) তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন ছিল তাহার নিকটেই 'বানাবর' মহাদেবের মন্দির আছে। কৈশোরে মধুসূদন প্রত্যহ স্নানান্তে সেই মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিয়া তৎপরে জলগ্রহণ করিতেন। সমুদ্রকূলে ভ্রমণ করিয়া বিশাল সমুদ্র ও আকাশের অনন্ত নীলিমা দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন এবং অনন্ত বিশ্বপতির অসীম মহিমার আভাস সেই কৈশোরেই যেন তাঁহার প্রাণে উদ্ভাসিত হইত। এই সময় একদিন রাত্রে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন: তিনি যেন সমুদ্রতীর হইতে ফিরিতেছেন, এক বিরাট পুরুষ তাঁহার সম্মুখে ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া যাইতেছিল। সেই পুরুষের ইঙ্গিতে মধুসূদন কিছুদূর তাঁহার অনুসরণ করিবার পর নগরোপান্তে সেই বিরাট পুরুষ অন্তর্হিত হইয়া যান। এই স্বপ্ন মধুসূদনের মনকে কিছুদিন প্রবল ভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। কলেজে এফ. এ. পড়িবার সময় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সুপণ্ডিত ও সাধুচরিত হরনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গ-প্রভাবে মধুসূদন ও প্যারীমোহন যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে-ধর্মপিপাসা বাল্যাবধি তাঁহার অন্তরে জাগ্রত ছিল, তাহাই সত্যের পূজারী মধুসূদনকে এই সত্যধর্মের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। দেশ-প্রচলিত মূর্তিপূজার মধ্যে তাঁহার প্রাণ আর তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীন বার্তা তাঁহার প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নব জাগরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিল। এই নব জাগরণ যে কিরূপে তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, ইহার অতুলন প্রভাব তাঁহার সমগ্র জীবনটিতে জ্ঞান কর্ম ও তপস্যার দ্বারা মানব জীবনে সার্থকতা লাভে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা সমুচিত ভাবে বর্ণনা করিতে আমার লেখনী অক্ষম। তথাপি বালকবালিকা পিতাকে সম্যক্ রূপে ধারণা করিতে না পারিলেও, যতটুকু বুঝিতে পারে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আমার এই দুর্বল প্রচেষ্টাকে পাঠক-পাঠিকাগণ সেই দৃষ্টিতে দেখিবেন—ইহাই বিনীত নিবেদন!

বাল্যে স্বপ্নদৃষ্ট বিরাট পুরুষের মুখনিঃসৃত ওঁকার ধ্বনি তাঁহার অন্তরে অনন্তের পূজার জন্য আহ্বান জাগাইয়াছিল। যৌবনে সত্যনিষ্ঠ, সাধু, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের উপাসক, অধ্যাপক হরনাথ ভট্টাচার্যের জীবন-প্রভাবে তিনি উজ্জ্বল ভাবে অনুভব করিলেন যে, মানবসন্তান সেই একমাত্র অনন্ত দেবতারই উপাসক।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্" ঈশোপনিষদের এই চৈতন্যময় অনুভূতি তাঁহার অন্তরকে আর সসীম দেবতার বাহ্য পূজার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে দিল না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ধর্মের আদর্শ হইল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নির্দেশিত সেই শ্লোক—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্,
চেতঃ সুনির্মলন্ তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে।

এই আদর্শের পথে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন এবং তাঁহার জীবন-প্রভাবে বহু যুবক ছাত্র ও বন্ধু আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী পদ্মাবাই প্রথম হইতেই পতির অনুগামিনী ছিলেন। অনুজ জগন্নাথ রাও-ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধর্মজীবন প্রভাবে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

পিতা ভাগীরথী রাও পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণ ও উপবীত পরিত্যাগের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিচলিত হইলেন। তিনি নিজে গোঁড়া হিন্দু, দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন স্নানান্তে পাঁচটি বৃক্ষে জলসেচন করিয়া পূজায় বসিতেন। পূজান্তে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ 'নির্মাল্য' সেবন করিয়া তৎপরে জলগ্রহণ করিতেন। হিন্দুর বার ব্রত উপবাস প্রভৃতিও তিনি নিয়মিত পালন করিতেন; ভগবদ্গীতা নিয়মিত পাঠে তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবাহের অনতিপূর্বে ধর্মানুষ্ঠান পূর্বক উপবীত গ্রহণের নিয়ম ইঁহাদের পরিবারে পালিত হইত। মধুসূদন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এ সংবাদ পাইয়া ভাগীরথী প্রথমে পত্রদ্বারা ও পরে নিজে পুত্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পুত্রকে নিজ বিশ্বাসে অটল দেখিয়া অন্তরে দারুণ মর্মবেদনা পাইলেও, এই পুত্র-বৎসল পিতা তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার কিছুই

করিলেন না। পুত্রকে স্বীয় বিশ্বাসমতে চলিতে কোন বাধা দিলেন না। পুত্র ও পুত্রবধূদিগের প্রতি পূর্ববৎ সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মধুসূদন যে পরবর্তীকালে একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

"জ্ঞান কর্ম তপস্থার বলে
এ ভারত মহী-মণ্ডলে।
জিণি শুদ্ধি ভব রঙ্গ তলে,
উজ্জ্বল কর এ উৎকলে।"

—জ্ঞান, কর্ম, ও তপস্থার সাধনই যে নবযুগের নবজাগরণের পথে মানব সন্তানকে অগ্রসর করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী করে, মধুসূদনের জীবন তাঁহার অনুবর্তিগণের সম্মুখে সেই আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া দেখা দিল।

এই স্থলে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ দেওয়া প্রয়োজন :—

(ক) রাজর্ষি রামমোহন

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরাজ রাজত্বের উত্থান এই যুগসন্ধিকালে যখন ভারতবর্ষ মধ্যযুগীয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, দীর্ঘকালের পরাধীনতার জন্য জাতীয় জীবন যখন নানাভাবে দুর্গতিগ্রস্ত,—মানবতা-বোধ লুপ্তপ্রায়, মানব-মন ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ শাস্ত্র-নিগড়ে আবদ্ধ, সমাজ-জীবন অর্থহীন ও হৃদয়হীন দেশাচার ও বিবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত, বহু দেব-দেবীর ভক্তিহীন পূজার বাহ্যাড়ম্বরে হিন্দুজীবন যখন বিব্রত ও মোহাবিষ্ট দেশের সেই ঘোর অন্ধকারে ভগবানের আশীর্বাদে, দীপ্তিময় নবসূর্য্যের ন্যায় রাজা রামমোহন রায় উদিত হইয়াছিলেন ভারতের ভাগ্যাকাশে (জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। সেই দুর্দিনে মৃতকল্প ক্লেদাক্ত জাতীয় জীবনধারার মুখটি প্রাচীন নির্বিচার গতানুগতিকতার দিক হইতে ফিরাইয়া রামমোহন ভারতবাসীকে জাগ্রত চৈতন্যে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া নবযুগের সূর্যোদয়কে অভিনন্দন জানাইতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। বহু যুগ সঞ্চিত ভয় ও জড়তায় ম্রিয়মাণ হিন্দুসমাজকে অকিঞ্চিৎকর শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক বিধি নিষেধের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কূপ-মণ্ডূকের জীবন যাপন না করিয়া সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরে পরিহারপূর্বক সাহসী

অভিযাত্রীর ন্যায় বিশ্বের মুক্ত পথে বাহির হইবার জন্য ডাকিয়া বলিলেন, "ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে"। বিশ্ব বিধাতা এক, মানব জাতি এক, জগদ্বাসী নরনারী এক বিশ্বপিতার সন্তান—এই বাণীর ভিতর দিয়াই সর্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়।

ইতিহাস ভারতের সেই কালটিকে ব্রিটিশ যুগ বলিয়াছে! কিন্তু ভারতের চিন্তানায়কগণ—যথা, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য শ্রীরাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি—এ দেশে তদবধি যে যুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে 'রাম মোহনের যুগ' বলিয়া অভিহিত করেন। সেদিন তিনি জাতির সম্মুখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান সমন্বয়-সম্ভূত এমন একটি শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিলেন যাহার অনুশীলন কেবল ব্যক্তি ও জাতির মুক্তি-বিধানই সম্ভবপর করে নাই, পরন্তু উহা এক অভিনব ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত সসীম মানবকে অসীম মানবতা-বোধে, তথা বিশ্ববোধে, উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। যুগপ্রবর্তক রামমোহনের এই আদর্শ যে অবাস্তব কল্পনামাত্র নহে, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য ও অনুগামী রবীন্দ্রনাথে। রামমোহনের প্রচারিত মহোদার আদর্শই দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা অনুসৃত হইয়া তদীয় পরিবারে ও ব্রাহ্মসমাজে সমুচিত পরিপোষণের সুযোগ পাইয়া, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃষ্ট রূপায়ণ লাভ করিয়াছে।

(খ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের যে অভ্যুদয় রাজা রামমোহনের "ভাব সেই একে" বাণীর ভিতর দিয়া প্রথম সূচিত হইয়াছিল, তাহাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া অদ্ভুতভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা যে মানবকে জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকারের পথে কিরূপ সফলতাদান করে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের নিকটতম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে রামমোহনের সহিত দেবেন্দ্রনাথের পরিচয়। বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অতি প্রিয়-পাত্র ছিলেন, তাঁহার মাণিকতলার বাগানে প্রায়ই গিয়া দেবেন্দ্রনাথ গাছের ফল খাইতেন ও দোলায় দুলিতেন। রামমোহনও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দোলায় বসাইয়া নিজে দোল দিতেন।

নিজেও কখনও কখনও দোলায় বসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে দোল দিতে বলিতেন। রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের সহিত দেবেন্দ্রনাথ হেদুয়ার নিকটস্থ রামমোহনের স্কুলে পড়িতেন। রামমোহন বিলাতে গমনের সময় নিজেই দেবেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত করমর্দন করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন অল্পবয়স্ক বালক, রামমোহনের মহত্ত্ব বুঝিবার মতো শক্তি তাঁহার হয় নাই; কিন্তু রামমোহনের সস্নেহ ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তিনি রামমোহনের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে, বৃহস্পতিবার) মৃত্যু ২৬ মাঘ, ১৮২৬ শক (১৯ জানুয়ারী, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

পরবর্তীকালে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, "রাজা যে সস্নেহে আমার হাত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, একবার আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় তিনি রামমোহনকে পূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া বলিলেন, "রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিনদিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ"। শুনিয়াই রামমোহন বলিয়াছিলেন, "বেয়াদব! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে[১] বল"। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "এতদিন পরে সেই কথার ভাব ও অর্থ বুঝিতে পারিলাম।" (আত্মজীবনী—৫৭পৃঃ, সতীশচন্দ্রের সংস্করণ) অন্যত্র লিখিয়াছেন, "যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তখন অবধি আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল, আমার চেতন হইল। আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম"। (আত্মজী—৫৬ পৃঃ)

দেবেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি 'দিদিমা'র (পিতামহী) কাছেই বড় হইয়াছিলেন। শয়ন, ভোজন, উপবেশন সব কিছুই তাঁহার ঠাকুরমার সন্নিধানে ঘটিত। এই ঠাকুরমার মৃত্যুর পূর্বরাত্রে, যখন তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানে নিমতলার ঘাটে একটি চাঁচের উপর বসিয়া ছিলেন; ঠাকুরমার নিকট কীর্তন হইতেছিল, "এমন দিন কি

(১) রাধাপ্রসাদ—রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে"; বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে এই গান অল্প অল্প দেবেন্দ্রনাথের কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ এক আশ্চর্য উদাস ভাব তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। তিনি যেন আর আগের মানুষ নাই, ঐশ্বর্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ, মনে আর ধরে না। ভাষা সর্বথা দুর্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব?···সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়া তিনি আমাকে এই আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম?

"এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া আমি রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাড়ীতে আসিলাম।······সারারাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।" (মহর্ষির আত্মজীবনী—৪১ পৃষ্ঠা,—সতীশচন্দ্রের সংস্করণ)

কিন্তু এই আনন্দ তাহার পরদিনেই চলিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্রনাথ ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর, প্রেমের সাগর, সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।·········তখন উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হাতে নিপতিত হইল"। দেবেন্দ্রনাথ ঔৎসুক্যবশতঃ এই ছিন্ন পত্রটি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন; কিন্তু যাহা লিখিত আছে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। পরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ ছিন্ন পত্র পড়িয়া অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

ইহার অর্থ—"ঈশ্বরের দ্বারা সমুদায় জগৎ আচ্ছাদন কর। তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। অন্য কাহারও ধনে লোভ করিয়ো না।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'-এর অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট সায় পাইতে

ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্মের মধ্যে সায় দিল। আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই; উপনিষদে কি পাইলাম?—পাইলাম যে, 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় জগৎ আচ্ছাদন কর'। ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় আচ্ছাদন করিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম।" (আত্মচরিত—৬০ পৃঃ)। দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্ত হইল।

রামমোহন কৈশোরে ইসলাম ধর্মের আলোচনা হইতেই প্রথমত একেশ্বরবাদ তত্ত্ব লাভ করেন; পরে হিন্দু শাস্ত্রে—অর্থাৎ বেদান্ত, উপনিষদ্ তন্ত্রাদিতেও তাহা আবিষ্কার করিয়া আশ্বস্ত হইয়া হিন্দুগণের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া পিতাকর্তৃক পরিত্যক্ত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। পরিণত বয়সে খৃষ্টীয় ধর্মের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিলেন যে, উহাও ইহুদী ধর্মের ন্যায় মূলত একেশ্বরবাদ, তখন তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন যে, একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরোপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তখন সেই বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রহ্মোপাসনার জন্য তিনি কতিপয় সুহৃদকে লইয়া চিৎপুরে কমল বসুর বহির্বাটিতে ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন (৬ই ভাদ্র, ১৭৫০ শকাব্দ—১৮২৮ খৃষ্টাব্দ)। ইহার দেড় বৎসর মধ্যেই জোড়াসাঁকোর (৫৫ নং চিৎপুর রোডে) নবনির্মিত নিজস্ব গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনা হয় (১১ই মাঘ, ১৭৫১ শকাব্দ—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রথম ইহা 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নামেই পরিচিত ছিল; পরবর্তী কালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন স্বতন্ত্র হইয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করিলেন, তখন হইতে উহা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রতিষ্ঠার দিন উক্ত সমাজের ট্রাস্ট ডীড (Trust Deed) হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, ঐ ভবন জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের জন্য উন্মুক্ত হইল এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন কোন পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।

রামমোহন যদিও পৌত্তলিক পূজার অসারতা নানা শাস্ত্র বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সেই পূজার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতে তাঁহার মৃত্যুর পর, উহার কার্য এক প্রকার লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। কেবল আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কয়েক জন মাত্র বন্ধুকে লইয়া

এই মন্দিরে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা কার্যটি রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের যোগ এই ছিন্ন পত্রে উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যার পর ক্রমেই নিকটতর হইয়া উঠিল। তাঁহার ধর্মপিপাসু অন্তর উপনিষদে ঋষিবাক্যের মধ্যে সত্যের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন—এই সত্য অন্তরে অনুভব করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই পৌষ, কুড়িজন সঙ্গী সহ দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে সকল ব্রাহ্ম ও সকল ব্রাহ্মসমাজ যাহা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবেন, এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার আশা হইয়াছিল যে, উপনিষদ্ এইরূপ গ্রন্থ হইবে। কিন্তু ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে গমন করিয়া ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল—উপনিষদে অনেক বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও উপদেশ থাকিলেও তাহা সর্বাংশে একরূপ নহে। তাহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য কথা ও অসার কল্পনাও অনেক আছে।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "আমার এখন ভাবনা হইল যে, ব্রাহ্মদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র পুরাণ বেদান্ত উপনিষদ, কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে।" (মহর্ষির আত্মজীবনী ১৭৫ পৃঃ)

বীজমন্ত্র অর্থে তিনি বুঝিয়াছিলেন ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য প্রকাশক সংক্ষিপ্ত অথচ সরল বাক্য।

মহর্ষি লিখিয়াছেন, "আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম, বলিলাম আমার আঁধার হৃদয় আলোকর; তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি একটি বীজ দেখিতে পাইলাম। অমনি একটি পেনসিল দিয়া সম্মুখের কাগজ খণ্ডে লিখিয়া রাখিলাম ও তাহা একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম।" বীজমন্ত্রটি এইরূপ:—

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ; তদিদং সর্বমসৃজৎ।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বম্ একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি-সর্বনিয়ন্তৃ-সর্বাশ্রয়-সর্ববিৎ-সর্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ ভবতি।

৪। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

(গ) ব্রাহ্ম উপাসনা প্রণালীর ক্রমবিকাশ

প্রথমাবধি রামমোহনের মানসপটে ব্রাহ্মগণের উপাসনার জন্য তিনটি স্তর স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথা (১) দৈনিক ব্যক্তিগত উপাসনা বা সনাতন সাধন-পদ্ধতি—ধ্যান জপ পূজার্চনা ইত্যাদি—যাহার অভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব; (২) সমবিশ্বাসিগণের সহিত সাপ্তাহিক মণ্ডলীগত উপাসনা,—যাহা খ্রীস্টিয়ান এবং মুসলমানগণের মধ্যে সুপ্রচলিত এবং যাহার অভাবে মণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক যোগ, সদ্ভাব ও সৌভ্রাত্রের বিকাশ অসম্ভব; এবং (৩) সর্বজনীন উপাসনা—যাহার উদ্দেশ্য বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ববোধ।

ব্যক্তিগত সাধনায় রামমোহন যে ঋগ্বেদের সাবিত্রী মন্ত্র, অর্থাৎ গায়ত্রীকেই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন মনে করিতেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত "গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানম্" নামক পুস্তিকায়। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সাবিত্রী ঋক্ গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলিয়া উহা গায়ত্রী মন্ত্র নামে সুপরিচিত। এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা, সবিতৃদেব, এবং বৈদিক যুগে প্রথমতঃ ইহার অর্থ ছিল—"আমরা সেই সবিতৃ-দেবের অর্থাৎ সূর্যের বরণীয় তেজঃ (অথবা তেজোময় রূপ) ধ্যান করি; যেন (তাহার ফলে) তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।" কিন্তু এই মন্ত্র যে ইহার উপাসকদিগকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্য পূজার নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া এক চৈতন্যময় পরম সত্তার অনুভূতিতে উঠিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার পরিচয় উপনিষদেই আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশখণ্ডে সবিতৃদেব বা আদিত্যকে প্রায় সর্বব্যাপীরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; দ্বাদশখণ্ডে গায়ত্রীর নূতন ব্যাখ্যায় উহাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রশস্ত উপায় বলা হইয়াছে। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ যে-অর্থে গায়ত্রী মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে গৃহীত ব্যাখ্যারই অনুরূপ; যথা—"আমরা সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-

প্রসবিতা দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।"

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (৬ ভাদ্র, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ) করিয়া রামমোহন যখন মণ্ডলীগত প্রকাশ্য উপাসনা-প্রণালীর প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তখন মিলিত বা সামাজিক উপাসনা-পদ্ধতির কোনও প্রণালী হিন্দু সমাজে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না; কারণ এদেশে ব্যক্তিগত সাধনা এবং সম্মিলিত বাহ্যানুষ্ঠানই চিরাচরিত রীতি। সেইজন্য রামমোহন খৃষ্টীয় সমাজের—বিশেষতঃ একেশ্বর বাদী খৃষ্টীয়গণের অনুসরণে, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, উপদেশ ও সঙ্গীত সংবলিত একটি সামাজিক উপাসনা-পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করেন। তাহার পর অতি অল্পদিনই তিনি এদেশে ছিলেন; ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত গমনের পূর্বে নানারূপ কর্মব্যস্ততার মধ্যে মণ্ডলীগত উপাসনা প্রণালীর সংস্কার সম্পাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রাজা ১৮২৮ সালেই "ব্রহ্মোপাসনা" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে "ব্রহ্মোপাসনার সংকেত-ক্রম এই" বলিয়া একটি প্রণালী নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজে সে পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনা প্রচলিত হয় নাই।

তাঁহার সংকলিত প্রণালীতে ছিল—"মানুষের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকে: এক—এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা; দ্বিতীয়—এই যে পরস্পর সৌজন্যেতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কালহরণ করা। পরমেশ্বরে নিষ্ঠার লক্ষণ:—তাঁহাকে আপনার আয়ু এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তা করা, এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা, অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে—যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।

"পরস্পর সাধু ব্যবহারে কালহরণের নিয়ম এই যে, অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব; আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয়, সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।"

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে যে উপাসনা প্রণালী প্রচলিত দেখিলেন, তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; কারণ উহাতে পরব্রহ্মের আরাধনা, ধ্যান, বা প্রার্থনার কোন স্থান ছিল না। সেইজন্য তিনি প্রথমে উহার সহিত 'গায়ত্রীমূলক' উপাসনার প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া তাহার সাহায্যে উপাসনা করা অতি দুরূহ ব্যাপার।, "সহস্রেষু কশ্চিদেব" উহাতে সমর্থ হইতে পারে। সাধারণে যাহাতে সহজ উপায়ে ঈশ্বরে আত্মসমাধান করিতে পারে, তদুপযোগী উপাসনা প্রণালীর বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে, দেবেন্দ্রনাথ "স্বরূপ" অবলম্বনে ব্রহ্মের যে উপাসনা পদ্ধতির সূত্রপাত করিলেন, তাহা সাধন-জগতে সম্পূর্ণ অভিনব এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপে গভীর মনন ও চিন্তনের পর উপনিষদ্ হইতে তিনি তিনটি শাস্ত্রবাক্যকে একত্র করিয়া একটি স্থায়ী সমাধান মন্ত্র গঠন করিলেন, যাহা অদ্যাবধি ব্রহ্মোপাসনার আরাধনা-মন্ত্রের অঙ্গীভূত রহিয়াছে; তৎপরে মহর্ষি যজুর্বেদ হইতে একটি অর্চনা-মন্ত্র, মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে একটি স্তোত্র এবং উপনিষদের কয়েকটি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত যে দেশপ্রসিদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্র—অসতোমা সদ্ গময় ইত্যাদি—প্রস্তুত করেন, উহা ব্রাহ্মসমাজে এবং সাধারণ্যেও সুবিদিত।

ব্রাহ্মসমাজ যে একটি স্থায়ী এবং প্রকৃত ধর্মমণ্ডলীর আকার ধারণ করিল, ইহা কেবল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু প্রার্থনা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। এই মণ্ডলীভুক্ত আত্মাগুলির আধ্যাত্মিক ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল চিত্তে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় দীর্ঘকাল একাগ্র তপস্যায় নিরত থাকিয়া, শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-পুরাণাদির বিভিন্ন স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন মন্ত্র ও মন্ত্রাংশ সকল সংকলন করিয়া, স্বীয় আধ্যাত্মিক ভাবরসে উহাদিগকে অভিসিঞ্চিত ও নব শৃঙ্খলায় সুবিন্যস্ত করিয়া মন্ত্রশক্তির পূর্ণতা সম্পন্ন এক সুপবিত্র ভাবগম্ভীর অনবদ্য ধর্মগ্রন্থ— "ব্রাহ্মী উপনিষৎ," 'ব্রাহ্মধর্ম'-নামক পুস্তক—রচনা করিয়া ব্রাহ্মগণকে উহা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা এক অমূল্য এবং অতুলন অধ্যাত্মসম্পদ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ('ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের নবম সংস্করণের সম্পাদক) উহার পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন:

"এই ধর্মগ্রন্থে কি কি থাকিবে? প্রথমতঃ, যাহা সকল ব্রাহ্মই আপনাদিগের ধর্মের মূল সত্য বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিবেন এবং যাহার

সহিত মিলাইয়া ধর্মসম্বন্ধীয় অবান্তর প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিবেন—এমন সকল মূলসত্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহা উপাসনাকালে নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও মনন করিয়া ব্রাহ্মদিগের চিত্তে বিমল জ্ঞান, ঈশ্বর ভক্তি ও সাধুভাব উজ্জ্বল থাকিবে— এমন সকল তত্ত্ব ও উপদেশ। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মধর্ম বীজ'-এ সেই মূলসত্য এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সেই তত্ত্ব ও উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" (ব্রাহ্মধর্ম্ম-১০ম সংস্করণ—৩৫২ পৃঃ)

"এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, মহর্ষির অভিপ্রায় আশাতীত রূপে পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মসমাজ সমূহে উপাসনাকালে ইহা পঠিত হইতে লাগিল।··· ব্রাহ্ম হইলে মানুষ কিরূপ হয়, তদ্বিষয়ে সাধারণের মনে যে সকল ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক ধারণা ছিল, এই গ্রন্থের পবিত্র বচন ও উপদেশসকলের দ্বারা তাহা দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ধারণা উৎপন্ন হইতে লাগিল।...........

"এইরূপে এই গ্রন্থ প্রচারের ফলে সে যুগে ব্রাহ্মসমাজের জীবন অধিকতর সতেজ হইয়া উঠিল। উৎসবাদি সরস হইতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা এবং ব্রাহ্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল।"

(ব্রাহ্মধর্ম—১০ম সংস্করণ—পৃঃ ৩৬১—৬২)

কয়েক বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন খৃস্টীয় ধর্ম প্রভাবে পাপবোধ ও সন্নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ব্যাকুল হইয়া আরাধ্যকে শুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধাররূপে উপলব্ধি করিবার উপযোগী শাস্ত্রবাক্যের জন্য মহর্ষির শরণাপন্ন হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মানন্দকে ঈশোপনিষৎ হইতে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই শাস্ত্রবাক্যের সন্ধান দিলেন। তদবধি ব্রাহ্মগণের আরাধনা মন্ত্রে চারিটি শাস্ত্রবাক্যই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; যথা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তিরীয়); আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি (মুণ্ডক); শান্তং শিবমদ্বৈতম্ (মাণ্ডুক্য); শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ (ঈশোপনিষৎ)।

(ঘ) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন তৎকালে কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর (৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৩১ বঙ্গাব্দ) কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহাঁর পিতার নাম প্যারীমোহন সেন; ইনি রামকমল সেনের দ্বিতীয়

পুত্র। প্যারীমোহন সেন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কেশবচন্দ্রের জননী সারদা দেবীও সদাশয়তা এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এইরূপ পিতা-মাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশব বাল্যাবধি শান্ত, শিষ্ট, সাধুতানুরাগী ও শ্রীমান বালক ছিলেন। কেশবচন্দ্রের অনুমান ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতামহ রামকমল সেনের মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে পিতা প্যারীমোহনও পরলোক গমন করেন। একাদশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন বালক কেশবচন্দ্র জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের অভিভাবকত্বেই বড় হইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বালীগ্রামের কুলীন বৈদ্য পরিবারস্থ চন্দ্রকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠকন্যা জগন্মোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে লিখিত আছে—১৮৫৭ সাল হইতে কেশবচন্দ্রের ধর্মভাব ও কর্মোৎসাহ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। ঐ সালে তিনি তাঁহার কয়েকজন যৌবন-সুহৃদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপন ভবনে 'শুভেচ্ছা ভ্রাতৃসংঘ' (Goodwill Fraternity) নামে এক সমিতি স্থাপন করিলেন। ইহার সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্মাচার্যদিগের গ্রন্থ হইতে অংশসকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেন এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতেন, বা মৌখিক বক্তৃতা দিতেন। এই সভাতে তাঁহার ভাবী বাগ্মিতার সুত্রপাত হইল এবং এখান হইতেই একদল যুবক তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন; সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং যুবক কেশবচন্দ্রের ধর্মানুরাগ, সংগঠন শক্তি ও ভাবী অসাধারণ বাগ্মিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হন। (রামতনু লাহিড়ী—২৩৯ পৃঃ)

এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারিত, ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা রচিত, "হোআট ইজ ব্রাহ্মইজ্‌ম্" নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া, তাহার সহিত নিজ ভাবনার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া, বিবেকের নির্দেশানুসারে তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে কিছুদিন একান্তে ধ্যান-ধারণায় যাপন করিবার জন্য সিমলা পাহাড়ে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া, তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু[১] প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হন। অচিরেই কেশবচন্দ্র তাঁহার অকৃত্রিম ধর্মানুরাগ ও কর্মোৎসাহের জন্য দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্যের মধ্যে উভয়ে উভয়কে নিকটতম বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন এবং উৎসাহের সহিত উপাসনায় ও ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার কল্যাণকর্মে, দেশের উন্নতি-বিধানে ও সমাজ-সংস্কারে প্রাণমন সমর্পণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার পরিবারে কেশবচন্দ্র এবং তৎপত্নী জগন্মোহিনী দেবীও সেইভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন। মহর্ষিদেবই কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দান করিয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে, বিশেষ উপাসনার পর তাঁহাকে উক্ত সমাজের আচার্য-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। যে ক্ষেত্রে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের ন্যায় বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ধর্মানুরাগী ব্রাহ্মণ উপাচার্য বর্তমান, সেক্ষেত্রে বৈদ্য-বংশ-সম্ভূত যুবা কেশবচন্দ্রকে সকলের উপরে আচার্য-পদ প্রদান করিতে দেবেন্দ্রনাথকে কম বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার এই কার্য স্বৈরাচার প্রণোদিত নহে। আচার্য পদ লাভের সমস্ত সদ্‌গুণাবলী কেশবচন্দ্রে বর্তমান দেখিয়াই ঈশ্বরাদেশে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঐরূপ প্রস্তাব লিখিতভাবে আনয়ন করেন, এবং সেই প্রস্তাব ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ চৈত্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায়, দেবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতেই, অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সভাতেই দেবেন্দ্রনাথকে "ব্রাহ্মসমাজ-পতি ও প্রধান আচার্য" উপাধি প্রদান করা হয়।

শান্ত, সৌম্য, শুদ্ধচরিত্র, সাধুতানুরাগী কেশবচন্দ্রের জীবনে আশ্চর্যভাবে কৈশোরে ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা দেখা দেয়। ১৮৮২ সালে স্বরচিত 'জীবনবেদে' এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—আমার জীবনবেদের প্রথম কথা

১। রামমোহনের বিলাত গমনের পর তৎপ্রতিষ্ঠিত স্কুলটি উঠিয়া গেলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হইয়া তিন বৎসরে উহার দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া ছিলেন। এইখানে তিনি প্যারীমোহন সেনের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

প্রার্থনা।...ধর্মজীবনের উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল।...প্রার্থনা কর বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে, যাহা কিছু অভাব—পাইবে। এই কথাই জীবনের পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত।...প্রার্থনা গুরু, অসহায় জনের অপার সহায়।

"এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম।...ঈশ্বরকেই কেবল গুরু বলিয়া জানি।...কোন মানুষকেই পূর্ণ আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না।"

ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই মহোদার বাণীর উপরে নিজ জীবনটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশবচন্দ্র দেশের সর্ববিধ সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়া দেশকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও কর্মোৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া যে একদল অনুরাগী বন্ধু ও সহসাধক তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ও সঙ্গত সভায় সমবেত হইয়া জীবনকে উচ্চস্তরে উন্নীত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের অনেকেই কেশবচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পার্থিব বিষয়কর্ম ও অর্থোপার্জন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম সাধনে ও ধর্ম প্রচারে আপনাদিগকে নিয়োগ করিলেন। এই প্রচারক দলের জীবনব্যাপী ত্যাগ, সাধন ও দেশ বিদেশে প্রচারের ফলেই এই নব ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারের বাণী সমগ্র দেশে প্রচারিত হয়। বর্তমানকালে দেশমধ্যে যে উদার অসাম্প্রদায়িকতা, নীতিবোধ এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদাজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত হইয়াছে, তাহার মূলে ব্রাহ্মধর্মের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং স্মরণযোগ্য।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নির্বন্ধে এবং অনুপ্রেরণায় সকল ধর্মগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া একখানি নিত্যব্যবহার্য ধর্মগ্রন্থ "শ্লোকসংগ্রহ" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের আরম্ভে ব্রাহ্মধর্মের মূলমন্ত্র, মূল আদর্শ নিরূপিত করিয়া যে শ্লোকটি রচিত হইয়াছিল—

তাহা এই :—সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্
চেতঃ সুনির্মলম্ তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে।

কেশবচন্দ্রের অন্তরে উজ্জ্বলভাবে অনুভূত এই সত্য তাঁহারই নির্দেশে সহসাধক উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়মহাশয় উল্লিখিত শ্লোকাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। সর্বধর্মসমন্বয় এবং নববিধানের ভাব এই গ্রন্থের মধ্যেই নিহিত। ইতঃপূর্বে ১৮৬০ সনে লিখিত তাঁহার "রিলিজন অব ল্যভ" নামক প্রবন্ধেও কেশবচন্দ্র হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, প্রভৃতি সকল ধর্মবিশ্বাসীদিগকে এক সার্বভৌম ধর্মে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন যে, কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট হইতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় ঘটে এই ঘটনার পনের বৎসর পরে, ১৮৭৫ সনের ১৫ই মার্চ তারিখে। "শ্লোক সংগ্রহ" ছাড়াও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে এবং পরবর্তী বর্ষে উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সংগীত ও উপদেশাদিতে ব্রাহ্মধর্মের সার্বভৌমিকতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব সুপরিস্ফুট ছিল। উক্ত মন্দিরের গঠন প্রণালীতে এবং মন্দির শীর্ষে স্থাপিত প্রতীকেও ধর্ম সমন্বয়ের ভাব সুপ্রকটিত হইয়াছিল—পরমহংসদেবের সহিত পরিচয়ের সাত বৎসর পূর্বে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কোন মতেই ধর্মসমন্বয় বাদের প্রবর্তক বলা চলে না। কারণ, তিনি প্রচার করিতেন, "যত মত, তত পথ", অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মমতই এক-একটি বিভিন্ন পথ, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগ-সাধনের কোন সূত্রই তিনি দেখাইয়া যান নাই।

কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশে তাঁহার প্রচারক-বন্ধুগণের মধ্যে এক-একজন যোগ্যব্যক্তির উপর এক-একটি ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন, সার সংকলন ও অনুবাদের ভার অর্পিত হইল। তাঁহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের গভীর দেশে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ধর্মের মূলতত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত বুঝিবার ও বুঝাইবার যে প্রয়াস হইয়াছে, তাহা অতুলণীয়।

কেশবচন্দ্র কেবল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বাহ্য প্রতীকেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু তাঁহার নববিধানে সকল ধর্ম-বিধানকে যেরূপ গভীর স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং জগতের সকল মহাপুরুষগণকে যে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার তুলনা ধর্মের ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। 'সাধু সমাগম' 'ভক্ত পরিবার'

Shri Shri ... BANARAS ... Ashram

প্রভৃতি তাঁহার নিকট মাত্র কথারকথা-ই ছিল না। ভাবে ও তত্ত্বে এই মহোদার ধর্ম সমন্বয়ের মতবাদটিকে যে তিনি কত আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানুষের সকল ধর্ম এবং জগতের সমস্ত ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষ ও ভক্তদিগকে স্বীয় জীবনে ও মণ্ডলীমধ্যে অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম-সাধনের যে সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন, ধর্ম-জগতের ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই ধর্ম-সমন্বয় সাধনের উপায়ই তাঁহার নববিধানের মূল তত্ত্ব। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি (১২ মাঘ) মাঘোৎসবের সময়ে 'নববিধান' তত্ত্ব আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হইলেও 'বিধান' ও 'নব বিধান'-এর উল্লেখ তাঁহার প্রার্থনা, বক্তৃতা ও উপদেশাদির মধ্যে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই অন্ততঃ বিশ জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। তখন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় বা দেখাসাক্ষাৎ আদৌ ঘটে নাই। অপপ্রচার দ্বারা এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিতে যাঁহারা প্রয়াসী হন, তাঁহারা কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক দৈন্য ও সংকীর্ণতারই পরিচয় দান করেন। পরমহংসদেব ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই সমান-ধর্মা মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া পরস্পরকে দেখিবামাত্রই চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার বিনিময় হইতে কখনই বাধা ঘটে নাই। অসত্য প্রচার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় কি না, প্রচারকারীরা সেকথা ভাবিয়া দেখিবেন। এইরূপ হীন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন বলিয়াই কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে সানন্দে সংবর্ধনাদ্বারা শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনিতে পারিয়াছিলেন।

(ঙ) শিবনাথ শাস্ত্রী

১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুআরি) রবিবার সায়ংকালে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ২৬নং বীডন স্ট্রীটের বাড়ীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার পৈত্রিক নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত (জয়নগর) মজিলপুর গ্রামে। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। এ বংশে পুরুষানুক্রমে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। দেশে টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে ইঁহারা ছাত্রগণকে

সংস্কৃত শাস্ত্র পড়াইতেন। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ইঁহাদের প্রধান কার্য ছিল। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "এই বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্যে রত থাকিয়া গৌরবান্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। যত দূর স্মরণ হয়, এই বংশে আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম লইয়া সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে আমার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ রাজসেবা করেন নাই"। (আত্মচরিত-সিগ্‌নেট সং ১২ পৃঃ)

ইঁহার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার এই গ্রামে টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেন। বাল্যে এই পণ্ডিত, সাধু, ধার্মিক প্রপিতামহের সঙ্গের কথা শিবনাথ তাঁহার আত্মচরিতে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য—বিদ্যাসাগর, মাতা গোলকমণি দেবী—উভয়েরই প্রকৃতি তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিল। তৎকালীন বৈদিক বংশের কুলরীতি অনুসারে শিবনাথের শৈশবেই রাজপুর-নিবাসী নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠকন্যা প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত (প্রসন্নময়ীর বয়স তখন একমাস ও শিবনাথের বয়স অনুমান ২।৩ বৎসর) বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; এবং দশ বৎসর পরে এই বিবাহ কার্যতঃ সুনিস্পন্ন হয়। এই বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পিতা হরানন্দ কোনও কারণে পুত্রবধূ ও তাঁহার পিতৃগৃহের অভিভাবকদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্নময়ীকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, ও এই বধূকে বর্জন করিয়া, শিবনাথের আপত্তি সত্ত্বেও, বর্ধমানজেলার দেপুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু শিবনাথ এই বিবাহের পরে দারুণ অনুতাপে জর্জরিত হইতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। এ বিষয় তাঁহার আত্মচরিতে অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাকে এ-সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া শিবনাথ সর্বদাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুর্বলতার মধ্যে বল আসিল। আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম—'কর্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক থাকে থাক ধন প্রাণ মানরে'। আমি ধর্মের

আদেশ, হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশ, অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের উপাসনায় যাইব স্থির করিলাম ও যাইতে আরম্ভ করিলাম"। আরও লিখিয়াছেন, "প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম, তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না।...ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না, তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে মগ্ন হইতে লাগিল।...সকল সংগ্রামের মধ্যে দুর্বলতাতে বল, নিরাশায় আশা, নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি।" (সিগ্‌নেটসং-৭০ পৃ:)

পদ্মপুকুর রোডে অবস্থিত এই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছিল। এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। শিবনাথ ইহাতে যোগ দিয়া পরম উপকৃত হইতেন। ক্রমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত ও উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সে সময় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অনুবর্তিগণের সহিত সদলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের সময় ইঁহাদের মন্দিরের (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির) ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষে যে নগরকীর্তন গীত হয় তাহাতে ছিল, "তোরা আয়রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম। নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।" তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "এই আহ্বান-বাণী আমার প্রাণে বাজিল, ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের যেআদর্শ আমার সম্মুখে ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।" সমস্ত দিন এই উৎসবে যোগ দিলেন। সায়ংকালে কেশবচন্দ্র 'রিজেনারেটিং ফেথ' বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এ বিষয়ে শিবনাথ লিখিয়াছেন—"এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্মবিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয়, তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়—এই সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটি নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম"। এইরূপে কেশবচন্দ্রের সহিত শিবনাথের যোগ দিনে-দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, দেশের সকলপ্রকার উন্নতির জন্য কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টার সহিত শিবনাথও প্রাণমন ঢালিয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট), ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন কেশবচন্দ্রের নিকট আরও একুশজন যুবকের সহিত শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে নানা ঘটনার সংঘাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সমস্ত বিবরণ সর্বজনবিদিত।

বিদ্বান জ্ঞানী মনীষী ও প্রতিভাশালী শিবনাথ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "শাস্ত্রী"[১] উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানবিতরণে তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। সেজন্য তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এম. এ. পাসের সঙ্গেসঙ্গেই কেশবচন্দ্র তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে শিবনাথকে শিক্ষকপদে নিযুক্ত করিয়া তদীয় 'ভারত আশ্রমে' তাঁহাকে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। ভারত আশ্রমে প্রায় একবৎসর কাটাইবার পর, শিবনাথ তাঁহার পীড়িত মাতুল, "সোমপ্রকাশ"—সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের আহ্বানে তাঁহার সাহায্যার্থ হরিনাভিতে গিয়া সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা, স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান

১। সংস্কৃতের বিবিধ শাখায় বিভিন্ন প্রদেশে সহস্র রকমের উপাধির প্রচলন আছে; তারমধ্যে কতক বা উপাধিধারীর স্বয়ংবৃত, কতক গুরুদত্ত, কতকগুলি পণ্ডিতসমাজ-প্রদত্ত, এবং অন্যান্য কতকগুলি সরকারী শিক্ষাবিভাগের দ্বারা অনুমোদিত ও সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের উপর পরীক্ষাদ্বারা লভ্য। সাধারণ 'শাস্ত্রী' উপাধি হইতে সংস্কৃত কলেজের শাস্ত্রী উপাধির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, উক্ত কলেজের যে-ছাত্র অতিরিক্ত সংস্কৃত পাঠ্যক্রম লইয়া লোআর গ্রেড (বা জুনিয়র) এবং হায়ার গ্রেড (বা সীনিয়র) বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছে এবং বি, এ, ও এম. এ পরীক্ষায় উক্ত কলেজ হইতে সংস্কৃতে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে, কেবল সে-ই এই উপাধি পাইবে। যতদূর জানা যায়, এই নিয়মে সংস্কৃত কলেজের শাস্ত্রী উপাধি প্রথম লাভ করিয়াছিলেন সুবিখ্যাত আইনজীবী গোলাপচন্দ্র সরকার (১৮৭১)—হিন্দু আইনের বিশেষজ্ঞ বলিয়া যিনি সুবিদিত; দ্বিতীয়—শিবনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭২)—যিনি শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়া দেশবাসিগণের নিকট সুপরিচিত; তৃতীয়—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৭৭)—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। এঁদের পরে ক্রমশঃ আসেন রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, আশুতোষ শাস্ত্রী, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, ব্রজলাল শাস্ত্রী, ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, ইত্যাদি। বিংশ শতকে উক্ত কলেজের কোন কোন অধ্যক্ষ এই উপাধিটিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সহজলভ্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অধুনাতন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী নিয়মাবলীকে কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া উপাধিটিকে বহুলাংশে পুনরায় পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শিক্ষকতা এবং মাতুলের বিষয়সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া মহাকর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রায় দুই বৎসর কাটাইলেন। তৎপরে ভবানীপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্বন স্কুলে দুই বৎসর প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে সরকারী হেয়ার স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইতোমধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মগণের সহিত কেশবচন্দ্রের নানা বিষয়ে মত-বিরোধের সৃষ্টি হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, নিয়মতন্ত্রের উপাসক সত্যনিষ্ঠ শিবনাথ স্বভাবতই সেই আন্দোলনে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের বিরোধী এই আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মসমাজকে সকল দিক দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার কার্যে এবং ব্রাহ্মধর্মসাধনে সর্বস্ব পণ করিয়া তিনি অকপটে আপনাকে ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত শিবনাথ একটি ঘনসন্নিবিষ্টদল গঠন করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপে স্থির হইল যে, তাঁহারা কয়েকটি মূলসত্যকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিবেন। তন্মধ্যে প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য এই কয়েকটি :—প্রথম, তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন; দ্বিতীয়, বিদেশী সরকারের চাকুরি গ্রহণ করিবেন না; তৃতীয়, পুরুষের একুশ বৎসর ও কন্যার ষোল বৎসর পূর্ণ না হইলে, তাহাদের বিবাহ দিবেন না, এবং এই নিয়মের বিরুদ্ধ বিবাহানুষ্ঠানের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না; চতুর্থ, জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না; ইত্যাদি।*

বিবেকবাণীর ভিতর দিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য যে আহ্বান শুনিয়াছিলেন, তাহার তাগিদ এই সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা কার্য পরিত্যাগ করিলেন (১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮)। আর একমাস অপেক্ষা করিলে, হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন নিয়ম অনুসারে সেই বৎসরের (১৮৭৭-১৮৭৮) বোনাস-স্বরূপ দুই-তিন শত টাকা পাইতে

* তদনুযায়ী একদিন বিশেষ উপাসনার পর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাঁহারা অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্বক উক্ত রূপ শপথ গ্রহণ করিলেন।

পারিতেন। শিক্ষক-বন্ধুগণ সেজন্য তাঁহাকে বার বার অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের বাণী শিবনাথকে অপেক্ষা করিতে দিল না। তিনি চাকুরি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ন্যায়-নীতি, সত্যও বিবেকের অনুরোধে প্রাগ্রসর-ব্রাহ্মদল যখন কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন শিবনাথই হইলেন 'তাহার প্রধান কর্মী, প্রধান আচার্য ও প্রধান প্রচারক'। ধর্মসমাজের কাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তন আধুনিক ভারতে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি। ইহার জন্য শিবনাথ ও তাঁহার বন্ধু আনন্দমোহন বসু বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্র প্রণালী সংগঠনে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁহার সম্বন্ধে শিবনাথ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—'তিনি এই সময় ছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মস্তিষ্ক ও আমি ছিলাম দক্ষিণ হস্ত। দুজনে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিতাম, তাহাই আমি কার্যে পরিণত করিতাম'।

শিবনাথের মৃত্যুর পর তৎকালীন 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "এই ভগবদ্‌ভক্ত, সত্যনিষ্ঠ, দ্বেষ-অসূয়াশূন্য, পরচর্চা-পরনিন্দাবিমুখ, মানব-প্রেমিক, দেশভক্ত, অক্লান্তকর্মী, নির্লোভ, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষের কীর্তি অনেক। মনুষ্যত্বে তিনি তাঁহার সমুদয় কীর্তিরও বহু উর্দ্ধে।" ঐ সময়ে প্রবাসীতে (১৩২৬, অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথ শিবনাথ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ : "মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা মানব-প্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তি-প্রবাহে সমীরীত।"

মানবজীবনের যে উচ্চ আদর্শ শিবনাথ সর্বদা অনুসরণ করিয়া চলিতেন ও যাহার কথা তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে নানাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছিল—"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম ও ভগবানে ভক্তি"। এই ষড়ঙ্গ জীবনাদর্শ নিজজীবনে প্রতিফলিত করিয়া তিনি দীর্ঘকাল বহুজনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

শিবনাথের কন্যা হেমলতা সরকার স্বপ্রণীত পিতার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'জীবন-বেদ'-এ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা বলিয়াছেন। শিবনাথ সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনও অগ্নিময় ছিল। ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে অগ্নি-পরীক্ষায় পার হইয়া তিনি অগ্নিময় হইয়া গিয়াছিলেন। সে আগুনে বিষয়সুখ, যশঃস্পৃহা, ধনমান, পদসম্ভ্রম—সবই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। শিবনাথের বাক্য, কার্য, উপদেশ, বক্তৃতা, হৃদয়ের এই প্রচণ্ড অগ্নি উদ্‌গিরণ করিত।" হেমলতা ঐ গ্রন্থের অন্যত্র লিখিয়াছেন—"আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব, শিবনাথের হৃদয়ে যে দুর্জয় বল, আর বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য করিবার জন্য প্রাণে যে অদম্য বাসনা, সাধুকার্যে যে অবিচলিত নিষ্ঠা—তাহা তিনি তাঁহার যৌবনের বন্ধু কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকট যৌবনে যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাই সমুদয় জীবন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন।"

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, উহার প্রথম বাণী—'একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা কর, মূর্তিপূজা ত্যাগ কর'। এ বাণী ঘোষণা করিলেন রাজর্ষি রামমোহন। দ্বিতীয় বাণী হইল—'পরিবার ও সমাজ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কর'। এ বাণী ঘোষণা করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। তৃতীয় বাণী হইল—'সমগ্র জীবনকে বিবেকানুগত কর; বিবেকের আদেশ ঈশ্বরেরই আদেশ'। এই তৃতীয় বাণী কেশবচন্দ্রের দান এবং ইহা ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জন্ম দান করিয়া নববলে বলীয়ান করিয়াছিল। আচার্য সতীশচন্দ্র বলিয়াছেন, কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গত-সভাই নৈতিক ঐকান্তিকতা ও বিবেক-পরায়ণতাকে ব্রাহ্মসমাজের সর্বোজ্জ্বল লক্ষণে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। আচার্য শিবনাথের শ্রেষ্ঠ দান, ব্রাহ্মসমাজের কাজে নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর পূর্ণমাত্রায় প্রবর্তন। আধুনিক ভারতে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীই সর্বপ্রথম নিয়মতন্ত্রকে জীবনে ও সমাজের কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রদর্শিত ত্যাগ—বৈরাগ্য—আত্মোৎসর্গের আদর্শ, সাহস, সেবা এবং কর্মোদ্যোগের বাণী, সে যুগে বহু তরুণ হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া ধর্মসাধনে ও দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়াছিল। তাঁহার অমরবাণী—"ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়"—যে কত গভীর অর্থব্যঞ্জক, তাহা ভারতের মুক্তি সাধনে মহাত্মা গান্ধীর অত্যুজ্জ্বল ভুমিকায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

অতি সংক্ষেপে যুগধর্ম বা ব্রাহ্মধর্মের সারমর্ম ও তাহার অভ্যুদয়ের বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া ও তাহা সাধন করিয়া মধুসূদনের জীবনে যে অপূর্ব ভগবদ্ভক্তি, জ্ঞানে গভীরতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, মানবে প্রীতি, চরিত্রে সংযম, দেশপ্রীতি, সহিষ্ণুতা, সমাজসেবা প্রভৃতি প্রকৃত যুগধর্মের সদ্‌গুণাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সমগ্র উৎকলে, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে, আপামর সাধারণের নিকট তাঁহাকে সমাদরণীয় করিয়াছিল। এইরূপে মহামানব রামমোহনের যথার্থ শিষ্য হইয়া তিনি উৎকলে নবযুগের সূচনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ওড়িয়্যার বিখ্যাত সাহিত্যিক নন্দকিশোর বল 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার মধুসূদন সংখ্যাতে (পৌষ ও মাঘ—১৩২০) "রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—মধুসূদনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি একাধিক কর্মক্ষেত্রে কার্য করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল ধর্মসাধন ও ধর্মপ্রচার, এবং তাহারই উপায়স্বরূপ জ্ঞানার্জন, শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কার; গৃহধর্ম সাধন, অতিথি-সৎকার ও সমাজ-সেবা তাঁহার ধর্মসাধনেরই অঙ্গীভূত ছিল। তাঁহার ধর্মজীবনের আদর্শ ছিল—জ্ঞান, কর্ম ও তপস্যার ত্রিযোগ-সাধন ও বিশ্বজনীন জীবন লাভ। ইহার প্রত্যেক বিভাগে তিনি যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি একটি দ্বারাই তিনি সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারিতেন। পরন্তু, এই সমস্ত গুণগুলি একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তিনি জীবিত কালেই 'ঋষি', 'আদর্শপুরুষ', 'ভক্তকবি' প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে উৎকলের বহু স্থান শূন্য হইয়া গেল।

এই প্রবন্ধে অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "গোপবন্ধু দাস প্রমুখ যুবকমণ্ডলী উৎকলে নবযুগ ও নবজীবনের সূত্রপাত ও সূচনা করিয়াছেন।... মধুসূদনের সুরুচিসম্পন্ন গদ্য-পদ্যময় সাহিত্য ও তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী শিক্ষক-জীবন কি এই যুবক-মণ্ডলীর মধ্যে নবজীবনের ও নবযুগের সূচনাতে কিছু কাজ করে নাই?"[১] তিনি আধুনিক উৎকলের গুরু। অনুসন্ধান করিলে

---

(১) 'উৎকলমণি গোপবন্ধু' পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নয়াগড়ের রাজা গোপবন্ধুকে তাঁহার দুই ভাগিনেয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করাতে গোপবন্ধু কটকে কালিগলিতে

দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তদানীন্তন প্রত্যেক উৎকলীয় যুবকের প্রাণে তাঁহার উৎসাহ ও আদর্শ কাজ করিতেছে"।

মধুসূদনের জীবনব্যাপী কর্মযোগ ও ধর্মসাধনার কথা শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রাণে প্রকাশ করিয়া পরিশেষে তিনি ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"আমরা তাঁহাকে বহুভাবে দেখিয়াছি, কিন্তু একটি রূপ আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া আছে : ব্রহ্মমন্দিরটি নানা লতা পুষ্পে শোভিত। লতাকুঞ্জের মধ্যে সমাসীন ঋষিপ্রতিম তেজস্বী গম্ভীর পুণ্যাভ মধুসূদনের কণ্ঠ হইতে হৃদয় পবিত্রকারী ব্রহ্মমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে :—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

আসিয়া মধুসূদনের গৃহ সন্নিকটে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। এইখানে কবিগুরু রাধানাথ ও ভক্তকবি মধুসূদনের সহিত সাহিত্য আলোচনার অবসর গোপবন্ধু পাইয়াছিলেন।

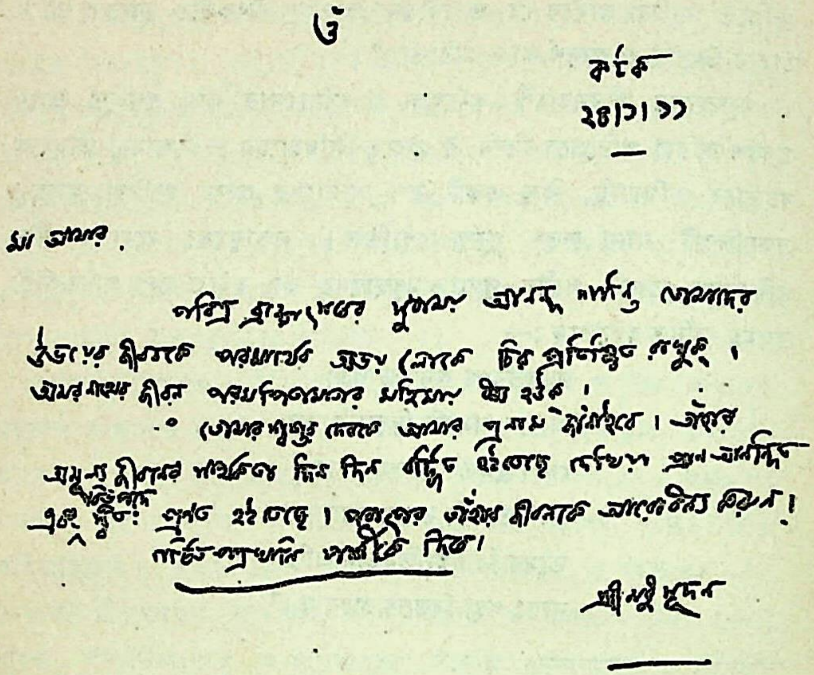

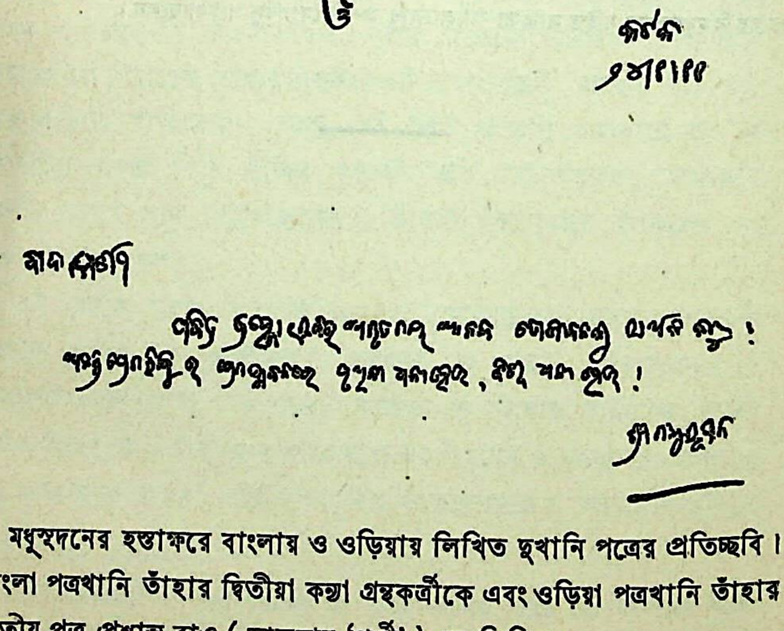

মধুসূদনের হস্তাক্ষরে বাংলায় ও ওড়িয়ায় লিখিত দুখানি পত্রের প্রতিচ্ছবি। বাংলা পত্রখানি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা গ্রন্থকর্ত্রীকে এবং ওড়িয়া পত্রখানি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রশান্ত রাও (ডাকনাম 'পর্শী')-কে লিখিত।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তকবির বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে উপাসনা কালে জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নিবেদিত

ভালবাসায়, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় তিনি আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে, মর্মে মর্মে। ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে, যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার বন্ধু কে. পি. বসু কটকে ছিলেন; তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। আমি তখন ওড়িষ্যার দূরবর্তী স্থানে যাচ্ছি। পুরী দেখি নাই। সেকথা কেউ কেউ স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু অল্প পরিচয়ে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত দেবতা না দেখে তাঁকে দেখলাম—সরল বিশ্বাসে, প্রফুল্ল বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত। যে প্রফুল্লতায় ও যে অনুরাগে তিনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন এবং যে পবিত্রতার ভিত্তিতে তাঁর জীবন প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলাম তার সম্বন্ধে দু-চারটি কথা যা মনে ছাপ পড়েছিল, তাই বলি—

পবিত্রতার প্রতি এত গভীর অনুরাগ যে, ভিতর বাহির সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাড়ীখানি এখনকার মত ছিল না, কিন্তু এত পরিষ্কার, এত পরিচ্ছন্ন! শরীর-মনকে পবিত্র রাখার এমন দৃঢ় অনুরাগ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

তাঁর সেই উপাসনার বিচিত্রতা এই যে, কে গান গাইবে তা জিজ্ঞাসা না করে একতারা হাতে নিজে মধুর কণ্ঠে গাইতেন। গানে তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। যে গানের সুর কখনও শোনেন নি, গভীর ভক্তিতে নিজের সুরে যা গাইতেন, তা শুনতে কি মিষ্টি লাগত! পবিত্রতা সকল কার্যে যেন জড়ান ছিল।

গভীর বিশ্বাসের ফল যা কেশবচন্দ্র বলতেন,—'ছাদ গড়ি আমি আগে, পরে করি ভিত্তি'—তিনিও তাই করতেন। কাজের ভার নিশ্চিন্ত চিত্তে নিতেন। বাড়ী, স্কুল, ব্রাহ্মসমাজের কাজে যা সঙ্কল্প এসেছে, তা হবেই হবে। সে বিশ্বাসের কণামাত্র কেউ পায় যদি, তবে সব ঠিক হতে পারে। নিঃস্ব অবস্থায় বিশ্বাসের জোরে সব করেছেন; ব্যস্ত হয়ে, মুখ মলিন করে করেন নি। সেই গভীর অটল বিশ্বাসের সিংহাসনে তিনি তাঁকে প্রকাশিত দেখতেন, যাঁর আভাসমাত্র প্রাণে এলে আমরা ধন্য হই।

আমাদের মনে উদিত হোক্ সেই পবিত্রতা, বিশ্বাস, অনুরাগ ও ভক্তি।

তাঁর সহজ জ্ঞানে তাঁর ভগবানের নামগান তিনি করতেন। এই সব নিয়ে তাঁকে আজ স্মরণ করি।

দাদামশায়ের কথা

(দৌহিত্রী শ্রীমতী সুনীতি সরকারের লেখা)

দাদামহাশয়ের কথা নাত্নীর কাছে সবই মধুর! এত স্মৃতি মনের মধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়ায় যে, বলবার যেন ভাষা খুঁজে পাইনা।

ছোটবেলায় মার সঙ্গে মামাবাড়ী যাওয়ার কী আনন্দ! এখনও ভাবলে মনটা যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আমাদের বাড়ীর আধুনিকতা থেকে যে প্রাচীন-পন্থী পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়তাম, সেও আমার কাছে নতুন।

চক্চকে মেঝের ওপর একখানা মাত্বর পেতে বসা ও শোওয়া, ঝক্-ঝকে কাঁসার বাসনে খাওয়া, সোনার মত করে মাজা পিতলের ঘড়া-ঘটির জলে স্নান, মুখ ধোয়া, সন্ধেবেলা পিতলের পিলসুজের ওপর তেলভরা প্রদীপের স্বর্ণাভ আলো—সবই মনোমুগ্ধকর। আর এ সবের চেয়ে মনোহর লাগ্ত দাদামশায়ের সৌম্য সুন্দর মূর্তি। নীলাভ ছোট দুটি চোখ থেকে ঠিকরে পড়ত বুদ্ধির জ্যোতি, প্রফুল্ল হাসিতে ছড়িয়ে পড়ত স্নিগ্ধতা। তিনি যে খুব রাশভারি লোক ছিলেন, আর সবাই তাঁকে ভয় করত, তা সেই বয়সেই বুঝতে পারতাম। আমি কিন্তু মোটেই ভয় করতাম না। তাই ছোটমাসী ও ছোটমামাদের কিছু আরজি থাকলে তা আমাকেই পেশ করতে হত, আর অবিলম্বেই কার্যোদ্ধার হয়ে যেত।

দাদামশায়ের পরিচ্ছন্নতা এক দেখবার জিনিষ ছিল। তাঁর স্নানের সময় চাকরেরা ঘড়া ঘড়া জল যখন তাঁর মাথায় ঢালত, মনে হত তাঁর অভিষেক হচ্ছে। খাওয়াটুকুও ছিল অতি নিষ্ঠাবতী বিধবার আহার। অন্তরে বাহিরে এমন শুচি মানুষ কমই দেখেছি। শুচিতার সঙ্গে সৌন্দর্য্য-বোধ একেবারে মিশে থাকত। তাঁর দানশীলতার কথা বুঝবার বয়স তখনও আমার হয়নি। তাছাড়া তাঁর দান গোপনেই বেশির ভাগ হোত। এসব কথা বুঝেছি পরে বড় হয়ে। কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রাণতার কথা অনুভব করতে একটুও দেরি হয়নি। উপাসনায় বসে তাঁর প্রেম-ভক্তি-আপ্লুত মুখখানি দেখলে যে-কেউ বুঝতে পারত যে, তিনি কার সঙ্গলাভ করে এমন বিহ্বল হয়ে আছেন। তার পর

গান। প্রতিদিন একতারাটি হাতে নিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত খুলে গম্ভীর কণ্ঠে পছন্দ-মতো গান, নিজের দেওয়া সুরে গেয়ে যেতেন। সুর ঠিক কি বেঠিক, তা ভাববার অবসর থাকত না কারও, সবাই মগ্ন হয়ে যেতো গভীর ভাবরসে।

তাঁর আতিথ্যের কথা বর্ণনা করে বোঝান যায় না। কটকে গিয়েছেন কেউ বিদেশ থেকে, আর তাঁর অতিথি হননি—এমনটি পাওয়া শক্ত।

নিজের ছেলে মেয়ে ছাড়া কতজনকে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছেন, তার সাক্ষ্য দিতে এখনও অনেকে আছেন। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার কথা ওড়িষ্যায় সর্বজনবিদিত। তবে ঐ বয়সে আমরা বেশি মুগ্ধ হয়ে থাকতাম তাঁর মিষ্টি চিঠিগুলির মাধুর্যে। কি চমৎকার চিঠি যে লিখতেন বলতে পারি না। তাঁর বিষয়ে সব বলার ক্ষমতা আমার নাই। অল্প বয়সে তাঁকে হারিয়ে—সেই আমার জীবনে প্রথম মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া—কতখানি শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলাম আজও তা স্পষ্ট মনে হচ্ছে। শেষ বিদায়ের দিন যেন প্রথম জানলাম, তিনি কি ছিলেন। সমস্ত শহর ভেঙ্গে পড়ল তাঁকে বিদায় দিতে—সেই বিরাট মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, এই অতি ক্ষুদ্র আমরাও তাঁরই অংশ। শোকের মধ্যে সে গৌরবটুকু যেন খানিকটা সান্ত্বনা এনে দিয়েছিল সেদিন। এই সঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না। তিনি অন্যায়ের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন বটে, তবে পাপকে ঘৃণা করা, পাপীকে নয়। এই কথাই তাঁর জীবনে পরিস্ফুট দেখেছি। অপরাধী এসে ক্ষমা চাইলে তাঁর জলন্ত ক্রোধ মুহূর্তে নিবে যেত। দোষীকে বুকে জড়িয়ে তিনি তার চোখের জলে নিজের অশ্রুধারা মিশিয়ে দিতেন। একেই বুঝি বলে—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি"।

[illegible]

পরিশিষ্ট

ওড়িষ্যায় ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

১। উৎকল ব্রাহ্মসমাজ—

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওড়িষ্যায় তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন কার্যে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি কটকে একটি ভাড়া বাড়ীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপন করেন। তাহাতে বাবু জগমোহন রায়, গৌরীশঙ্কর রায় (পরে রায়বাহাদুর) জগমোহন লাল, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগ দেন। এখানে প্রতি বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ধারায় উপাসনা হইত। বর্তমান ওড়িয়া বাজারে যে ব্রহ্মমন্দির গৃহটি আছে, তাহা প্রধানতঃ বাবু জগমোহন রায়ের উদ্যোগে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া নির্মিত হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই গৃহনির্মাণের জন্য বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীঃ কটক জিলা হাই স্কুলে অতিরিক্ত দুইটি শ্রেণী যুক্ত হইয়া এফ. এ. পড়ার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. উপাধিধারী হরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে আসেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট, হরনাথও সেই সময় ব্রাহ্মসমাজে আসেন।

এই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী অধ্যাপক হরনাথ ভট্টাচার্যের প্রভাবে তাঁহার কয়েকটি ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। প্যারীমোহন আচার্য, মধুসূদন রাও ও চতুর্ভুজ পট্টনায়ক ইঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হরনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক উৎকল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে যে ভাড়া বাড়ীতে আদিসমাজের উপাসনা হইত, ঐখানেই স্বতন্ত্র দিনে কেশবানুবর্তী হরনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার অনুগামীদিগকে লইয়া উৎকল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করিতেন। পরে ওড়িয়াবাজারে ব্রহ্মমন্দিরের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হইলে পর, উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অনুরোধে মন্দির কমিটীর পরিচালক জগমোহন রায় তাঁহাদিগকে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় এই গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি ট্রাস্ট্‌ডীড রচনা করিয়া কটকের ব্রহ্মমন্দিরটির পরিচালনভার উভয়সমাজের সভ্যগণের হস্তে অর্পণ করা হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ট্রাস্টীগণের মৃত্যু হইলে পর মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে উৎকল

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অধিকারে আসে। জগমোহন রায় ও রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায় আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেও উৎকল ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য সর্বদাই সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করিয়াছেন এবং অনেক সময়ে উৎকল ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক উপাসনায় শ্রদ্ধার সহিত যোগদান করিয়াছেন।

(ক) উৎকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা—

স্বর্গীয় হরনাথ ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ—

হরনাথ ভট্টাচার্যের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'খল্লী'গ্রামে। তাঁহার জন্ম কোথায় হইয়াছিল এখন সঠিক জানা যায় না। তাঁহাদের পৈত্রিক পেশা ছিল যজন-যাজন ও অধ্যাপনা। কয়েকটি ভাইবোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে মাতুলালয় পাবনাতে তিনি লালিত-পালিত হন। কতদিন পাবনায় ছিলেন ও কতদিন কলিকাতায় ছিলেন তাহাও সঠিক জানা যায় নাই। হরনাথের পিতার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

হরনাথ কলিকাতা জেনারল য়াসেম্ব্লীজ ইন্স্টিটিউশন হইতে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। পরে কয়েক মাস কলিকাতার উপকণ্ঠে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার পর সরকারী চাকরী লইয়া কটকে যান। কটকে যাইবার প্রাক্কালে ইঁহার বিবাহ হয়। সেখানে তিনি কয়েক বৎসর জিলা হাইস্কুলের এফ-এ শ্রেণীতে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। কটক হইতে বদলি হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে আসেন। এই স্কুলের কোন্ শিক্ষকপদে তিনি আসেন তাহা জানা যায় নাই। কিছুকাল হিন্দু এবং হেয়ার স্কুলেও প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এইরূপে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়া ১৯০১ খৃস্টাব্দে তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

পরে আর্থিক প্রয়োজনে তিনি কলিকাতায় সিটি স্কুল প্রমুখ অনেক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৯৩০ খৃঃ কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

হরনাথ অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বেশীর ভাগ সময়ে তিনি নীরবে থাকিতেন। চারিত্রিক বল ছিল তাঁর অসাধারণ। অনেক পারিবারিক বিপর্যয়ের সময়েও তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যাইত না। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহাকে শুধু মৃতদেহের পার্শ্বে আসিয়া প্রার্থনা করিয়াই চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, হরনাথও সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আসেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সারা জীবন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ নিজ জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। প্রতি রবিবার সকালে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং নিজে প্রতিদিন স্নানের পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে উপাসনা করিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হইবার সময় হইতে হরনাথ নববিধান সমাজের সহিত যুক্ত রহিয়া যান। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কেশবের মধ্যে যে কোনও দোষত্রুটি থাকিতে পারে, তিনি কোন দিনই তাহা মনে আনিতে পারিতেন না। আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোক্তাদের কাহারও প্রতিই তাঁর বিরুদ্ধভাব ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের সঙ্গে তাঁহার গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁর ছোট ভাইয়ের মতনই ছিলেন।

প্রথমদিকে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিতেন, কিন্তু পরে ক্রমশ তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। বর্তমানকালে তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে কেবল একজন দৌহিত্র—শ্রীসুনীলকৃষ্ণ বাগচী—ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত আছেন।

(খ) স্বর্গীয় প্যারীমোহন আচার্য—

কটক জেলার সালেপুর থানার অন্তর্গত কুঁআপাল নামক এক গণ্ডগ্রামের নিকটবর্তী পশুলুণ্ডা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে প্যারীমোহন পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ভুবনমোহন আচার্য কটক আদালতের উকীল ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র প্যারীমোহনের পরে ভুবনমোহনের আরও দুইটি পুত্রসন্তান হয়। মধ্যম দ্বারকানাথ আচার্য—মোক্তার, ও কনিষ্ঠ চন্দ্রমোহন আচার্য—ডাক্তার হইয়া ছিলেন।

'কুঁআপাল' গ্রামের পাঠশালায় প্যারীমোহনের পাঠারম্ভ হয়। সেকালের এই পাঠশালাগুলি পরবর্তী কালের নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার মতো ছিল না। তৎকালীন পাঠশালাগুলিতে পঠিতব্য বিষয় ও পাঠের মান সর্বত্র সমান ছিল না। অনেক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষারম্ভ হইত। তদানীন্তন স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর কৈলাসচন্দ্র তর্কালঙ্কার (পরবর্তী কালের কটকে প্রসিদ্ধ উকীল প্রিয়নাথ চ্যাটার্জীর পিতা) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা বর্ণ-পরিচয়ের যে ওড়িয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই বইখানি দিয়াই প্রধানত বালকদিগের শিক্ষারম্ভ হইত। কোন কোন পাঠশালাতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থাও কিছু কিছু ছিল। প্যারীমোহন এইরূপ একটি পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১২ বৎসর বয়সে কটকে আসিয়া উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার একমাত্র বিদ্যালয়—কটক জিলাস্কুলে ভর্তি হন। এই জিলাস্কুলে পরে এফ. এ. পড়ার জন্য দুইটী শ্রেণী যুক্ত হইলেও উহা কিছুকাল কটক জিলাস্কুল নামেই আখ্যাত হইত। পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ বিভাগ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া র‍্যাভেন শ' কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করিল। কটক জিলা স্কুলটি তদবধি কলেজিয়েট স্কুল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এই স্কুলে পাঠকালে প্যারীমোহন-চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির স্বাতন্ত্র্য ছাত্রসমাজে সুপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। পঠদ্দশা হইতেই দেখা গিয়াছিল যে তিনি চিন্তাশীল, সর্বদাই যেন কি ভাবিতেছেন। সেইজন্য সহাধ্যায়িগণের মধ্যে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, প্যারীমোহন অন্যমনস্ক বা খেয়ালী মানুষ। স্বশ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পারিলেও তিনি তীক্ষ্ণ মেধাবলে বার্ষিক পরীক্ষায় কোনক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেন। বাল্যকাল হইতে তিনি ভাবুকজনের ন্যায় নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। অবসর সময়ে যখন অপর ছাত্রগণ খেলাধুলা লইয়া সময় কাটাইতেন, তখন প্যারীমোহন তাঁহার প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত নির্জনে বসিয়া পুস্তক পাঠ অথবা নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। সমভাবাপন্ন বন্ধুগণ ব্যতীত তিনি অন্য কোন সহপাঠীর সহিত কখনও মিশিতেন না। ছাত্র ও শিক্ষকগণ সকলেই তাঁহাকে সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টবক্তা বলিয়া জানিতেন। অনুরোধ উপরোধেও এই বালককে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, তিনি বরং কঠোর দণ্ড স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শিক্ষকের ভয়ে শ্রেণীতে অন্য ছাত্রগণ যখন সত্য গোপন বা মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন,

তিনি স্পষ্ট সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্যারীমোহন কটক হাইস্কুলের সংশ্লিষ্ট কলেজ বিভাগের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। পুরী হইতে আগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মধুসূদনের সহিত এখানেই তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, এবং সেই পরিচয় অচিরে গাঢ়তর হইয়া পরমাত্মীয়তার আকার ধারণ করে। অধ্যাপক হরনাথ ভট্টাচার্যের প্রভাবে ইঁহারা উভয়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। অবকাশ সময়ে এই দুই বন্ধু অন্য ছাত্রদিগের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া না বেড়াইয়া নিভৃতে বসিয়া নানা প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন।

"উৎকলপুত্র" নামে একটি উড়িয়া সংবাদপত্রের নাম সেযুগে উড়িষ্যার অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তৎপূর্বে প্রকাশিত শিশু "উৎকল-দীপিকা"র কলেবর অতি ক্ষুদ্র—মাত্র ৪ পৃষ্ঠা—ছিল। এই উৎকল-দীপিকা গৌরীশঙ্কর রায় কর্তৃক সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইত। তাহাতে সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইতে পারিত না বলিয়া, প্যারীমোহন প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবক আর একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া ছাত্রাবস্থাতেই এই "উৎকলপুত্র" পত্রিকা ১৮৭১ সালে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে প্যারীমোহন ও মধুসূদন এবং পণ্ডিত গোবিন্দ রথ অগ্রণী ছিলেন। প্যারীমোহন এ পত্রের সম্পাদক ও প্রধান উদ্যোক্তারূপে কার্য পরিচালনা করিতেন। এই পত্রিকাতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রণালী (Local Self-Government) প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কটক নগরের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও আবর্জনা পরিষ্করণের ভার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত ছিল। সেকালে 'ফেরী ফাণ্ড', অর্থাৎ কাঠজুড়ি ও মহানদীর পারঘাটগুলির ইজারা প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা উক্ত ব্যয় নির্বাহিত হইত। কটকের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট-ও-কালেক্টরের তত্ত্বাবধানের অভাবে শহর নিতান্ত আবর্জনাপূর্ণ হইয়া পড়াতে প্যারীমোহন ইহার প্রতিকারের জন্য 'উৎকলপুত্র' পত্রিকায় "দরখাস্ত জুতিয়ান" অর্থাৎ 'জুতার আবেদন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন। অতি তেজস্বিনী ভাষায় কটক শহরের এই শোচনীয় দুরবস্থার কথা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধের তীব্রতায় ম্যাজিস্ট্রেট অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কটক উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেডমাস্টার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত প্রবন্ধ-লেখক ছাত্রকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ করেন। চণ্ডীবাবু ছাত্রকে বহিষ্করণ হইতে রক্ষার উপায়রূপে প্যারীমোহনকে সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা সত্যপ্রিয় প্যারিমোহন তাহাতে সম্মত না হইয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে কিছু অযথার্থ কথা আছে কি ? তাহা যখন নাই তখন আমি কদাপি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব না।" ইহার ফলে তাঁহাকে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতে বিদায় লইতে হয় এবং তাঁহার এফ. এ. পরীক্ষা আর দেওয়া হইল না।

সরকারী স্কুল হইতে তাড়িত হওয়াতে তাঁহার মনে এইভাব দৃঢ় হইতে লাগিল যে, এই শহরে আর একটি স্কুল থাকিলে ইহাদের এরূপ যথেচ্ছাচার-মূলক প্রভাব থাকিবে না। এই চিন্তার বশবর্তী হইয়া তিনি একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কপর্দকশূন্য এক যুবকের এই প্রয়াস যে "বামনের চন্দ্রধারণবৎ" উপহসিত হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দৃঢ়চেতা প্যারীমোহন—"Where there is a will there is a way"—মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংকল্পিত কর্মে অগ্রসর হইলেন। এই কার্যে পণ্ডিত গোবিন্দ রথ তাঁহার প্রধান সহযোগী। তৎকালে বক্‌শীবাজারবাসী কৃপানিধি সাহু নামে একজন ধনী মহাজনের একটি পাঠশালা ছিল। এই পাঠশালাটিকে প্রশস্ততর ভিত্তিতে স্থাপন করিবার চেষ্টায় প্যারীমোহন গোবিন্দ রথকে লইয়া কার্যারম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালীতে আকৃষ্ট হইয়া অভিভাবকগণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। ছাত্রদত্ত বেতনে বিদ্যালয়ের ব্যয় অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নির্বাহিত হইবে, এই আশাও দেখা গেল। প্যারীমোহন দীর্ঘকাল এই স্কুলের শিক্ষকতা কার্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। অর্থাগমের চেষ্টায় তিনি কমিশনারের অফিসে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে একটি কেরানীর কার্য গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ সাহায্যে স্কুলের অভাব পূরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বংশীধর মহাপাত্র, যিনি পরে যাজপুর স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়াছিলেন, এই স্কুলে প্রথম হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ এই স্কুলটি একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে

একটি উচ্চ ইংরাজি স্কুলে উন্নীত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় (স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশনেতারূপে যিনি সমগ্র ভারতে পরে সুপরিচিত হন) এই স্কুলের হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৯ বৎসর। প্যারীমোহন, মধুসূদন প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে স্কুলের জন্য কতক উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু প্রয়োজন অনেক, অথচ সম্বল একমাত্র দৃঢ়সঙ্কল্প। প্যারীমোহনের ধনবল ছিল না, কিন্তু মনোবল ছিল অপরিমেয়। মনোবল দৃঢ় থাকিলে ধনের অভাবে যে কার্য বন্ধ থাকে না, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্যারীমোহনের জীবনে দেখিতে পাই। প্যারীমোহন কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যোগাইবার এজেণ্ট হইয়া কমিশন-লব্ধ যে অর্থ পাইতেন, তাহাও এই বিদ্যালয়ে প্রদান করিতেন। সরকারী চাকরীর মাসিক বেতন বাড়িয়া ত্রিশ টাকা হইল; নিজের প্রয়োজনে সামান্য অংশমাত্র ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট তিনি স্কুলে দিয়া দিতেন। অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার অন্তর সর্বদা ব্যাকুল থাকিত। নিজের পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, কিন্তু অপরের জীর্ণবস্ত্র, বা বস্ত্রাভাব দেখিলে নূতন বস্ত্র কত সময় কিনিয়া দিতেন।

উৎকলে সুপরিচিত ফকিরমোহন সেনাপতি মহাশয় এই সময় উড়িষ্যার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য 'ডমপাড়া'র ম্যানেজার ছিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধিকারণে রাজা ও প্রজার মধ্যে বিরোধের ফলে ফকিরমোহন ম্যানেজারের পদ পরিত্যাগ করেন। তখন 'ডমপাড়া'-রাজকুমারের গৃহশিক্ষক প্যারীমোহন মাসিক অর্ধশত মুদ্রা বেতনে এই ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার বন্ধু মধুসূদন উক্ত রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকুমার মানসিংহের গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। 'ডমপাড়া'র তদানীন্তন রাজা রঘুনাথ মানসিংহ একজন যথার্থ গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। উৎকলের তিনটি সুপুত্র—রাধানাথ, ফকিরমোহন ও মধুসূদন—প্রথমজীবনে এই মহানুভব রাজার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ হইতে প্যারীমোহনের এক হস্তে ম্যানেজারের কার্য ও অপর হস্তে কটক একাডেমির (হাইস্কুল) পরিচালন চলিতে লাগিল। ম্যানেজারী কার্যে উপার্জিত অর্থ কটক একাডেমি বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হইত। 'ডমপাড়া'র রাজা এই স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। কিন্তু এই হাইস্কুল হইতে প্রথম বর্ষে

একটি মাত্র ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই প্যারীমোহন অকালে ইহধাম হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি প্যারীমোহন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। অনেক পদস্থ কর্মচারীও তাঁহার এই নির্ভীক স্বভাব ও তেজস্বিতা দেখিয়া তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। কোনও ব্যক্তি অত্যাচরিত হইতেছে দেখিলে তিনি তাহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিতেন।

বাঁকীর তহশীলদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পণ্ডিত গোবিন্দ রথ যে মকদ্দমা করিয়াছিলেন, উহা তৎকালে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। "উৎকল দীপিকা"র অনেক স্তম্ভ এই মকদ্দমার সংবাদে পূর্ণ হইয়া যাইত। প্যারীমোহন স্ববন্ধু গোবিন্দ রথের পক্ষ সমর্থন করিয়া ডমপাড়া হইতে কীভাবে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন নিম্নোদ্ধৃত পত্রটি হইতে উহা জানা যায় :—

"রথে !

যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সাবধান হইয়া কার্য করিবে। সাক্ষীরা যাহাতে ঘটনার যথার্থ বর্ণনা দেয়, সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করিবে না! (বিভাগীয়) কমিশনার সাহেব যে মকদ্দমা স্থানান্তরিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা জানিয়া আমি একটু শঙ্কিত হইতেছি। সাবধান, সাবধান! "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" একথা স্থির জানিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাও। ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে। সকল সংবাদপত্রে এ সংবাদ পাঠাও। কলিকাতায় 'মিরর' ও 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' এই দুইটিতে টেলিগ্রাম দ্বারা সংবাদ দাও যে. বাঁকীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (তহশীলদারের পক্ষাবলম্বন করিয়া) অত্যাচরিতদিগকে ভয় প্রদর্শন করায় কয়েকজন বাঁকীর অধিবাসী কমিশনার সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে (ন্যায় বিচারের অনুরোধে) মকদ্দমাটি স্থানান্তরিত করিয়া বিচার করা হউক; কিন্তু কমিশনার তাহা না করিয়া সাক্ষী তলব করিয়াছেন, ইত্যাদি। মধু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ কর ও সাবধান হইয়া তারে (টেলিগ্রামে) আমাকেও খবর দাও। সন্ধ্যার পর তারে খবর দিলে একটাকায় ছত্রিশটি শব্দ যাইবে। সমস্ত সংবাদ জানাও।

তোমার

২০।৮।৮০

প্যারীমোহন।"

কটকে অবস্থান সময়ে তিনি অনেক সময়ে শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও সত্য ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিতেন। রাজনীতির চর্চা তখন উড়িষ্যার সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু প্যারীমোহন যে ইহার মর্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার কোন কোন কার্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরোপকার কার্যে প্যারীমোহন কেবল অর্থদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, আর্ত ও রোগাতুর লোকের সেবাতেও নিজেকে অকুণ্ঠভাবে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্প কাল পূর্বে পুরী শহরে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্যারীমোহন শুনিলেন যে, জগন্নাথ সড়কে শত শত যাত্রী অচিকিৎসিত ও অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাইতেছে। শুনিয়া প্যারীমোহন অবিলম্বে ঔষধ প্রভৃতি এবং সহকারী লইয়া জগন্নাথ সড়ক দিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন ও যথাসাধ্য কলেরা রোগীদের সেবা করিতে লাগিলেন।

স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্যারীমোহন সর্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। 'উৎকলপুত্র' প্রায় চারবৎসর তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। উৎকলপুত্রের ওজস্বিনী ভাষা সে সময় অনেককে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিত। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াতে অর্থাভাবে কাগজখানি আর চালান গেল না। ইহার পরে তিনি "ওড়িশার ইতিহাস" লেখেন। উৎকল-বন্ধু র‍্যাভেন্‌শ' সাহেবের সময় ১৮৭০ খ্রীঃ ওড়িয়া ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য সরকার পক্ষ হইতে পুরস্কার ঘোষিত হয়। সে সময় কোন কোন লেখক দুই একটি বিষয় লইয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্যারীমোহন ওড়িষ্যার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া বহু পরিশ্রমে তাহা সম্পাদন করেন ও তিনশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক উপকরণ সমৃদ্ধ ও সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন এরূপ পুস্তক ওড়িষ্যায় আর বাহির হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অল্পকাল পরেই ওড়িষ্যার বিদ্যালয়গুলিতে এ পুস্তকের প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়। স্বর্গীয় কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইতিহাসে লিখিত কোন কোন প্রসঙ্গের প্রতিকূলে আপত্তি উত্থাপন করেন। 'উৎকল হিতৈষিণী' পত্রিকাতে ইহার প্রতিবাদগুলি বাহির হইতে থাকে। ক্রমে এই বাদ-প্রতিবাদ এত দীর্ঘ ও তীব্র হইয়া উঠিল যে, স্কুলকর্তৃপক্ষ ইহা আর বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত রাখা সমীচীন মনে করিলেন না।

প্যারীমোহনের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। অনুজ ভ্রাতারা তাঁহার মত চরিত্রবান ছিলেন না, বরং বিপরীত ভাবাপন্নই ছিলেন। সুতরাং সৌভ্রাত্র্যের সুখ শান্তি তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। যৌবনাবস্থাতেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটি মাত্র পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ রক্ষিত হয় নাই।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি 'ডমপাড়ার' রাজার সঙ্গে পারিধি গিয়াছিলেন। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝরণা দেখিয়া সকলের নিষেধ সত্ত্বেও মহানন্দে তাহাতে অবগাহন স্নান করিয়া বসিলেন। পরদিনই অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীঃ ২৩ ডিসেম্বর, শনিবার দিন প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সেইদিনই কটকে ফিরিয়া আসেন। জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, চিকিৎসাতে কোনও উপকার দেখা গেল না। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই সর্বাগ্রে মধুসূদন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্যারীমোহন "তুমি এসেছ" বলিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ দিয়া কয়েক বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। মধুসূদন দিবারাত্রি সেখানেই থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে রোগীর ঔষধ ব্যবহারে অনিচ্ছা ও চিকিৎসাতে অনাস্থা সেইখানে কী উপকার হইবে? বোধহয় তিনি আর ইহধামে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্যারীমোহন বন্ধুগণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন, মাঝে মাঝে কাহারও মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেওয়া, কাহারও হাত দুটিকে নিজের হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকা, অন্তরঙ্গ বন্ধু কাহাকেও পাইলে মধ্যে মধ্যে উর্ধ্বমুখে প্রার্থনাও চলিতেছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে, তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; পরমুহূর্তেই বৈদ্যুতিক আলোক নির্বাণের ন্যায় হঠাৎ সমস্ত অন্ধকার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ২৮শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ণ নয় ঘটিকার সময় মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার এই অকাল মহাপ্রয়াণ ঘটিল।

(গ) বিশ্বনাথ কর—

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ করের অনুজ দুই ভ্রাতা, লোকনাথ ও ভোলানাথ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ উৎকল ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত হইয়া চতুর্ভুজ পট্টনায়কের পরিচালনাধীনে 'সমাজ' ও 'সংস্কারক' নামক মাসিক পত্র-দ্বয়ের সম্পাদনা করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে যে, নিরোল. গ্রামে শিক্ষকতা করিবার জন্য তাঁহাকে কটক ত্যাগ করিতে হয়। তখন ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসব। ঋষিপ্রাণ মধুসূদনের প্রাণস্পর্শী প্রার্থনাতে সেদিন সমাজগৃহ মুখরিত হইতেছিল। মধুসূদনের গম্ভীর ভাবপূর্ণ প্রার্থনা ও উপদেশে বিশ্বনাথের জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। যাহা পাইবার জন্য তিনি এতদিন ব্যাকুল ছিলেন, বিধাতার কৃপায় আজ তাহা পাইলেন। ইহার পর নিরোলের শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া তিনি কটকে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রকাশ্যে উপবীত পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি চিরজীবন ব্রাহ্মধর্ম সাধন ও ব্রাহ্ম আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় বিশ্বনাথ ও তাঁহার অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যে নিদারুণ লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত বীরের ন্যায় তাঁহারা নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। আদর্শচরিত্র মধুসূদনের সদুপদেশ এবং সমবিশ্বাসী সাধুচরণ ও চতুর্ভুজ পট্টনায়ক প্রভৃতির উৎসাহ ও সহানুভূতি সেইসময় ইঁহাদিগের প্রাণে অপূর্ব বল যোগাইয়াছিল। বিশ্বনাথের দ্বিতীয় ভ্রাতা লোকনাথ কটক মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া যাজপুরে চাকুরি করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পরদিনেই বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভ্রাতা ভোলানাথ তৎপূর্বেই উদর-যন্ত্রণা রোগে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। লোকনাথ ও ভোলানাথ হিন্দু সমাজে তৎপূর্বেই বিবাহিত হইয়াছিলেন। লোকনাথের মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নীর বয়স এগার বৎসর, ও ভোলানাথের মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নীর বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল। এই নিদারুণ আঘাতে বিশ্বনাথ একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু অনতিকাল মধ্যে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীর বলে বলীয়ান হইয়া সে আঘাত কাটাইয়া উঠিলেন।

তৎকালীন সামাজিক প্রথানুযায়ী বিশ্বনাথ অল্প বয়সেই বিবাহিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার প্রথম পুত্র মায়াধরের জন্ম হয় তখন বিশ্বনাথের বয়স ২৩ বৎসর। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তিনি তাঁহার সহধর্মিণী জানকী দেবীকে স্বগ্রাম হইতে কটকে আনিবার জন্য বারম্বার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ পিতা তাঁহার একমাত্র বংশধর শিশু পৌত্রকে

ছাড়িতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে জানকী দেবী স্বামীর অনুগমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন বুঝিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু পৌত্রকে নিজের নিকট রাখিয়া পুত্রবধূকে কটকে যাইবার অনুমতি দিলেন। এই সাধ্বী নারী পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের সমস্ত আত্মীয়গণের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ও শিশু পুত্রকে শ্বশুর-শাশুড়ীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। এক অশিক্ষিতা পল্লীবধূর এই ত্যাগ ও আত্ম-বিসর্জন, এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ প্রকৃতই প্রশংসনীয়।

ওড়িষ্যার নানা বিভাগে, বিশেষতঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে, বিশ্বনাথের দান অসামান্য।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে "উৎকল সাহিত্য" মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘ আটত্রিশ বর্ষকাল নানাবিধ বাধা-বিঘ্নের মধ্যে উহার পরিচালনায় বিশ্বনাথ যে নিষ্ঠা ধৈর্য ও মনোবল দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অসাধারণ। জীবনব্যাপী সংগ্রাম দ্বারা আধুনিক উৎকলের সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সাহিত্যিক আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ও তাঁহার সস্নেহ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তদীয় পত্রিকার মাধ্যমে বর্তমান উৎকলে যুগোপযোগী যে নূতন সাহিত্যিক দলের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার লালন-পালনে বিশ্বনাথের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্বনাথের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'উৎকল সাহিত্য' অচিরেই উৎকলের শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে সর্বত্রই এরূপ সমাদৃত হইয়াছিল যে, কোনও লেখকের কবিতা বা প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় স্থান লাভ করিলে লেখকগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। বিশ্বনাথের বীরোচিত সাহস, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব—কি সামাজিক, কি সাহিত্যিক, কি রাজনৈতিক—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুপরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে বহুবার তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং সেখানে স্বাধীনভাবে স্বীয় মত ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিতে কখনও দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ছিল অসাধারণ।

(ঘ) রামকৃষ্ণ রাও—

ইনি মধুসূদনের পত্নী পদ্মাবাঈয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ও মধুসূদনের বৈমাত্রেয় প্রথমা ভগিনী তারাবাঈয়ের স্বামী। ইনিও মধুসূদনের প্রভাবে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের আদর্শ-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

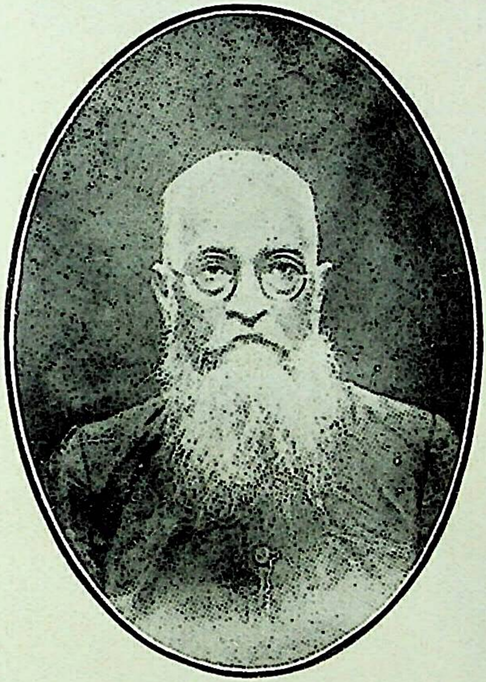

বিশ্বনাথ কর

(উৎকলের অন্যতম ব্রাহ্মনেতা এবং

'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা)

জন্ম—২৪ ডিসেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ ;

মৃত্যু—১৯ অক্টোবর, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

(১৭৮ পৃঃ)

সাধুচরণ রায়—জগন্নাথ রাওয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা

জন্ম—১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ; মৃত্যু—২৯ জুন, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ। (১৭৯ পৃঃ)

(ঙ) সাধুচরণ রায়—

যুবক সাধুচরণও মধুসূদনের জীবন-প্রভাবে উৎকল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। কটক জেলার যাজপুর সব-ডিভিসনের অন্তর্গত কতবাপুর নামক গ্রামে খণ্ডায়েত কুলে অনুমান ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবে মাতৃহীন হওয়াতে কটক-প্রবাসী পিতা দয়ানিধি সুন্দররায়ের উপরেই ইঁহার লালনপালনভার পড়িয়াছিল। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই ইনি কটকে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সাধুচরণ ১৮ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় কলেজে এফ. এ. পড়েন, কিন্তু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে কটক প্যারীমোহন একাডেমীতে ও পরে কটক মিশন হাইস্কুলে শিক্ষকতার কার্য করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গৃহশিক্ষকের কার্যেও তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া ও তাঁহার চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হইয়া গুণগ্রাহী রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুর প্রমুখ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্ব স্ব গৃহে সন্তানগণের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তালচের নামক দেশীয় রাজ্যের নাবালক রাজকুমার শ্রী কিশোরচন্দ্র যখন কটকে পড়িতে আসেন, তখন সাধুচরণ তাহার গৃহশিক্ষক-ও-অভিভাবক-পদে নিযুক্ত হন। ছাত্রদিগের নীতি ও ধর্মশিক্ষার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ছাত্রদিগের অন্তরে নৈতিক সাহস ও ঈশ্বরে প্রীতি জাগাইতে পারিলে তিনি নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

সাধুচরণ উৎকলের নবযুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন। উৎকলের তৎকালীন মাসিক পত্রে ও কয়েকখানি পদ্য ও গদ্য পুস্তকে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। উৎকল সাহিত্য পত্রিকার প্রারম্ভ কালে ইনি তাহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। "নবসম্বাদ" নামক পত্রিকার সম্পাদকতাও তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন। "আশা" পত্রিকার বিষয় পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতা-পুস্তকের মধ্যে 'প্রীতি-কুসুম', 'ভাবকুসুম' ও 'ভাবনা' এবং 'ধ্রুবচরিত' ও 'কৌতুক কাহিনী' তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, দেশপ্রচলিত কুসংস্কার ও সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, পিতা ও অন্যান্য অনেকের নিকট হইতে যথেষ্ট নিগ্রহভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা জানিয়াও অসীম সাহসে তিনি মধুসূদনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের ওড়িয়া অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন।

সাধুচরণ দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন ঘটনা শিক্ষাপ্রদ :

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন প্রাতঃকালে তাঁহার উদরে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়; কটকের তৎকালীন বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের দ্বারা চিকিৎসা চলিতে থাকে। ২৯ তারিখ প্রাতঃকাল হইতে পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং সেই দিন সন্ধ্যাতেই তাঁহার জীবনালোক নির্বাপিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিকটস্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে বলিলেন, "আমাকে ভোলার (বিশ্বনাথ করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) রোগে ধরেছে আর বাঁচবোনা। রবির (জ্যেষ্ঠপুত্র সচ্চিদানন্দের ডাকনাম) লেখাপড়া যেন হয়। ......প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"।

মৃত্যুর মুহূর্তেও তাঁহার মুখাকৃতি কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। মৃতের মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন প্রফুল্ল চিত্তে, প্রসন্ন ভাবে শয়ন করিয়া আছেন। অটল ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর নির্ভরতায় অনুপ্রাণিত না হইলে মৃত্যুকালে মানুষের এরূপ অবস্থা হওয়া অসম্ভব।

(চ) রঘুনাথ সিংহ—

বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত ভদ্রকে ইঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। ইঁহার প্রপিতামহ বালেশ্বরে লবণের কারবার করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম পঞ্চানন সিংহ, ও পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। শৈশবেই রঘুনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। জ্ঞাতিশত্রুদের শত্রুতা ও নানা অবস্থাবিপর্যয়ে রঘুনাথের মাতা শিশু পুত্রকে লইয়া ভদ্রক হইতে কটকে চলিয়া আসেন। এখানেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। যথাসময়ে রঘুনাথ সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া তদানীন্তন মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের অনুজ মধ্যম ভ্রাতা লোকনাথ কর ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। রঘুনাথও লোকনাথের সহিত কটক ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে আরম্ভ করেন। সাধুচরণ রায় ইঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সাধুচরণের সংস্রবে আসিয়া ইঁহারা তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ ও সদুপদেশ লাভ করিতে থাকেন ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। রঘুনাথ সিংহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হওয়াতে মধুসূদনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহাদের

উভয়ের মধ্যে ধর্মপিতা ও ধর্মপুত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং এই সম্বন্ধ আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকে। ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওড়িশ্যাতেই কোন জমিদারের অধীনে কিছুকাল চিকিৎসকের কার্য করার পর রঘুনাথ ব্রহ্মদেশের ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরি লইয়া, অনুমান ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে যান। সেখান হইতে ৩।৪ বৎসর ব্যবধানে কটকে আসিলে মধুসূদনের গৃহে পুত্রের ন্যায় সমাদরে গৃহীত হইতেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আসিয়াছিলেন তখন মধুসূদনের অনুরোধে তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধু 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর চেষ্টায়, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনফুলের সহিত ব্রাহ্মমতে ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি বিবাহিত জীবনে স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী হইয়াছেন। বর্মায় সরকারি চাকুরি লইয়াই রঘুনাথ গিয়াছিলেন, কিন্তু চিকিৎসাকর্মে ইঁহার নৈপুণ্য ক্রমেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং কয়েকটি রোগের প্রতিষেধক ঔষধও ইনি প্রস্তুত করেন। তৎপরে বেসিন সহরে 'বেসিন ফার্মেসী' নামে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ সরকারি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসকের কার্য আরম্ভ করেন। যশস্বী চিকিৎসক ও গণ্যমান্য নাগরিক হিসাবে ইনি বেসিন শহরে প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং বেসিনেই নিজের গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে ধর্মপিপাসু হইয়া যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন তাহা দৃঢ় ভাবে পালন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাঘোৎসবের সময় তাঁহার গৃহে কয়েক দিন ধরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় উপাসনা গান কীর্তন আলোচনাদি হইত। স্থানীয় বহু ভদ্র পুরুষ ও মহিলা ইহাতে যোগদান করিতেন। গৃহটি পত্র পুষ্প ও আলোক মালায় সুসজ্জিত হইত। উপাসনা প্রভৃতির পরে আহারাদির ব্যবস্থাও থাকিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন শহরে ব্রহ্মমন্দির নির্মাণ কার্যে রঘুনাথ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন ও এই কার্যে উদ্যোগী ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে বহু দুঃস্থ ও দুর্গত জন আশ্রয় লাভ করিত। বহু দরিদ্র রোগী বিনা অর্থব্যয়ে তাঁহার নিকট ঔষধ, পথ্য ও আন্তরিক সেবা পাইত। এই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ায় স্থানীয় সর্ব শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে রঘুনাথ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং এ অবস্থায় পায়ে

জুতার কাঁটা ফুটিয়া বিষাক্ত হইয়া যাওয়াতে তেইশ দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর বেসিন শহরে নিজগৃহে দেহত্যাগ করেন।

অনুমান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল ব্রাহ্মসমাজের কার্য পরিচালনার জন্য কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর অনুরূপ একটি নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল। তদনুযায়ী মধুসূদন রাও উহার প্রথম সভাপতি ও প্রধান আচার্য এবং সাধুচরণ রায় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, ইহা একটি নির্দলীয় সমাজরূপে পরিগণিত হইবে। এখানে আদি, নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যে কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।

সাধুচরণের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৯৬ হইতে বিশ্বনাথ কর সম্পাদকের পদে বৃত হইয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক ব্রাহ্ম ভক্ত রাজমোহন বসু সপরিবারে কটক আসিয়া বাস করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যুর পর হইতে বসু মহাশয়, আমৃত্যু (৫।১২।১৯২২) উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও আচার্যের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯২৩ হইতে ৩।৭।২৭ তারিখ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ রাও সভাপতির কাজ করেন। তৎপরে বিশ্বনাথ কর ৩।৭।২৭ হইতে আমৃত্যু (১৯।১০।৩৪) সভাপতি ছিলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ কর সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে রায়সাহেব রঘুনাথ রাও (মধুসূদনের অনুজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া ৪-৭-৪৪ পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদকের কার্য পরিচালনা করেন।

বিশ্বনাথ করের মৃত্যুর পর ১৯-১০-৩৪ তারিখে পুনরায় রামকৃষ্ণ রাও সভাপতি ও প্রধান আচার্য মনোনীত হইয়া ২৯-৮-৪৯ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও তিনি বার্ধক্যনিবন্ধন শেষ কয়েক বর্ষ নিয়মিত সমাজের কাজ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজমোহন বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র বসু দীর্ঘকাল উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। ২৯-৮-৪৯ হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত জয়ন্ত রাও ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজ ও বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ প্রায় একই সময়ে আদি

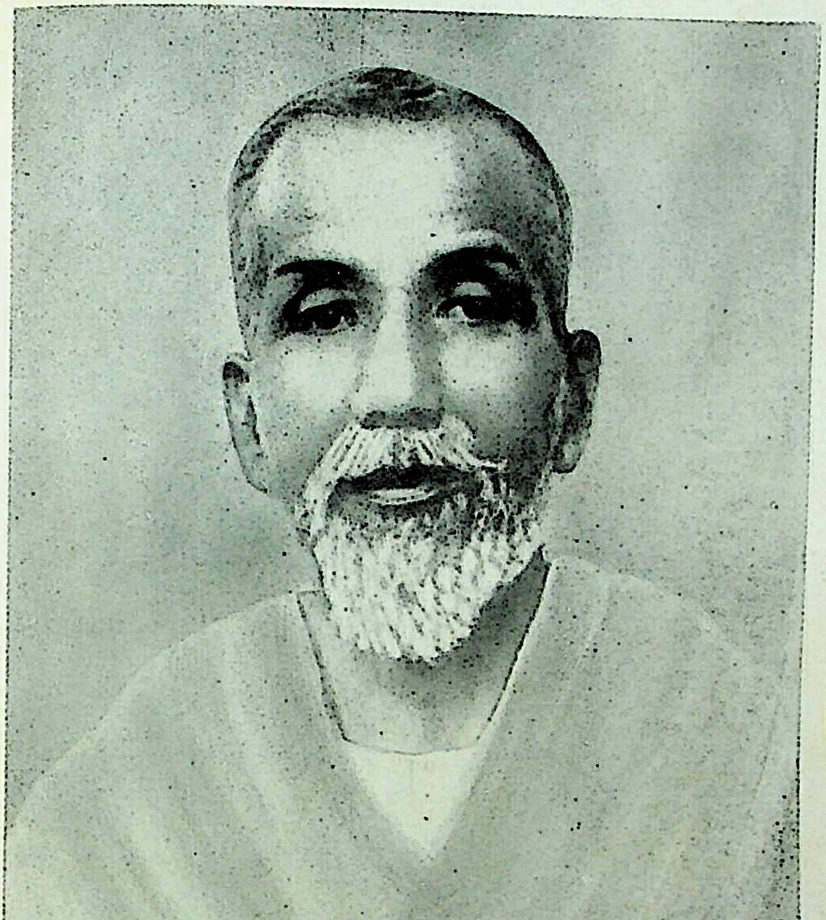

রায় সাহেব রঘুনাথ রাও—ভক্তকবির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
জন্ম—আশ্বিন, ১২৮৩ (১৮৭৬ খৃঃ)
মৃত্যু—২৩ মার্চ, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ।
(১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অধ্যাপক হরনাথ ভট্টাচার্য

(উৎকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা)

জন্ম—অনুমান ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ ; মৃত্যু—১৯৩০ খৃষ্টাব্দ ।

(১৬৯ পৃঃ)

ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়! উভয় স্থানেই পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণ সৌহার্দ্যের সহিত নব্য ব্রাহ্মদলের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলী ও বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলী ঘনিষ্ঠ প্রীতিযোগে যুক্ত ছিলেন। আমার বাল্যস্মৃতিতে তাহার উজ্জ্বল ছবি জাগ্রত আছে। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমার দিদি বাসন্তী দেবীর বিবাহে আচার্য হইয়াছিলেন। তিনি, পদ্মলোচন দাস, ভগবান দাস, উদয়চন্দ্র দে, কালিন্দী কামিলা, প্রসন্নকুমার মিত্র, ভাবগ্রাহী দাস, গোবিন্দ পাণ্ডা, অর্জুন পাকল প্রভৃতি আমার পিতৃগৃহে বিবাহাদি উৎসবে ও উৎকল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব প্রভৃতিতে যোগদান করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সহিত আমার পিতৃগৃহের আত্মীয়তা আমার মনকে এখনও কত প্রীতিরসে পূর্ণ করে।

বালেশ্বর-বাসী প্রসন্নকুমার মিত্র বালবিধবা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেন। এ বিবাহ অনুষ্ঠান আমার পিতৃগৃহে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে আমার ভগিনীপতি বিজয়চন্দ্র মজুমদার আচার্য ও আমার কাকা জগন্নাথ রাও কন্যাকর্তা হইয়াছিলেন। তদবধি এই সরস্বতী দিদি আমার পিতৃগৃহে কন্যার ন্যায় সমাদৃতা ছিলেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা রাজকুমারী দেবীর সহিত কটক নিবাসী ডাক্তার রামকৃষ্ণ সাহুর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়াছিল। রাজকুমারী দেবীও আমাদের দিদিস্থানীয়া ছিলেন। পদ্মলোচন দাস মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে কটকে সস্ত্রীক আসিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্ম পরিবারগুলির সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা বর্ধিত হইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন রাও জেলা স্কুলের শিক্ষকতা কার্যে দেড়বৎসর বালেশ্বরে ছিলেন। ঐ সময় ফকীরমোহন সেনাপতি প্রমুখ স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ যোগ হয় তাহা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল।

ওড়িষ্যা বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত থাকাতে বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্ম কার্যোপলক্ষে ওড়িষ্যায় আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের উপাসনা, সঙ্গীত ও ধর্মালোচনা প্রভৃতি দ্বারা উৎকল ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বহু প্রকারে উপকৃত হইয়াছে। স্যর কে. জি. গুপ্ত আই-সি-এস, তাঁহার জামাতা বি. সি. সেন আই-সি-এস, বি. এল. গুপ্ত আই-সি-এস, এ সি সেন—ইঁহারা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। স্যর কে জি গুপ্তের সহধর্মিণীর যত্নে তাঁহার ভবনে

একটি মহিলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম মহিলাগণ ও স্থানীয় অনেক ভদ্রমহিলাও ইহাতে যোগ দিতেন। মাসে দুইবার ইহার অধিবেশন হইত। ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইত। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইত। স্যর কে. জি. গুপ্ত বদলি হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে মধুসূদনের গৃহে কিছুকাল এই মহিলাসমাজের কাজ চলিবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। স্যর কে. জি. গুপ্ত ওড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার রূপে কটকে অবস্থানের সময় তাঁহার পিতা সাধু ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তও কটকে আসিয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন। বি. এল. গুপ্ত ডিস্ট্রিক্ট-ও-সেশন্স জজরূপে কটকে থাকাকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী গুপ্ত এই ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যোগ দিতেন ও ইহার উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিতেন। ডিস্ট্রিক্ট-ও-সেশন্স জজ এ. সি. সেন একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কটকে থাকা কালে বহু সময় এই সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনায় ও মাঘোৎসবের উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে লইয়া অনুমান ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষ্যায় তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শনের জন্য কটকে আসিয়াছিলেন। তিনিও একদিন এই মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন; সেদিন তিনি প্রথম গানটি করিয়াছিলেন—"কি গাব আমি, কি শুনাব আজি আনন্দধামে, পুরবাসিজনে এনেছি ডেকে তোমারি অমৃত নামে"। এ সি সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সুদক্ষিণা সেন, স্বামীর সহিত দীর্ঘকাল কটকে থাকিয়া স্থানীয় ব্রাহ্ম পরিবারগুলির সহিত গভীর প্রীতিযোগে যুক্ত ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় মহিলা-উৎসব বহু সময় ইঁহার গৃহেই হইত। ইঁহার ভক্তিগদগদ কণ্ঠের সঙ্গীত, "ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে? ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা করে"—এখনও কত সময় আমার মনে জাগে।

বিবিধ কার্য্যোপলক্ষে এবং মধুসূদনের প্রতিষ্ঠিত টাউন ভিক্টোরিআ স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম কটকে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম, যতগুলি স্মরণ হইতেছে, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

টাউন ভিক্টোরিআ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ	অন্যান্য
বিজয়চন্দ্র মজুমদার (প্রধান শিক্ষক)	অধ্যাপক শশিভূষণ দত্ত
অমৃতানন্দ রায়	,, নলিনীকুমার দত্ত
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (প্র. শি)	,, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

টাউন ভিক্টোরিআ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ	অন্যান্য
বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (প্র. শি)	অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ মিত্র
রসরঞ্জন সেন (প্র. শি)	ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক
অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী (প্র. শি)	লালমোহন চট্টোপাধ্যায়
সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক (প্র. শি)	ডাঃ প্রেমানন্দ দাস
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্র. শি)	কুঞ্জবিহারী গুহ
কিশোরীমোহন জোয়ারদার (প্র. শি)	ইন্দুবালা ঘোষাল
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্র. শি)	হরিমোহন ঘোষাল
শ্রীঅমিতাভ গুহ	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
জিতেন্দ্রকুমার হালদার (প্র. শি)	রজনীকান্ত ঘোষ
শ্রীগোলোকচন্দ্র পাইন (প্র. শি)	রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
র‍্যাভেন্‌শ' বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও শিক্ষিকাগণ	অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী
	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী
জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী	শ্রীসত্যভূষণ দাসগুপ্ত
সরোজিনী দত্ত	শ্রীসুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীভক্তিলতা চন্দ	
শ্রীঅমরবালা পাল	
শ্রীঅমিয়বালা পাল	
শ্রীসুবালা রায়	
শ্রীসুফলা রায়	

ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সপরিবারে বাস করিতেন। এই সকল ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদিগের সঙ্গ ও সাহায্য, বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের উচ্চভাব ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনা এবং উপদেশ, দীর্ঘকাল উৎকল ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। স্বর্গীয়া চঞ্চলা দেবী (লালমোহন চট্টোপাধ্যায়ের শাশুড়ীঠাকুরাণী)-ও মধ্যে মধ্যে কটকে আসিয়া কন্যা ও জামাতার সঙ্গে কিছুদিন কাটাইয়া যাইতেন। এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার সঙ্গ ও সাহচর্য স্থানীয় ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের জীবনে কল্যাণকর হইয়াছিল। ভক্তিভাজন শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য ময়মনসিংহ হইতে কটকে আসিয়া কয়েক মাস তাঁহার অধ্যাপিকা কন্যার নিকটে ছিলেন।

মধুসূদনের কনিষ্ঠ সহোদর জগন্নাথ রাওয়ের দ্বিতীয়কন্যা সরস্বতীর সহিত নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতানন্দের বিবাহ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কটকে হয়। এই উপলক্ষে নববিধান সমাজের বহু বিশিষ্ট আচার্য, প্রচারক ও উচ্চশিক্ষিত যুবক অধ্যাপকগণ কটকে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপাসনা, সঙ্গীত, বক্তৃতা, প্রভৃতি দ্বারা উৎকল ব্রাহ্মমণ্ডলীর বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল মধুসূদনের দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তীর সহিত সম্পন্ন হয়। সেই উপলক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়, আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, কুঞ্জলাল ঘোষ, বিদ্যাসাগর-চরিত রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মগণ কটকে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের আগমনে—তাঁহাদের উপাসনা আলোচনাদিতে যোগদান করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণ উপকৃত হইয়াছিলেন। বিবাহের পরদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয় বায়ুপরিবর্তনের জন্য কটকে ও ভুবনেশ্বরে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনাও মধ্যে মধ্যে করিতেন। তাঁহার কটকে অবস্থানের সময় স্থানীয় ব্রাহ্মগণ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার গৃহে মিলিত হইতেন। বহু প্রকার সদালোচনা হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এবং ভারতববর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বহুপ্রচারক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগমনে উৎকল ব্রাহ্মসমাজ বহুভাবে উপকৃত হইয়াছে।

বেণীমাধব দাস মহাশয় র‍্যাভেন্‌শ' স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে কটকে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই সাধু ভক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মের জীবন-প্রভাব ওড়িষ্যার ছাত্র ও জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছিল। উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার গভীর যোগ ছিল। ইনিও স্থানীয় মন্দিরে উপাসনা করিতেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুলে ইঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বেণীমাধব দাস মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শশীভূষণ মজুমদার ওড়িষ্যার সাধারণ পূর্ত বিভাগে (P. W. D.) দীর্ঘকাল ইঞ্জিনীয়ারের কার্য করিয়াছিলেন। উৎকল ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে একটি কাষ্ঠনির্মিত বেদীতে আচার্য বসিয়া উপাসনা করিতেন ও মাটিতে সতরঞ্চি

ও মাদুরের উপর বসিয়া উপাসকগণ উপাসনায় যোগ দিতেন। শশীভূষণ মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে আচার্যের বসিবার জন্য ইষ্টক নির্মিত বেদী ও উপাসকদিগের জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এই ইষ্টক নির্মিত বেদী ভাঙ্গিয়া বর্তমানে কাষ্ঠনির্মিত বেদীটি স্থাপন করা হইয়াছে। শশীবাবুর সহধর্মিণী জ্ঞানদা মজুমদারের চেষ্টায় একটি নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি রবিবার সকালে বালক বালিকাগণকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। শশীবাবু কটক হইতে বদলি হইয়া যখন অন্যত্র গেলেন তখন এই নীতি-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহাদিগকে বিদায় অভিনন্দন দেয়। এই উপলক্ষ্যে মধুসূদনের রচিত একটি কবিতা বিমল দাস (বেণীমাধব দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং এই নীতিবিদ্যালয়ের ছাত্র) আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আবৃত্তিটি এতই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে জ্ঞানদা দেবী তাহা শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। আবৃত্তির কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পূজনীয়া শ্রীমতী—

জ্ঞানদা মজুমদার মহাশয়া—

শ্রীচরণকমলেষু

মাতৃসমা স্নেহময়ি! যাইতেছ চলে
বিধির নির্দেশে, পতিসনে অন্যস্থলে।
তব স্নেহ-পুণ্য-সুধা আমাদের প্রাণ
কত সুখে এতকাল করিয়াছে পান!
কত যত্ন আমাদের মঙ্গলের তরে
করিয়াছ দয়াময়ি, প্রফুল্ল অন্তরে!
ক্ষমিয়াছ কত দোষ, হরিয়াছ ব্যথা,
শিখায়েছ কত ভাল কত পুণ্য কথা!
তব পতি দেব আহা কতই যতন
করেছেন আমাদের হিতের কারণ!
করুণা আপনাদের স্মরি ভক্তিভরে
নমি শ্রীচরণে আজি বিদায় বাসরে।

—রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের

৬ই জুলাই, ১৯০৫, কটক — ভূতপূর্ব এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীগণ।

২। বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ

ওড়িষ্যা দীর্ঘকাল মোগলবন্দী ও গড়জাত এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কটক, পুরী ও বালেশ্বর এই তিনটি জেলা মোগলবন্দীর অন্তর্গত। বালেশ্বর বঙ্গদেশের নিকটবর্তী। বালেশ্বর পর্বত নদী সমুদ্র ও বনরাজির সম্পদপূর্ণ; ইহা একসময় ব্যবসাবাণিজ্যেও সমৃদ্ধ ছিল।

১৮৬৩ বা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ঈশানচন্দ্র বসু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে বালেশ্বরে আসেন। তিনি সন্ধ্যার সময় ফকীরমোহন সেনাপতি, গোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক প্রভৃতিকে লইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। কিছুদিন পরে নিমকমহালের কেরাণীর কর্মে প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় বালেশ্বরে আসিলে রবিবার সন্ধ্যায় তাঁহার বাসায় ইঁহারা মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন। তৎপরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা রাজকোঠা উদ্যানস্থিত ভগ্ন দ্বিতল বাটীতে উপাসনার ব্যবস্থা করেন। তখন ইহা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাঁহারা ইহাকে হিন্দুধর্ম ও জাতিভেদের বিরোধী দেখিয়া ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করেন। যুবকগণ তৎপরে একটি মাটির চালাঘর নির্মাণ করিয়া সেখানেই উপাসনা করিতেন।

ঈশ্বরকৃপায় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকটি বিপথগামী ছাত্রের হৃদয় ব্রাহ্মদের জীবনপ্রভাবে পরিবর্তিত হয় এবং তাহারা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন ভগবানচন্দ্র দাস, রমানাথ দাস, উদয়চন্দ্র দে, রাধামোহন সেনাপতি ও সুদর্শন দাস। ভগবানচন্দ্র দাস শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিলেন। পিতা মদনমোহন বৈষয়িক কার্যে ব্যস্ত থাকায় পুত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। ধনীর সন্তান ভগবান দাস এই সুযোগে কুসঙ্গে মিশিতেন। একদিন পিতার তিরস্কারে রাগ করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পদব্রজে তাঁহাকে পথ চলিতে দেখিয়া ফকীরমোহন সেনাপতি তাঁহাকে নিজের গরুর গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। তিনিও কলিকাতায় যাইতেছিলেন; তখন রেলপথ ছিল না। ফকীরমোহন সেনাপতি ভগবানচন্দ্রকে অনেক বুঝাইলেন। কলিকাতায় গিয়া ভগবান বাবু তাঁহাদের তত্রত্য গদিতে রহিলেন। ফকীর মোহন বাবু তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন পথে একখানি দুই পয়সা দামের উপাসনা প্রণালী ভগবানচন্দ্রের হস্তগত হইল। তিনি তাহা বারবার পাঠ করিলেন ও

নিজ জীবনের কথা ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। পরে ব্রহ্মানন্দের উপাসনায় যোগ দিয়া তিনি যেন নব জীবন লাভ করিলেন। ভগবানচন্দ্র বালেশ্বরে ফিরিয়া বারবাটীস্থ স্বীয় গৃহে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের (১৮৬৯ খ্রীঃ) ২৯শে আষাঢ়, শনিবার রমানাথ দাস, উদয়চন্দ্র দে প্রভৃতি কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন। উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না। সকলে একত্র বসিতেন, নিজেদের অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিতেন। রাজা রামমোহন রায় রচিত সঙ্গীত গাহিতেন। উপাসনা দ্বারা তাঁহারা প্রাণে সান্ত্বনা ও বললাভ করিতে লাগিলেন।

সাধারণ লোকে ইঁহাদিগকে বিধর্মী বলিয়া রটনা করিয়া, ইঁহাদের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বিশেষতঃ ভগবান বাবুর পিতা মদনবাবুর নিকট গিয়া পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু মদনবাবু বলিলেন, যে-ধর্ম মানুষকে কুপথ হইতে সুপথে আনিতে পারে তাহা কখনও মন্দ নহে।

বালেশ্বরে ইতিপূর্বে যে আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, এই যুবক দল সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে উপাসনা করিবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিয়া তাহা পাওয়াতে প্রতি শনিবার ইঁহারা ঐ গৃহে উপাসনা করিতে লাগিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বালেশ্বরের সভ্যগণ রবিবারেই উপাসনা করিতেন। পরে ইঁহারা ঐ গৃহে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ এই যুবকেরা অতি সমারোহে বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিলেন। তাহাতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এমনকি স্থানীয় আমেরিকান খৃষ্টীয় ব্যাপটিস্ট মিশনারীরাও যোগ দিয়াছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য জগবন্ধু ঘোষ কটকে বদলি হইয়া গেলে ঐ সমাজভুক্ত সভ্যগণ তাঁহাদের কাগজপত্র ও পুস্তকাদি সমেত সমাজগৃহ নব্যদলের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তদবধি এই মিলিত সমাজের নাম 'বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ' হইল। নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইল ও শনিবারের পরিবর্তে রবিবারে উপাসনা হইতে লাগিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত বালেশ্বরে আসেন। তিনি এখানে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী প্রচলন করেন। সেই সময়ে বালীনিবাসী নীলমণিকান্ত কোঁয়ার বালেশ্বর জেলার সাধারণ পূর্ত বিভাগে

কার্য করিতেন। প্রতি রবিবার ১৮ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া তিনি উপাসনায় যোগ দিতেন ; ব্রাহ্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত ইঁহার জীবনের সঙ্গপ্রভাবে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ উপকৃত হইতেন।

এই সময় ব্রাহ্মগণ কর্তৃক কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান—যথা, মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়, নৌবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, তত্ত্ববোধিনী সভা, সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে মাটির উপাসনা গৃহটি ভাঙ্গিয়া যায়। তখন হইতে একটি ইষ্টক নির্মিত উপাসনা গৃহ নির্মাণের জন্য, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ চলিতে থাকে। কুমার (পরে মহারাজা) বৈকুণ্ঠনাথ দে, নিজে হিন্দু হইলেও, এই মন্দির নির্মাণ কার্যে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। রাণী স্বর্ণময়ী ও লক্ষণনাথের তৎকালীন জমিদার রায়মহাশয়ের দানও উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলেও, মন্দির নির্মাণের উপযুক্ত জমি শীঘ্র পাওয়া গেল না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বরের পুরাতন জিলা স্কুলের নিকটবর্তী গুড়িপুকুরস্থিত রমণীয় স্থানটি নির্বাচিত হয় এবং নূতন মন্দির-গৃহ নির্মিত হইয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে (আষাঢ়) মহা সমারোহে নূতন মন্দিরে গৃহ-প্রবেশ-উৎসব সম্পন্ন হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্দিষ্ট উপাসনা গৃহ না থাকিলেও ব্রাহ্মমণ্ডলী ভগবৎ কৃপায় আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে যুবক-ব্রাহ্ম দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক ছিলেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ধর্মপ্রচার নিমিত্ত কয়েকবার বালেশ্বরে আসিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মাঘ ও আষাঢ় মাসে স্থানীয় জমিদারদিগের বাগানবাড়ীতে সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইত। উৎসবের উপাসনা, নগরকীর্তন ও বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করিত। রাস্তায় প্রকাশ্য স্থানে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত। এই উপাসনা ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার জন্য বহু লোক শহর ও মফঃস্বল হইতে আসিয়া ব্রাহ্মদিগের সহিত যোগ দিতেন। ক্রমে বিভিন্ন স্থানে শাখা সমাজও স্থাপিত হইয়াছিল।

পতিতপাবন পরমেশ্বরের কৃপায় কুপথগামী কতকগুলি যুবকের ব্রাহ্মধর্ম-প্রভাবে জীবন পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কালিন্দী কামিলা

নামে একটি দুষ্ক্রিয়াসক্ত যুবকের জীবনে আশ্চর্যভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দস্যু রত্নাকরের জীবন পরিবর্তিত হইয়া তিনি ঋষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, এ কাহিনী রামায়ণে সকলেই পড়িয়াছেন। কালিন্দী কামিলার জীবনের তদনুরূপ পরিবর্তন তৎকালে বালেশ্বরবাসিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নানাপ্রকার নেশায় আসক্ত কালিন্দী কামিলা একদিন মাতাল হইয়া নর্দমার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। শেষ রাত্রে কালীপ্রসাদ দাস নামক জনৈক ব্রাহ্ম উপাসনান্তে—"ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ এই দীনহীন দুর্বল সন্তানে"—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত এই গানটি গাহিতেছিলেন। শুভক্ষণে কালিন্দী কামিলার কর্ণে এই গানটি প্রবেশ করিল। এই গানটি যতই শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। পরে তিনি কালীবাবুর নিকট গিয়া সেই সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ লিখাইয়া লইয়া আসিলেন :—

ওহে দীননাথ, কর আশীর্বাদ এই দীন হীন দুর্বল সন্তানে,
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির-ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে বলব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমায় সেবিব, পাপের কুমন্ত্রনা আর না শুনিব ;
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক এ জীবনে।
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয় বিপদকালে, ডাকব পিতা ব'লে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে।

অনুতাপে জর্জরিত কালিন্দী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, অভ্যস্ত সকল পাপের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত দারুণ সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়া, নবজীবন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সংগ্রামে তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িল, আত্মীয়-বন্ধুগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ; কেহ কেহ এতদিনের অভ্যস্ত মাদকদ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ করিলে বাঁচিবেনা বলিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিতে বলিলেন ; কিন্তু কালিন্দী অটল! সঙ্গীতে যে উক্ত হইয়াছে—"নির্ভয় অন্তরে বলব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে"—ইহা তাঁহার জীবনে তাঁহার জীবন-দেবতার কৃপায় প্রমাণিত হইয়াছিল।

কালিন্দী প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করিলেও, ইহাঁর পিতা পিতামহ প্রভৃতির চিকিৎসা বিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান ছিল, কালিন্দীও সে বিষয়ে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। কারিগরি বিদ্যাতেও

তাঁহার আশ্চর্য পটুতা ছিল। নববিধান পতাকায় ধর্মসমন্বয়ের যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়, তাহা কালিন্দীবাবুর চিন্তা-প্রসূত।

পণ্ডিত পদ্মলোচন দাস সস্ত্রীক স্বীয় জমিদারী ও বাসস্থান উড়িঙ্গ ছাড়িয়া নদীর অপর পারে সিন্ধিয়া গ্রামে যোগাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের চেষ্টায় মফঃস্বলের শাখা-সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান দাস এবং কালিন্দী কামিলা বিদেশেও প্রচার-যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মুদিয়ালীর কৃষ্ণবিহারী দেবের কন্যা সুশীলার সহিত রমানাথ দাসের বিবাহ হয়। ইহা ১৮৭২ খ্রীঃ তিন আইন অনুসারে রেজিস্ট্রী করা হইয়াছিল। ইহাই উড়িষ্যায় প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ।

অমরাগড়ির ফকীরদাস রায়, আশুতোষ রায়, অখিলচন্দ্র রায়, হরলাল রায়, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ও কেশবচন্দ্রের অনুগামী কলিকাতাবাসী নববিধান সমাজের ভক্তগণ অনেক সময়ে বালেশ্বরে আসিয়া সমাজের কাজে যোগদান করিতেন। পরে ভগবানচন্দ্র দাস নন্দলাল বাবুকে বালেশ্বরে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচারক রূপে আহ্বান করিয়া আনেন। বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নূতন নামকরণ সম্বন্ধে নন্দলাল প্রমুখ কয়েকজনের সহিত অন্য ব্রাহ্মদের মতবিরোধ হওয়াতে নন্দলাল পৃথকভাবে বর্তমান "উৎকল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরটি" নির্মাণ করিতে যত্নবান হন। সর্বপ্রথম রাজাকোঠায় যে উদ্যানের ভগ্নবাটিতে আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই উদ্যানটি নন্দবাবু ময়ূরভঞ্জের তৎকালীন মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেওর নিকট হইতে সনন্দসূত্রে পাইলেন ও রামচন্দ্র ভঞ্জ প্রমুখ গড়জাতের অন্যান্য রাজাদের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তিনি নববিধান মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। অর্ধনির্মিত উপাসনা গৃহেই নন্দলাল বাবু উপাসনা করিতেন। সেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও ঔষধ বিতরণ কার্যও করিতেন। নন্দলালের পুত্র নগেন্দ্রনাথের সহিত পদ্মলোচন দাসের কন্যা ইন্দিরার বিবাহ হইয়াছিল ও উৎকলীয় ডাক্তার রামকৃষ্ণ সাহুর সহিত ইঁহার কন্যা রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল।

নন্দলাল বাবুর মৃত্যুর পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ ও উৎকল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের সভ্যগণ মিলিত সমাজের নাম রাখিলেন "বালেশ্বর উৎকল নববিধান ব্রহ্মমন্দির"; উভয় সমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া তখন অর্ধনির্মিত মন্দিরেই উপাসনা করিতেন।

এই সময়ে কলিকাতা হইতে ভাই বিহারীলাল সেন বালেশ্বরে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। তাঁহার, নগেন্দ্রনাথের ও ভগবানচন্দ্রের চেষ্টায়, অর্ধনির্মিত মন্দিরটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করা হয়।

পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় উৎকল নববিধান মণ্ডলী ও বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ পৃথক হইয়া যায়। বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তখন বাধ্য হইয়া ভূমিকম্পে বিদীর্ণ তাঁহাদের মন্দিরটি মেরামত করিয়া তাহাতে ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উপাসনা আরম্ভ করেন। মন্দিরটী মেরামত না হওয়া পর্যন্ত রবিবাসরীয় উপাসনা ভগবানচন্দ্রের গৃহেই হইত। দুইটি ব্রাহ্মসমাজ পৃথক হইলেও এখানে সাম্প্রদায়িকতার ভাব কাহারও মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। প্রসন্নকুমার মিত্র, বরদাকান্ত বর্ধন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হইলেও দুই সমাজেই আজীবন উপাসনা ও সম্পাদকের কার্য করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বিশাল, উদয়চন্দ্র দে, রমানাথ দাসের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ দাস চিরজীবন নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। বালেশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ বরাবর নবনিধান মন্দিরে যোগ দিয়াছেন ও চাঁদা দিয়াছেন।

এইখানকার উপাসনা-কীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের কয়েকজনের বাসস্থানসহ নামোল্লেখ করা হইল: কালিন্দী কামিলা (নুয়াপর), সোমনাথ সামন্ত (আজিমাবাদ), অর্জুন পাকল (অমরা), সীতারাম দাস, বৈদ্যনাথ পাকল (সরিষাকোঠা), কালীপ্রসাদ দাস (মাণিকখম্ব), বংশীধর (ডিমদিয়া), ধ্রুবকর (ডুমরিয়া) বৈষ্ণব মাঝি (নলকুল), ভাবগ্রাহী দাস (কটক)।

নন্দলাল বাবুর একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আজীবন ব্রাহ্মসমাজ ও দেশের সেবা করিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে বহু বাহ্ম বালেশ্বরে আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন এবং উৎসবে উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই সমাজকে শক্তিশালী করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অধিকাংশের নাম উল্লিখিত হইল: দ্বিজদাস দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ বসু, নীলমণিকান্ত কোঁয়ার, মধুসূদন রাও, লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়ক, সত্যরঞ্জন খাস্তগীর, হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীর, ডাক্তার শ্রীজয়ন্ত রাও, সচ্চিদানন্দ রায়, শ্রীসুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়, রামলাল ব্যানার্জি, বরদাপ্রসন্ন রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কাশীমোহন ঘোষাল, হরিমোহন ঘোষাল, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র সরকার,

অখিলচন্দ্র রায়, প্রেমসুন্দর বসু, প্রেমেন্দ্র রায়, গৌরগোবিন্দ রায়—উপাধ্যায়, অমৃতলাল গুপ্ত, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, রসিকলাল রায়, ব্রজগোপাল নিয়োগী, অনুকূল মিত্র, আশুতোষ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, রাজকুমার ঘোষ, বিশ্বনাথ কর, পিঠাপুরের প্রিন্সিপাল ডঃ রামকৃষ্ণ রাও, অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রভৃতি।

৭০ বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন ব্রাহ্মবন্ধুগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসম্মিলনী, যাহা বর্ষে বর্ষে শারদীয় অবকাশের সময় পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে—তাহার ৭১তম অধিবেশন গত ১৯৬১ খ্রীঃ ২১শে অক্টোবর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত ওড়িষ্যার বালেশ্বর শহরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডক্টর কালিদাস নাগ সভাপতি ও বালেশ্বরবাসী প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ছায়াময়ী দাসের উৎসাহ এবং অধিবেশনের আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া অধিবেশনটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সকল কার্যের মূলে তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন আশ্চর্যভাবে সফল হইয়াছে। ঈশ্বরকৃপায় এই ছোট শহরটিতে এই ব্রাহ্মসম্মিলনী স্থানীয় সকলের সহযোগিতায়, অপূর্ব মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ওড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে ও অন্যান্য নানা প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মসম্মিলনী তাঁহাদের প্রাণে নূতন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

৩। বারিপদা ব্রাহ্মসমাজ—

ওড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যগুলির মধ্যে ময়ূরভঞ্জ একটি বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্য; ইহার রাজধানীর নাম বারিপদা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর গড়জাতের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আর স্বতন্ত্র থাকে নাই। এগুলি বর্ত্তমানে ওড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্রের অনুগামী প্রচারক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বালেশ্বরে স্থায়ী প্রচারক রূপে কার্য করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার নাতবৌ শ্রীমতী সুধা ব্যানার্জি লিখিয়াছেন—"প্রথম জীবনে তাঁহার জীবন লক্ষ্যহীন ভাবেই কাটিত। পরে প্রচারক ভাই অমৃতলাল বসুর চেষ্টায় ও যত্নে কলিকাতায়

আসিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে নন্দলালের জীবনের পরিবর্তন হয় ও তিনি ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্য গ্রহণ করেন এবং পূর্ণোদ্যমে এক-ঈশ্বরের পূজা প্রচলন করিবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষ্যাকে তাঁহার প্রচারক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্নিময় জীবন-সংস্পর্শে বালেশ্বরবাসী অনেকে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হন। তাঁহার ভক্তিভাবপূর্ণ সুললিত কণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিত। বালেশ্বর হইতে অনেক সময় তিনি বারিপদায় আসিতেন। এখানে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও কীর্তনাদি করিতেন। ইহাতে অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জও এই উপাসনা ও কীর্তনে যোগ দিতেন। এইভাবে তিনিও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। তখন উপাসনায় সকলে মিলিত হইবার জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থান সেখানে ছিল না। পরে মহারাজা বারিপদার মধ্যবর্তী এক খণ্ড নিষ্কর জমি ও গৃহনির্মাণের জন্য কিছু অর্থ সাহায্যও করেন। একটি গৃহ নির্মিত হয়, কিন্তু তখন উহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা সুচারু দেবীর সহিত মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জের বিবাহ হয়। আটবৎসর পরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দৈব দুর্বিপাকে মহারাজা পরলোকগমন করেন। তৎপরে মহারানী সুচারু দেবীর ইচ্ছায় ও অর্থসাহায্যে এই মন্দিরগৃহটি সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ করা হয়।

বারিপদার এই নববিধান মন্দিরে সমন্বয়ের প্রতীক নববিধান নিশান স্থাপন করা হয়। প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরের সংলগ্ন জমিতে অতি সুন্দর ভাবে ফুলের বাগান করা হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষে বালেশ্বর ও কলিকাতা হইতে বহু ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া যোগ দেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় আচার্যের কার্য করেন। তদবধি প্রতি বৎসর—২৬শে জুলাই এই মন্দিরের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সাপ্তাহিক উপাসনা, পাঠ, ইত্যাদিও নিয়মিত হইতেছে। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই বালেশ্বরে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং বারিপদার মন্দিরটি সম্পূর্ণ হওয়া তিনি দেখিতে পারেন নাই।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধর্মপ্রাণ কর্মবীর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার আদর্শের অনুগামী হইয়া কলিকাতায় একবার মাঘোৎসবের দিনে (১১ই

মাঘ) ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের নিকট প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি বারিপদায় বাস করিয়া একনিষ্ঠ সেবকরূপে আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। নবসংহিতা পুস্তক তিনি ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। তাঁহার পিতৃদেব নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিও 'জীবন সঙ্গীত' নাম দিয়া মুদ্রিত করেন। ২৫ বৎসর সরকারি চাকুরি করার পর, পেন্‌শন লইবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে ও সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হরিজনদিগের উন্নতির জন্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কার্যে তিনি বহু পরিশ্রম করিতেন। দরিদ্র বালক বালিকাদিগের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে পড়াইতেন। ব্রহ্মসঙ্গীত শিখাইতেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর, ৯৬ বৎসর বয়সে, বারিপদাস্থ নিজ আবাসে সজ্ঞানে জগজ্জননীর নাম করিতে করিতে নগেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ অধুনা এই বারিপদা মন্দিরের সম্পাদক। এই মন্দিরে যাহাতে তাঁর পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতি অক্ষুণ্ন থাকে, সেজন্য সর্বদাই তিনি যত্ন করেন। মহারাণী সুচারুদেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠার বহু পরে বারিপদায় দুইবার আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বেলঘরিয়া প্রাসাদে ছিলেন। তিনি এই মন্দিরকে তীর্থস্থান মনে করিতেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময়, অবনত মস্তকে, তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি নিয়মিত মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর হইতে তাঁহার কন্যা রানীসাহেবা শ্রীমতী জয়তী দেবীর ব্যবস্থায় নিয়মিত মাসিক সাহায্য আসিতেছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বরে যে ৭১তম ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনের পরে ২৮শে অক্টোবর বালেশ্বর হইতে প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মবন্ধু মহিলাগণ সহ বারিপদায় আসেন। পুষ্পউদ্যানে পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত এই ব্রহ্মমন্দিরটি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন। মধ্যাহ্নে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় কীর্তন করেন ও আরাধনার পর বারিপদা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ, নববিধান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাহার পর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার বর্গের

আতিথেয়তায় আদরে ও যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়া সমাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণ ফিরিয়া যান।

৪। গঞ্জাম ব্রাহ্মসমাজ

গঞ্জাম অঞ্চলে যাঁহারা ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম—আর. বালকৃষ্ণ রাও, এন. জগন্নাথ রাও, জয়মঙ্গল রথ, কৃপাসিন্ধু পাণ্ডা, মাস্টার সন্নেইয়া পান্তলু, শ্রীশরৎচন্দ্র মহাপাত্র, শ্রীমহেন্দ্র পট্টনায়ক, শ্রীঈশ্বরসাহু প্রভৃতি। বর্তমানে শ্রীউদ্ধবচরণ এই অঞ্চলে প্রচার কার্যে নিযুক্ত আছেন।

বেরহামপুর (ব্রহ্মপুর) ব্রাহ্মসমাজ—প্রধানতঃ আর বালকৃষ্ণ রাও ও এন জগন্নাথ রাও এই ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোক্তা কর্মী ছিলেন। ইঁহারা দুজনেই কলিকাতা সাধনাশ্রমে কিছুদিন থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। পরিশেষে পরিচারকব্রত গ্রহণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মী হিসাবে এই অঞ্চলে প্রচারকর্মে নিযুক্ত হন। ব্রহ্মমন্দির কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তবে উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের সকলের প্রচেষ্টাতেই মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। বালকৃষ্ণ রাও ত্যাগী ও সাধক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সুন্দরাম্মা ব্রাহ্মসমাজের সংলগ্ন গৃহে তাঁহার পুত্রসহ অবস্থান করিতেছেন ও মন্দিরের কাজ চালাইতেছেন। তাঁহার কাজ তেলুগুভাষা-ভাষীদের মধ্যেই আবদ্ধ—ওড়িয়া-ভাষীদের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

ব্রহ্মপুরে, ধানমেরাসাহি ও মৃদিঙ্গাসাহিতে আরও দুইটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল সন্নেইয়া মাস্টারের চেষ্টায়। তিনি সাধু ও দেশপ্রেমিক ছিলেন ; স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে কারারুদ্ধ হন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রীও মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সংবাদ শুনিবামাত্র দেহত্যাগ করেন। সন্নেইয়া পান্তলু সাধনাশ্রমে কিছুদিন থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

সুরলাকে কেন্দ্র করিয়া জয়মঙ্গল রথ সুরলা, বড়সাহি, বৈরাণী (বর্তমানে কচি স্বর্যনগর), নুআপ ভাতে প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি সুগায়ক এবং সংগঠন কার্যেও দক্ষ ছিলেন। হরিজন-দের সেবার জন্য তিনি "পতিতপাবন মিশন" প্রতিষ্ঠা করেন ও সুরলাতে

উহার কেন্দ্র স্থাপন করেন। হরিজনদের উন্নয়নের নানা প্রচেষ্টার মধ্যে উহাদের জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু স্থানে নিয়মিত উপাসনাদি হইতে থাকে। তাঁহার অবর্তমানে সমস্ত কাজ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের কয়েকজন যুবককে তিনি ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার শিক্ষার গুণে বর্তমানে বিশিষ্ট সমাজ সেবকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

গোপালপুর—জয়মঙ্গল রথের চেষ্টায় এখানেও একটি উপাসক মণ্ডলী প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে উহা উঠিয়া যায়। কিছুদিন পরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন সম্পাদক, হরকান্ত বসু মহাশয়, সাগরকূলে নির্জন সাধনের জন্য একটি সাধনাশ্রম গৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানে বহুদিন বাস করেন। তিনি ঐ গৃহটিকে পরে ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ব্রাহ্ম সাধনার্থীদের জন্য একটি ট্রাস্ট করিয়া অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমানে গঞ্জাম অঞ্চলে ডাঃ উদ্ধবচরণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও সেবার কার্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজ ও আড়িয়াদহ সাধনাশ্রমের সংলগ্ন দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকরূপে কয়েক বৎসর শ্রীমন্মথনাথ দাসগুপ্ত (হাজারীবাগ) ও শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্যের (আড়িয়াদহ) সঙ্গে বাস করেন। পরে সপরিবারে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এখন তাঁহার চেষ্টায় মৃদিঙ্গাসাহি ও বড়সাহিতে নিয়মিত উপাসনা হইতেছে।

নিম্নখণ্ডিতেও একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ধানমেরাসাহির উপাসনা গৃহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন গৃহ নির্মিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রামেও তিনি প্রচার যাত্রা করিতেছেন ও পুনর্বার উপাসক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত রাউতোপেন্ত-সাহিতে নিজ বাস-গৃহে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় হাজারীবাগের মন্মথবাবুর সাহায্যে চালাইতেছেন।

৫। পুরী ব্রাহ্মসমাজ

ডাঃ প্রেমানন্দ দাস পুরীর সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালের মে মাসে মারা যান। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে শ্মশানে স্থানীয় ও কলিকাতা হইতে আগত কয়েকজন ব্রাহ্ম একত্রিত হন। তাঁহারাই পুরীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন।

তখন স্থানীয় ব্রাহ্মদের মধ্যে ছিলেন মিঃ বি. সি. সেন (ওড়িষ্যার কমিশনার) মিঃ এন্ সেনাপতি (পুরীর কলেক্টর), মিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়ক (পুরীর সাব-জজ), ডাঃ মিস্ যামিনী সেন ও তাঁর বোন মিসেস কামিনী রায়, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এবং ডাঃ দিনকর রাও। ইঁহারা ডাঃ মিস্ যামিনী সেনের বাড়ীতে বারে বারে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন এবং পরে স্থির করেন যে, পুরীতে সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এক খণ্ড নিষ্কর জমি ওড়িষ্যা সরকারের নিকট প্রার্থনা করা হইবে। এই সময় স্থানীয় ও কলিকাতাস্থ কয়েকজন ব্রাহ্মকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করা হয়।

এই জমির জন্য কটকের রায়সাহেব রঘুনাথ রাও ও বিশ্বনাথ কর মহোদয়গণ বহু চেষ্টা করেন এবং পরে জমি পাওয়া যায়। তারপর Universal Religious Mission of the New Dispensation নাম দিয়া রেজিষ্ট্রেশন ডীড্ ১৫-১০-৩০ তারিখে সম্পাদিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় ঐ জমিতে একটি ছোট চালাঘর করিয়া বাস করিতে থাকেন। প্রতি রবিবার তিনি উপাসনাদি করিতেন। তারপর ডাঃ ডি. এন. ব্যানার্জী (কলিকাতা) তাঁর একমাত্র মৃত সন্তানের নাম দিয়া "প্রেমাশ্রম" নামে ঐ স্থানে একটি পাকা একতালা বাড়ী করাইয়া দেন। উহাতে একটি লাইব্রেরী বা পাঠাগার হয়।

এখানে প্রায় গ্রীষ্মকালে এবং অন্যান্য ছুটীতে বহু ব্রাহ্ম বাহির হইতে অবসর যাপনের জন্য আসিতেন। সে সময় নিয়মিত ভাবে এখানে উপাসনাদি হইত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী এখানে খুব সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এর পর, স্থানীয় ব্রাহ্ম যাঁরা ছিলেন তাঁরা একে একে সবাই চলিয়া গেলেন—মাত্র দুই-এক ঘর রহিলেন। মধ্যে-মধ্যে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (যাদবপুর) ও অখিল চন্দ্র রায় (কলিকাতা) এবং অন্য ব্রাহ্মরা আশ্রমে আসিয়া থাকিতেন। তখন রবিবারে উপাসনাদি হইত। অন্যান্য সময় ডাঃ দিনকর রাও ও তাঁহার পত্নী প্রতি রবিবার "প্রেমাশ্রমে" গিয়া সঙ্গীত ও পাঠাদি করিয়া আসেন। ইঁহারা ছাড়া পুরীতে বর্তমানে আর কোন ব্রাহ্ম পরিবার নাই।

বহুকাল পরে ১৯৬১ সালে "প্রেমাশ্রম" সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা

হইয়াছে। ১৯৬১ সালে বালেশ্বরে ব্রাহ্ম কন্‌ফারেন্স আহূত হইবার পর কয়েকজন ব্রাহ্ম এখানে আসিয়া থাকেন এবং কীর্তন ও উপাসনাদি করেন। তারপর এখন এখানে বিশেষ কোন কাজ হইতেছে না।

ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বিপ্রচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশে চব্বিশপরগণার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের পিতা রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অতিশয় ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের শৈশব কালেই (ভগবতীচরণের বয়স তখন ৭ বৎসর) তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বারানসীতে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন। তখন তিনি রামানন্দ স্বামী নামে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের বড় মামা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরী জিলাস্কুলে শিক্ষক ছিলেন। কিছুকাল পরে গোপাল বাবুর মৃত্যু হইলে, অপর মামা দীননাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহাদের ভার গ্রহণ করেন। তিনি কটকে থাকিতেন। কটকে মাতুলগৃহে থাকিয়া দুই ভাই লেখা পড়া আরম্ভ করেন। কটক সরকারি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া ইঁহারা যখন এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) পুরী জিলাস্কুল হইতে মধুসূদনও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কটকে আসিয়া ইঁহাদের সতীর্থ হন। তদবধি ইঁহাদের বন্ধুতা ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া আজীবন স্থায়ী হয়।

ভগবতীচরণ আজীবন শিক্ষাবিভাগেই কাজ করিয়া গিয়াছেন ; প্রথমে বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগে কার্যারম্ভ করেন, কিছুকাল পরে মান্দ্রাজ সরকার গঞ্জামে একজন ওড়িয়া জানা স্কুল পরিদর্শকের প্রয়োজন বোধ করিয়া ভগবতীচরণকে চাহিয়া পাঠাইলে বঙ্গীয় সরকারের অনুমতিক্রমে ভগবতীচরণ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। বহু বৎসর ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কার্য করিয়া পরে তিনি য়াসিস্ট্যান্ট ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হন এবং অবশেষে অস্থায়িভাবে কিছুদিন ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্-এর কার্যও করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী বহু ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। উদার ও উচ্চমনা ব্যক্তিরূপে তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। গঞ্জাম জিলার বহু অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমিদার পুত্রের তিনি শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন।

ভগবতীচরণ মান্দ্রাজ সরকারে কার্য গ্রহণ করার পরে বিপ্রচরণকে

মান্দ্রাজে পাঠাইয়া আইন পড়াইয়া আনেন। বিপ্রচরণ জ্যেষ্ঠের নিকট থাকিয়া ব্রহ্মপুরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অনতিকাল মধ্যেই তিনি তত্রত্য উকীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। চরিত্রগুণে তিনি এরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন যে তিনি কয়েক বৎসর ব্রহ্মপুর পৌরসভার অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান) এবং খল্লীকোট রাজকলেজের উপ-সভাপতি (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) হইয়াছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিউমোনিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া বিপ্রচরণ কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকালে ভগবতীচরণ বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে এরূপ সৌহার্দ্য ছিল যে কনিষ্ঠের মৃত্যুসংবাদ তখন ভগবতীচরণকে কেহ দিতে সাহস করে নাই। গোপনে শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতেছিল। অসুস্থ ভগবতীচরণ কনিষ্ঠের কয়েকদিন অনুপস্থিতিতে ব্যাকুল হইয়া, "বিপ্র কোথায়, বিপ্র কোথায়, তাকে দেখছি না কেন?" বলিয়া শিথিল চরণে কোনও মতে ঘরের বাহিরে আসিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং এই আঘাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। এই দুই ভ্রাতার অপূর্ব ভ্রাতৃপ্রেমের কথা গঞ্জামে এখনও বহুগৃহে জনশ্রুতিরূপে রহিয়াছে।

শশিভূষণ দত্ত ও পার্বতীনাথ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বেদগাঁও গ্রামের বিখ্যাত দত্তগুপ্ত বংশে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের পিতার নাম বৈদ্যনাথ দত্তগুপ্ত ও মাতা কুমারী দেবী। চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া বৈদ্যনাথ কর্মস্থলে বিদেশে চল্লিশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তদবধি ইঁহাদের পিতৃব্য চন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পিতৃহীন সন্তানগুলির অভিভাবকতা গ্রহণ করেন। চারি ভ্রাতার মধ্যে দ্বিতীয় শশিভূষণ ও কনিষ্ঠ পার্বতীনাথ পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য চন্দ্রনাথ শশিভূষণকে স্বীয় কর্মস্থলে কুমিল্লায় লইয়া গেলেন। সেখান হইতেই শশিভূষণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চারি টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ঐ সময় বেদগাঁও নিবাসী মহানুভব ভগবান দেওয়ানজী ঢাকায় বাস করিতেন; তাঁহার বাসায় থাকিয়া অনেকগুলি বালক পড়াশুনা করিত। বৃত্তিলাভ করিয়া

শশিভূষণও আসিয়া ঢাকায় দেওয়ানজীর বাসায় থাকিয়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া ঢাকা কলেজ হইতে এফ এ. পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভের পর শশিভূষণ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়িতে লাগিলেন; এবং সেখান হইতেই ১৮৭৩ সালে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম. এ. পাস করেন। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে শশিভূষণ ও পার্বতীনাথ অন্য কতকগুলি ছাত্রের সহিত মুসলমান পাড়া লেনে একটি মেসে বাস করিতেন। মধুসূদনও এফ. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া এই মেসে অবস্থান করিয়া ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

এম. এ. পাশের পর শশিভূষণ কটক হাইস্কুলের এফ. এ. শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান ও সেইখানে থাকাকালেই ঢাকা কাওরাইদের জমিদার সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের (স্যার কে. জি. গুপ্তের পিতা) দ্বিতীয়া কন্যা চপলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

অতঃপর শশিভূষণ বেথুন কলেজ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং সেখান হইতেই সরকারী কর্মে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পরও তিনি নানা সৎকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিবিধ প্রকারে সমাজের সেবা করিয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর দেহরক্ষা করেন।

পার্বতীনাথ দত্ত

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী বেদগাঁও গ্রামে পার্বতীনাথের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স দুই কি আড়াই বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। গ্রামের পাঠশালায় আট বৎসর পর্যন্ত পড়িয়া তিনি দাদা শশিভূষণ দত্তের নিকট ঢাকায় যান। তখন শশিভূষণ ঢাকা কলেজে এফ. এ. পড়িতেন। পার্বতীনাথ সেখানে ব্রাহ্মনেতা ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বাটীস্থিত ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে কয়েকমাস পড়িবার পরে জ্যেষ্ঠ সহোদর দুর্গাপ্রসাদের নিকট বরিশালে গমন করেন। দুর্গাপ্রসাদ তখন বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কার্য করিতেছিলেন। এই বিদ্যালয় হইতেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে

ছাত্রবৃত্তি পরাক্ষা দিয়া পার্বতীনাথ পুর্ববাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, ও মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পান। বৃত্তিলাভের পর তিনি দ্বিতীয় সহোদর শশিভূষণের নিকট কলিকাতা মুসলমান পাড়া লেনে মেসে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এখান হইতেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া পার্বতীনাথ ১৫ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করিয়া ২০ টাকা বৃত্তি পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া ঐ বৎসর বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ভূতত্ত্ব বিদ্যায় (Geology) বি. এস্‌সি. একই সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। ডাক্তারেরা ক্ষয়রোগ সন্দেহ করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ড যাইতে বলেন। কিছুকাল চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Sc. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়া প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট হইতে জিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৮ সালে পাবনা জেলার অন্তর্গত ওনাইগাছা নিবাসী কৈলাসচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শিশিরকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে তিনটি কন্যা ও একটি পুত্রের জন্ম হয়।

সে যুগের জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের ভারতীয় অফিসারগণের মধ্যে প্রথম ছিলেন স্বনামখ্যাত প্রমথনাথ বসু, তৎপরে দ্বিতীয় অফিসার হন পার্বতী নাথ। ভারতীয় বলিয়া তাঁহাদের উপর অনেক সময় অন্যায় নির্যাতনের চেষ্টা হইত; পার্বতীনাথ বরাবরই তেজস্বিতার সহিত সে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। এইরূপে সুখ্যাতির সহিত কার্যকাল সমাপনান্তে তিনি সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পুর্বেই ভারতবাসীরা যাহাতে এই বিভাগে অধিক সংখ্যায় যোগদান করিয়া কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে পার্বতীনাথ ভারতীয় Geological and Metallurgical Society স্থাপন

করেন। তিনি তাহার প্রথম সভাপতি এবং আজীবন তাহার সভ্য ছিলেন। কর্মোপলক্ষে যদিও তাঁহাকে অধিকাংশকাল বিদেশেই কাটাইতে হইয়াছিল, তবুও তিনি জন্মস্থানের কথা ভুলেন নাই। সুবিধা পাইলেই তিনি গ্রামে গিয়াছেন ও তাহার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিয়াছেন। স্বগ্রামের বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার অসুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি সেখানে বেদগাঁও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমত তাঁহার অর্থেই বিদ্যালয় দুইটি স্থাপিত ও পরিচালিত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহার সভাপতি থাকেন। মাতার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া পার্বতীনাথ প্রতিবৎসর দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেন।

এইরূপে জীবনের সুদীর্ঘ ৮৬ বৎসর নানারূপ সৎকার্য ও সমাজসেবায় ব্যয় করিয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতায় স্বগৃহে পরলোক গমন করেন।

ঢাকায় অবস্থান কালে ছাত্রাবস্থায় শশিভূষণ ও পার্বতীনাথ উভয়েই ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। সেই সময় আরমানি-টোলায় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের গৃহে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা হইত। সেখানে শশিভূষণের সঙ্গে পার্বতীনাথও উপাসনায় যোগ দিতেন। ক্রমে ক্রমে ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্ত হইয়া পড়েন। কেবলমাত্র বৃত্তির কয়েকটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় মেসে থাকিয়া শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করিতে উভয় ভ্রাতাকে যে কী সংগ্রাম ও কৃচ্ছ্রতা সাধন করিতে হইত, বর্তমান কালের ছাত্রদিগের নিকট তাহা অবিশ্বাস্য কাহিনী বলিয়াই বিবেচিত হইবার আশঙ্কা। মেধাবী দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্বাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই সমস্ত দুঃখক্লেশকে অগ্রাহ্য করিয়া উভয় ভ্রাতা বিভিন্ন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ও জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সৌভ্রাত্র যে কোন কালের আদর্শরূপে গ্রহণ হইবার যোগ্য।

শশিভূষণের জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার ডি. এন. মৈত্র তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে শ্রাদ্ধদিবসে যে উক্তিটি করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদিগের প্রাণও সায় দেয়:—"শশিভূষণ ছিলেন অটল, শান্ত; একদিকে ভগবানের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর, অপরদিকে তাঁর দর্শন-জ্ঞান,

তাঁকে শক্তি ও শান্তি দিয়েছিল। তিনি যে প্রকৃত মহান পুরুষ ছিলেন—এক মুনিতুল্য লোক—তার পরিচয় পেয়েছি, যখন দেখেছি তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ এবং স্থিরধী। শশিভূষণ বলতে যে ছবি আমাদের চোখের সামনে আসে, সে এক দীর্ঘকায়, ঋজুদেহ, শুভ্রবর্ণ, ধীরপদ, স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ, কারুণ্য-সহানুভূতি-মণ্ডিত আন্তরিকতায় উদ্ভাসিত, সুমিষ্ট হাস্য-শ্রী ভূষিত এক দরদী প্রেমিক জ্ঞানী উদার ধার্মিক ও সুসংযত একটি চিত্র।"

পার্বতীনাথও ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ধীর, শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের যে বস্তুটি সহজেই চোখে পড়িত, সেটি হইতেছে তাঁহার নিরলস আত্মনির্ভরশীলতা। নিজে কাপড় ধুইতে বা নিজের জুতা পরিষ্কার করিতে কোন দিনই তিনি চাকরের মুখাপেক্ষা করিতেন না। যদিও তিনি ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তথাপি তিনি বরাবরই ছিলেন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। দীর্ঘ নয় বৎসর কাল বিলাতে বাস করিয়াও তিনি সে যুগের 'সাহেব' হন নাই। তাঁর জীবনের 'মটো' ছিল—'প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙকিং'—সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। তাঁহার সংযম শক্তিও ছিল অসাধারণ। আহারে সংযম, বাক্যে সংযম, বসনভূষণে সংযম, ব্যবহারে সংযম—তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কাজ শান্ত, সংযত ও নিয়মিত ছিল। তিনি যে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই জীবন ব্যাপী সংযম সাধনার ফল।

ঈশ্বরে ভক্তি ও অটুট বিশ্বাস তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। জীবনের প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক বাক্যে ও বিশেষ ঘটনাতে তিনি ভগবানের শরণ লইতেন ; দেশে-বিদেশে, সুস্থতায়-অসুস্থতায়, মঙ্গলময়ের নির্দেশ পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকিতেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-নীতি ছিল—"প্রণমি তোমারে চলিব, নাথ সংসার কাজে"। ভগবানের নাম লইয়া দৈনন্দিন কার্য আরম্ভ করিতেন, এবং দিনান্তে সমস্ত দিনের কাজ ধীর-শান্ত-ভাবে পরম পিতার পদে নিবেদন করিতেন।

রায় বাহাদুর নন্দকিশোর দাস

(রায় বাহাদুর নন্দকিশোর দাস মহাশয়ের পৌত্র শ্রীনিকুঞ্জকিশোর দাস কর্তৃক লিখিত)

কটক জেলার জয়পুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত করণ (বঙ্গদেশে কায়স্থ শ্রেণীর অনুরূপ) পরিবারে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকিশোর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নাম নৃসিংহ চরণ দাস। নন্দকিশোর নৃসিংহচরণের দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র পুত্র। নৃসিংহচরণ ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং ওড়িষ্যায় ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় ইনিই প্রথম ডেপুটী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বদান্য ও স্বজনবৎসল ছিলেন। তাঁহার বহু আত্মীয় স্বজনকে তিনি নিজ গ্রামে আনিয়া জমি, বাড়ি, ঘর প্রভৃতি দিয়া ঐ গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। নৃসিংহচরণের একজন ধনী বন্ধু জয়পুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি নৃসিংহচরণকে নিজের প্রচুর বিষয় সম্পত্তি দেখাইয়া নৃসিংহচরণের বিষয় সম্পত্তি কিরূপ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি ঐ ধনী বন্ধুকে নিজ গৃহে লইয়া আসিয়া তাঁর বাড়ীর পিছন দিকে যেখানে একটি গর্ত করিয়া উচ্ছিষ্ট কলাপাতা ফেলা হইত, সেখানে লইয়া আসিয়া সেই স্থান ও স্বীয় পুত্রদ্বয়কে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন আমি যাহা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়াছি তাহা ইহাই, আর কোন সঞ্চয় আমার নাই। নৃসিংহচরণের গৃহে বহু লোকের অন্নসংস্থান হইত।

নন্দকিশোর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কটক জিলা হাইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের অফিসে চাকুরি লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কাজ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি স্ব-ইচ্ছায় শাসন বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। এই বিভাগে ২,৩ বৎসর মাত্র কাজ করার পর তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। তিনি অধ্যবসায়ী কর্মতৎপর ও বিচক্ষণ থাকাতে অল্প কালের মধ্যেই গড়জাত মহালের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পদে, কমিশনার সাহেবের Assistant হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক কমিশনার—T. E. Ravenshaw—সাহেব ইঁহার কর্মকুশলতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষ্যায় যে ভীষণ (ন-অংক) দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল সে সময় নন্দকিশোরের কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিবিবেচনার ফলে সহস্র সহস্র লোক আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

গুণমুগ্ধ ইংরাজ সরকার তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং তাঁহাকে ডেপুটিপদ হইতে ডেপুটী কমিশনার পদে উন্নীত করিয়া অনুগুলে অবস্থাপিত করেন। তাঁহার রায়বাহাদুর খেতাবে উল্লেখ ছিল 'For excellent services rendered during the great famine of Orissa in 1866.'

নন্দকিশোর অনুগুলে কার্য করিবার সময় Angul Regulation নামে বই লিখিয়াছিলেন। অনুগুল এই রেগুলেশন অনুযায়ী বহুকাল শাসিত হইয়াছিল এবং এখনও জঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে সেই আইন প্রচলিত রহিয়াছে। তিনি কন্দ ও যুআঙ্গ প্রভৃতি আদিবাসীদের কথিত ভাষার বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে তাহার যথাযথ প্রতিশব্দ দিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সে পুস্তক এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অনুগুলে কার্য করিবার সময় তিনি "পঁচিশ সওয়াল" নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে ওড়িষ্যার গড়জাত রাজাদিগের প্রচলিত রীতি নীতি ও উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে চিরাচরিত প্রথা প্রভৃতির উল্লেখ ছিল। অনুগুলে চাকুরি করার শেষের দিকে ইংরাজ সরকার তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে উন্নীত করিয়া পুরীর কলেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি হঠাৎ বাতরোগে আক্রান্ত হন, এবং পুরীতে কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁর অনুগুল হইতে যাত্রা করার যেদিন স্থির হইয়াছিল সেইদিনই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে তিনি পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

ওড়িষ্যার তৎকালীন কমিশনার তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ও বহু বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। নন্দকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকিশোর রেভেন্‌শ' কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া যখন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন রেভেন্‌শ সাহেব নন্দকিশোরকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন "Welldone, Orissa !"

স্বর্গীয় মধুসূদন দাস তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মিস্টার দাস যখন কলিকাতায় ওকালতী করিতেন তখন নন্দকিশোর তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবর্তনা দিয়া ও ওড়িষ্যায় তাঁহার স্থায়িভাবে যথেষ্ট আয় হইবে এই আশা দিয়া ওড়িষ্যায় আনাইয়াছিলেন।

নন্দকিশোর দেহত্যাগের পূর্বেই নিজের আরোগ্য লাভের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মিস্টার দাসকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"At a better place and

under better circumstances I might perhaps have recovered, but here seems to be no hope, ইত্যাদি।" নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর রায়বাহাদুর সুদামচরণ নায়ক উৎকল দীপিকাতে নন্দকিশোরের বহু গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ওড়িষ্যার ব্যাসকবি ফকীরমোহন সেনাপতি তাঁর 'উৎকল ভ্রমণ' পুস্তকে লিখিয়াছেন

"হে নন্দকিশোর, সর্ব গুণরে নিপুণ,
গাইবাকু তুম্ভ যশ নাহি মোর গুণ,
গড়জাতি রজাঙ্কর রখিবাকু মান
করিবি মু কাহা সঙ্গে তুম্ভঙ্কু সমান।'
... ...
সাপ ন মরিব পুণি বাড়ি ন ভাঙ্গিব,
এ কৌশল তুম্ভছড়া কে অবা জানিব
সিভিল সর্ভেণ্ট এ্যাণ্ড পলিটি এজেণ্ট
জয় জয় জয় ওড়িষ্যার মনুমেণ্ট!"

নন্দকিশোর অনেক গুণে ভূষিত ছিলেন। শাসনকার্যে পারদর্শিতা, সর্বসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে অমায়িকতা ও সৌজন্য, আত্মীয় বন্ধুগণের সম্বন্ধে আন্তরিকতা, তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার পিতা নৃসিংহচরণের মত তিনি মিতব্যয়ী হইলেও দানশীল ছিলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে অনেক মেধাবী ছাত্রকে অর্থ সাহায্য দিয়া তাহাদের পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এবং অনেকের কর্মসংস্থানও করিয়া দিতেন।

ঘোড়ায় চড়া ও শিকার করাতেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। কটকে নিজ গৃহে বাসকালে তিনিঅতি প্রত্যুষে উঠিয়া শহরস্থ তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন।

উৎকল-সাহিত্য পত্রিকার ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গ হইতে নিম্নের দুটি অনুচ্ছেদ গৃহীত।

১। স্বর্গীয় মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর—

প্রথিতযশা মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে-র পরলোক গমনে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। দীর্ঘকাল ধরিয়া মহারাজা উৎকল ভূমিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে মহারাজা যৌবন কাল

হইতেই নিজকে নিয়োজিত করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দেশের সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও যোগ ছিল। নিজে সাহিত্যিক ছিলেন না, সেরূপ অনুচিত দাবীও তিনি কখনও করেন নাই, কিন্তু উৎকল সাহিত্য তাঁহার নিকট যথেষ্ট ঋণী। তিনি চিরদিন সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট উৎসাহদাতা ছিলেন। বিপন্নের সাহায্যের জন্য তিনি সর্বদাই উন্মুখ থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বহুলোক একটি বড় ভরসাস্থল হারাইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। আতিথ্য ও সৌজন্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া উৎকল আজ যথার্থই অধিক দরিদ্র হইয়া পড়িল।

২। স্বর্গীয় জগমোহন লাল—

একটি প্রাচীন শ্রেণী উৎকল হইতে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। শিক্ষার প্রসার হইতেছে, সভাসমিতির অনুষ্ঠানও চলিয়াছে, কিন্তু সে-শ্রেণীর লোক আর দেখা যায় না। স্বর্গীয় জগমোহন লাল এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। আমরা সুদীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। বহু ভাবে তাঁহার সংস্পর্শ লাভের সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার সহজ সুন্দর সতেজ মনুষ্যত্বের পরিচয় পাইয়াছি। সাধুতা নির্ভীকতা মনস্বিতা স্পষ্টবাদিতা ও কর্মঠতার যে উন্নত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, তাহা আধুনিক উৎকলে বড় বিরল। ···লালাসাহেব একজন যথার্থ কর্মীপুরুষ ছিলেন, কর্তব্যকে দেবতার আসনে রাখিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর জীবনে বাক্য ও কার্যের সমতা ছিল। তিনি সত্যপথ, ন্যায়পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করেন নাই। পল্লীগ্রামে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও স্বীয় বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা সামান্য বীরত্ব নয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর দান সামান্য নয়। উৎকলের নাট্যসাহিত্য, ইঁহার রচিত 'বাবাজী ও সতী' নাটকের অপেক্ষা যে খুব বেশি ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে তাহা মনে হয় না। হায়, উৎকলে এইরূপ বহুসংখ্যক খাঁটি মানুষ কবে দেখা দিবে!

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

(স্কুলেখিকা শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্তৃক লিখিত)

পণ্ডিত-প্রবর আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাকে লিখিতে বলা হইয়াছে। তাঁহার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহার সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান থাকা দরকার তাহা আমার নাই। আমি যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছি সেইটুকুই লিখিলাম।

যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল আরামবাগের দিগড়া গ্রামে। যোগেশচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা রণজিৎ রায় দিগড়া গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়াই ছিলেন শাক্ত। রণজিৎ রায় গভীররাত্রে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া জপ করিতেন। এই রাজা ছাতনার শুশুনিয়ার নিকট আরামবাগের দক্ষিণে এক দীঘি খনন করেন। সেই দীঘিতে আজও লোকে বারুণী-স্নান করে। আরামবাগ বাঁকুড়ার পূর্বদিকে হুগলি জেলায়।

যোগেশচন্দ্রের পিতা ছিলেন বাঁকুড়ার সব-জজ। সে সময় দিগড়া গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। যোগেশচন্দ্রের পিতার ইচ্ছা ছিল বাঁকুড়াতেই চিরস্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করেন। বাঁকুড়ার জেলাস্কুলেই যোগেশচন্দ্রের ইংরেজী হাতেখড়ি হয়। এইখানে পড়াশোনায় যখন তিনি মগ্ন, তখন কর্মরত অবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অগত্যা তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল। পরে বর্ধমান রাজস্কুলে ভর্তি হইলেন। এই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি স্কলারশিপ পাইলেন। পাস করিয়া হুগলী কলেজে ভর্তি হইলেন। বাল্যকালে এক বৎসর মাত্র তিনি বাঁকুড়ায় ছিলেন। প্রথমদিকে কিছুদিন সেখানকার বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন।

শৈশবে যোগেশচন্দ্র দেশের পাঠশালায় পড়িতেন। পাঠশালায় চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করিতে হইত। প্রতি শুক্লা পঞ্চমীতে পাঠশালায় সরস্বতীপূজা করার নিয়ম ছিল। প্রতিমা স্থাপন করা হইত না; পুঁথিপত্র ও কাগজ-কলমই ছিলেন সরস্বতীর প্রতীক। যোগেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখিয়াছেন, “পূজার পর কি আনন্দ! মনে হইত যেন নূতন জন্ম হইয়াছে।” বিদ্যার দেবতা যে তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিরজীবনের সাধনায় প্রকাশ পায়। খুব কম বিদ্যাই আছে যাহা তিনি আয়ত্ত করেন নাই।

শৈশবে অন্যান্য শিশুর মত ইনিও গল্প শুনিতে ভাল বাসিতেন। পিসী, জেঠাই প্রভৃতির কাছে কঙ্কাবতীর 'শোলোক' শুনিতেন। নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন। পরে কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। কলেজে যোগেশচন্দ্র অধ্যাপক লালবিহারী দে'র নিকট ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। দে-মহাশয় বলিতেন, "ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিতে ও চিন্তা করিতে যখন পারিবে তখন বুঝিবে ইংরেজী শিখিয়াছ।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনার্স-সহ এম-এ পাস করিবার পর তিনি কটকে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া যান। রেভেন্‌শ' কলেজ ছিল তাঁহার কর্মস্থান। কটকে তাঁহার জীবনের ছত্রিশ বৎসর কাটিয়াছিল। প্রায় একটানাই ছিলেন। মাঝে বছরখানিকের জন্য একবার হুগলী মাদ্রাসা কলেজে আর দুই মাসের জন্য চট্টগ্রামের একটা কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি অধ্যাপকতাই করিয়াছিলেন।

ওড়িয়্যার কত ছেলেকে যে তিনি মানুষ করিয়াছেন তার সংখ্যা নাই। তখন সেখানে প্রায় সব প্রফেসরই ছিলেন বাঙ্গালী। শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পরিজা, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও—ইঁহারা ছিলেন যোগেশচন্দ্রের ছাত্র। তিনি বলিতেন, "চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাঙ্গালীই ত উড়িষ্যাকে পথ দেখাইতেছে।" যোগেশচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের পুত্রতুল্য জ্ঞান করিতেন ও সর্ববিষয়ে তাহাদের হিতচিন্তা করিতেন। যাহারা তাঁহার ছাত্র নয়, দেশের এমন সকল যুবসজ্বেরও তিনি মঙ্গল কামনা করিতেন এবং তাহাদের স্বাস্থ্য, চরিত্র, ব্যাবহারিক জীবন ও ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তা ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু যখন কটকে রেভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, তখন যোগেশচন্দ্র সেখানে কলেজের প্রফেসর। সুভাষ মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইতেন। যোগেশবাবু বলিতেন, "ওদের পরিবারে সুভাষ ছেলেটা যেন খাপছাড়া। তাকে দেখেই বোঝা যেত, ভবিষ্যতে সে একটা অসাধারণ কিছু হবে।"

যোগেশচন্দ্রের পিতামাতার প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর ইঁহার জন্ম হয়। সেই কারণে পিতামাতা তাঁহার নাম রাখেন হারাধন। বাড়ীর একটা চাকরের নামও ছিল হারাধন। হারাধন বলিয়া ডাকিলে উভয়েই সাড়া দিতেন। দশ বৎসরের বালক যোগেশচন্দ্রের ইহাতে ভারী রাগ হইল। তিনি খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া নাম বদলাইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্কুলের

পণ্ডিত মহাশয় ইহা শুনিয়া তাঁহাকে গোটা পঞ্চাশ নামের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। তিনি তার ভিতর হইতে যোগেশ নামটি পছন্দ করিয়া নিজেই নিজের নাম দিলেন। তিনি হাসিয়া গল্প করিতেন, "আমি স্বনামধন্য পুরুষ।"

ইংরেজী ১৯১২ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য যোগেশবাবু বাঁকুড়ায় বায়ু পরিবর্তনে গিয়াছিলেন। সেখানে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। বাঁকুড়া আমার পিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেশ। এইখানে তাঁহার সহিত যোগেশচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ১৮৯২ সাল হইতেই তাঁহাদের পত্রালাপ চলিত। রামানন্দের পরিচালিত "দাসী" পত্রিকায় যোগেশচন্দ্রের ছাত্র মৃগাঙ্কধর রায় তাঁহাকে লিখিতে বলেন। এই সূত্রেই সম্পাদক ও লেখকের প্রথম পরিচয়। কটক হইতে রিটায়ার্ড হইবার পর বন্ধু রামানন্দের ইচ্ছাতেই ইনি বাংলা ১৩২৭ সাল হইতে বাঁকুড়া-বাস করেন। ঐখানেই তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন এবং বাঁকুড়াতেই ৯৭ বৎসর বয়সে ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯৫৬ খ্রীঃ) তিনি অমরধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

যোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু আরও বহুবিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। চিরজীবন নূতন নূতন সাধনায় তিনি ডুবিয়া থাকিতেন এবং আয়ত্ত বিদ্যাগুলির ফল নিজ রচনার মধ্য দিয়া দেশ-বাসীকে দান করিতেন। বন্ধু রামানন্দের 'প্রবাসী'তে তিনি অনেক লিখিয়াছেন। মৃত্যুর দুই-তিন বৎসর আগেও লিখিতেন। তৎপূর্বে রামানন্দ-সম্পাদিত 'প্রদীপ' এবং 'দাসী'তেও লিখিতেন। 'নব্যভারত', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধই পরে 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'পৌরাণিক উপাখ্যান', 'পূজাপার্বণ, 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', 'Vedic Antiquity', প্রভৃতি গ্রন্থে পরিণত হয়। তাঁহার ইংরেজী রচনাও খুব সুখপাঠ্য ছিল। 'Ancient Indian Life' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে তাহা বোঝা যায়। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটি ইত্যাদি বহুভাষা জানিতেন এবং এই জন্যই তাঁহার মনীষা এত বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা নির্ণয় বিদ্যানিধি-মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্যই তিনি জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "আমি যখন কটক কলেজের প্রফেসর, তখন

দৈবক্রমে একদিন খণ্ডপড়া রাজ্যের এক জ্যোতিষীর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তাঁর নাম চন্দ্রশেখর সিংহ-সামন্ত। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি নীরবে সাধনা ক'রে চলেছিলেন, কারও কাছে আত্মপ্রকাশ করেন নি। বলতে গেলে আমিই তাঁকে আবিষ্কার করি। তিনি ইংরেজি জানতেন না, কেবল উড়িয়া আর সংস্কৃত জানতেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি তা সম্পাদনা ক'রে এবং ইংরেজীতে ভূমিকা লিখে প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। ইউরোপের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম; বইটির খুব সমাদর হয়েছিল। চন্দ্রশেখরকে F. R. A. S. উপাধি দেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রশেখরের কাছে ভারতীয় জ্যোতিষ শিক্ষা ক'রে আমি বাংলায় 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' লিখলাম। তার পর বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে জ্যোতিষের প্রয়োগ করতে লাগলাম।"

ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর আগে আর্যেরা ভারতে আসেন। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় বলতেন, "আমি প্রমাণ করেছি ও করব যে ভারতে আর্য্য কৃষ্টির বয়স দশ হাজার বছরের কম নয়।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সকল সৃষ্টিই জ্ঞানের বিষয়। তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলগান ইত্যাদি লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, ইত্যাদি কবিদের গ্রন্থ-রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের কাল নির্ণয় তাঁহার একটি কীর্তি। চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনার কবি ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছাতনায় বাসুলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন। তিনি মনে করিতেন নান্নুরের মাঠে এবং ছাতনার গ্রামে তাঁহার কিছুকাল কাটিয়া থাকিবে। তাঁর মতে চণ্ডীদাস ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তভূমের রাজা হামীর উত্তর রায় চণ্ডীদাসকে বাসুলী দেবীর বড়ুকার্যে নিযুক্ত করেন।

এই সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়াই তাঁহার অগোচরে বাংলা ভাষাতত্ত্বের গোড়া পত্তন হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে বাংলা ভাষাতত্ত্বের একজন পথিকৃৎ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বাংলা অক্ষরও সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। অনেক পত্রিকা-সম্পাদক তাঁহার নীতি বুঝিতেন না,

অনেকেরই প্রেসে তাঁহার প্রস্তাবিত টাইপের অভাব ছিল। তিনি বলেন, "এমন অবস্থা থেকে আমাকে রক্ষা করেন আমার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমার অক্ষর-সংস্কার-নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। নূতন টাইপ তৈরী করিয়ে তিনি আমার প্রবন্ধগুলো 'প্রবাসী'তে ছাপতে আরম্ভ করলেন।" যোগেশচন্দ্রের অক্ষর-সংস্কারের মূলনীতি এখন প্রায় সকল প্রেসেই ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইয়াছে। ওড়িষ্যা হইতে যখন তিনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া 'প্রবাসী' প্রভৃতিতে ছাপিতেন, তখন কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "একজন উড়িয়া আমাদের বাংলা শেখাচ্ছেন!"

ওড়িষ্যায় যোগেশচন্দ্রের সমস্ত যৌবনকাল কাটিয়াছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের আগেই ওড়িষ্যায় বসিয়া চরকার উন্নতি চিন্তা করিয়াছেন, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। সপ্তাহে সপ্তাহে College Extension Lecture-এর ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি ওড়িষ্যার মধুসূদন দাস, ভক্তকবি মধুসূদন রাও, গোপবন্ধু দাস প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিয়া ওড়িষ্যার কল্যাণে ব্রতী হইয়াছিলেন। ওড়িষ্যাও তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিল, সেখানকার কবি কবিতায় তাঁহার স্তব করিয়াছেন। সেখানের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দেন; উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত করেন। ওড়িষ্যায় বসিয়াই তিনি বাংলা শব্দকোষ ও বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। যোগেশচন্দ্র বলিতেন, "সার জে. সি. বোস আমার প্রত্যেক কাজ appreciate করতেন, তবে আমি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যাঁর কাছে পেয়েছি তিনি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দবাবু। তাঁর উৎসাহ না পেলে আমি অগ্রসর হতে পারতাম কি না সন্দেহ।"

যোগেশচন্দ্রের রচনার একটি বিশেষ স্টাইল আছে। ডক্টর সুকুমার সেন ইঁহাকে 'বঙ্কিম রীতির শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক' বলেন। কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইঁহার রচনার নিজস্ব একটা বিশেষত্ব আছে। ইঁহার রচনা-পদ্ধতি সরল ও আধুনিক, কিন্তু ইহা আধুনিক অন্য লেখকদের মত নয়। এই আধুনিকতা তাঁহার নিজস্ব। তিনি জটিল করিয়া বা স্টাইল দেখাইবার জন্য ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া লিখিতেন না। ইহাতে লেখা অতি সহজে বোধগম্য হইত। যোগেশচন্দ্রের পরে যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ইঁহার নিকট ঋণী এবং এই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

যোগেশচন্দ্র প্রায় সকল বিষয়েই লিখিতেন—ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও কলা, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতিষ ও রসায়ন, বেদ ও পুরাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়েই তাঁহার চিন্তা ধাবিত হইত এবং তাহার ফল প্রবন্ধাকারে লোকসমাজকে তিনি উপহার দিতেন। সাধারণ লোকাচার, দেশের স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, পথ-ঘাট, ইত্যাদি কোনো বিষয় তাঁহার চক্ষু ও মনকে এড়াইত না। যখন তিনি দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য স্বয়ং লিখিতে পারিতেন না, তখনও তাঁর শিষ্যদের সাহায্যে তিনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বাংলা ১৩৪১ সালে বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পুরা-কৃতি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি, ধাতুমূর্তি, সীসা বা ধাতুর তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৬৭ সালের ২১শে বৈশাখ এই মিউজিয়মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়—"আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন" নামে। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা ও তদীয় সংগ্রহশালা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবিতকালে ৪ঠা কার্তিক, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার ৯১ বর্ষ পূর্তির জন্ম দিবসে বাঁকুড়ায় তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল।

তিনি বোধহয় ওড়িষ্যাতেই 'বিজ্ঞানভূষণ' উপাধিও পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় স্থানের মধ্যে আরামবাগ, কটক ও বাঁকুড়ার কথা তাঁহার রচনাবলীতে বারে বারে উল্লিখিত হইয়াছে। একটি জন্মভূমি, একটি কর্মভূমি ও তৃতীয়টি শেষ জীবনের বাসভূমি।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

(ক্ষীরোদচন্দ্রের অন্যতম পুত্র শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক লিখিত)

ভক্তকবি মধুসূদন রাও মহাশয়ের অন্যতম প্রিয়বন্ধু ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়। কটকে তুলসীপুরে ক্ষীরোদচন্দ্রের 'হার্মিটেজ' নামক গৃহ-সংলগ্ন বাগানে একটি বড় হরিতকী গাছ ছিল। প্রায়ই ক্ষীরোদচন্দ্র সেই হরিতকী বৃক্ষতলে বসিয়া নিজের কাজ সমাধান করিতেন। এখনও

চোখে ভাসে সেই হরিতকী বৃক্ষের নিয়ে ভক্তকবি মধুসূদন ও ক্ষীরোদচন্দ্রের গভীর আলাপন।

ক্ষীরোদচন্দ্রের জীবন কর্ম্মময় ছিল। চব্বিশ পরগণার বড়িশা গ্রামে কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ গোত্রীয় রায়চৌধুরী বংশে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ক্ষীরোদচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীকুমার রায়চৌধুরীর মৃত্যু ১৮৫৮ সালে হওয়াতে বালক ক্ষীরোদ-চন্দ্রের বাল্যজীবন দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এবং বরাবর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। প্রত্যহ ১৪।১৫ মাইল হাঁটিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্কুলে যাতায়াত করিতে হইত। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. ও প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষীরোদচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পাস করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেযুগে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অতুলনীয় প্রভাব। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও সংস্কার-প্রচেষ্টায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২ অগস্ট (বাং ৭ই ভাদ্র) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবসে কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দ-মোহন বসু, শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী), মোহিনীমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, শ্রীনাথ দত্ত, প্রভৃতি একুশজন যুবকের সহিত ক্ষীরোদচন্দ্রও কেশবচন্দ্রের নিকট শপথ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। বলাবাহুল্য, কেশব-চন্দ্রের জীবনাদর্শ ইঁহাদিগের সকলকেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

কর্ম্মজীবনে তিনি প্রথমে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ও পরে গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক এবং প্রিন্সিপালও হইয়াছিলেন। তিনি পুরী, কটক, ভাগলপুর ও ছাপরা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। ছাপরা স্কুলে রাজেন্দ্র প্রসাদ (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদের আত্মজীবনীর মধ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—"উন দিনো স্কুলকে হেডমাস্টার থে শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী: বহ বড়ী নামী ও বিদ্বান হেডমাস্টার সমঝে জাতে থে। স্কুলমে ইনকা রোব বহুত থা। কেবল লড়কে হি নহী, মাস্টার লোকভি কাঁপতে থে।" তাঁহার ছাত্রবৎসলতা বিষয়েও রাজেন্দ্র প্রসাদ বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন

কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে তিনি রেভেন্‌শ' কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম কলেজে থাকাকালে তিনি পালি শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও পালি পড়ানো হইত না। যতদিন পালি ভাষা ভারতে সজীব থাকিবে ততদিন তাঁহার এই কীর্তিগাথা নগরে-নগরে, পল্লীতে-পল্লীতে বিঘোষিত হইবে।

সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কটকে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন।

বাংলা লেখক হিসাবে ক্ষীরোদচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। পুরাতন নব্যভারত, সাহিত্য, বঙ্গবাণী, সাধনা, বঙ্গদর্শন, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণব ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণামুলক প্রবন্ধের বহু সমাদর হইয়াছিল। বিবর্তবাদ (Evolution of Life)-সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক 'মানব প্রকৃতি' বাংলায় প্রকাশিত হইবার পর, ভারতবর্ষে নয়টি ভাষায় উহার অনুবাদ হয়। কটকে অবস্থান কালে, তিনি "মৃণ্ময়ী" নামক মাসিক পত্রিকার কয়েক বৎসর সম্পাদন করেন। প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Orissa ও বিষণস্বরূপ মহাশয়ের Konarak পুস্তকে তাঁহার ঋণ স্বীকৃত আছে।

ওড়িষ্যার রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষীরোদচন্দ্রের অবদান ইংরাজী ভাষায় প্রথম সাংবাদিকরূপে। ১৯০৩ সালে তিনি Star of Utkal নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্থাপনা করেন। সম্পূর্ণ একাকী সেই পত্রের সম্পাদক হিসাবে তাঁহার বহু প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ওড়িষ্যার এই প্রথম ইংরাজী সংবাদ পত্র কয়েক বৎসর পরে সপ্তাহে দুইবার (Bi-weekly) ও তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই সপ্তাহে তিনবার (Tri-weekly) প্রকাশিত হইত। ১৯১৫ সালে ক্ষীরোদচন্দ্র স্টার অব উৎকল-কে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করিতে মনস্থ করেন।

নির্ভীক ক্ষীরোদচন্দ্র Star of Utkal-এ রাজশাসনের তীব্র সমালোচনা করিতেন। উৎকলের সর্বপ্রকার উন্নতির দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। ওড়িয়া ভাষাভাষীরা একই শাসনে আসিয়া বা বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত হইয়া যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য তিনি নির্ভীক ভাবে প্রায়ই লিখিতেন। তাঁহার এইরূপ তীব্র সমালোচনার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কয়েকবার সতর্ক করা হইয়াছিল। স্টার অব উৎকল যেমন এক দিকে জনপ্রিয় হইয়াছিল,

অন্যদিকে সেইরূপ রাজরোষে পড়িয়া যায়। Bihar and Orissa Administrative Report-এ কয়েক বৎসর এই পত্রিকার নাম সম্মানের সহিত উল্লেখ করা হয়। পরের কয়েক বৎসরের য়্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে লেখা হয় যে, এই অবসরপ্রাপ্ত (pensioner) শিক্ষকের রাজশাসন সম্বন্ধীয় সমালোচনা বিশেষ তীব্র হইতেছে। কিন্তু কর্তব্য-পরায়ণ ক্ষীরোদচন্দ্র, নিজের সাংবাদিকের আদর্শ ও উৎকলের মঙ্গলসাধনার ব্রত হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সম্মত হইলেন না। এই সময় উড়িষ্যার রাজনীতি ক্ষেত্রে দুইজন প্রতিভাশালী লোক ছিলেন—একজন মধুসূদন দাস, C. I. E., অপরজন ক্ষীরোদচন্দ্র।

মধুসূদন দাস বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী ছিলেন এবং ওড়িষ্যার করদ রাজাদের উপর তাঁহার বিশেষরূপ প্রতিপত্তি ছিল। খৃষ্টধর্মাবলম্বী মধুসূদন দাস একটি বঙ্গ মহিলাকে নিজের কন্যারূপে গ্রহণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও মধুসূদনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ওড়িষ্যার নানা শিল্পকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। মধুসূদনের রাজনীতিক স্বপ্নই ছিল ওড়িয়া ভাষাভাষীদের এক স্বতন্ত্র রাজ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা। আজ মধুসূদনের সেই স্বপ্ন সফল হইয়াছে।

মধুসূদন দাস ও ক্ষীরোদচন্দ্রের চেষ্টায় ওড়িষ্যার বহু কল্যাণ সাধন হয়। উৎকলের ঘরে ঘরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহাদের নাম সুপরিচিত ছিল। তাঁহাদের গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় বহুলোকের সমাগম হইত। সভা সমিতিতে এই দুইজন উপস্থিত না থাকিলে, সভাকার্য যেন অসম্পূর্ণ থাকিত। উভয়ের মধ্যে নানা রাজনীতিক মতের বিভিন্নতা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত সম্প্রীতি বজায় ছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি Bihar and Orissa Government, স্টার অব উৎকল-এর নানা সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া দুই হাজার টাকা জামিন (Security) দাবী করেন। ক্ষীরোদচন্দ্র এই জামিন দিয়া নিজের গলায় ফাঁস লাগাইয়া কাগজ চালাইতে অস্বীকৃত হন। তিনি Star of Utkal কাগজ বন্ধ ক'রিয়া দেন। কাগজের শেষ সংখ্যায় "Adieu" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "We would rather drown the Paper in the waters of the Bay of Bengal than work with a halter round the neck."

'স্টার অব উৎকল' বন্ধ করিবার পরসপ্তাহ হইতেই ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁহার প্রিয়বন্ধু, ভক্তকবি মধুসূদন রাও-প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে অধ্যাপনা

আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি হিন্দু কলেজ নামে একটি স্বতন্ত্র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাব্রতী ক্ষীরোদচন্দ্র এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় নিজের প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। চারটি ছাত্র লইয়া এই স্কুল আরম্ভ করেন, কয়েক মাসের মধ্যেই ইহাতে প্রায় তিনশত ছাত্র হয়। ১৯১৬ সালের ২৭শে জুন তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ৩০শে জুন প্রাতঃকালে পরলোক গমন করেন।

ক্ষীরোদচন্দ্রের দেহাবসানে নানা ইংরাজী, বাংলা ও ওড়িয়া কাগজে তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বাহির হয়। বাঙ্গালী, বেঙ্গলী, হিন্দুপেট্রিয়ট, সঞ্জীবনী, তত্ত্ববোধিনী, রত্নাকর, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বৌদ্ধবন্ধু, অমৃতবাজার, স্টেট্‌স্‌ম্যান, উৎকল দীপিকা, উৎকল সাহিত্য, প্রভৃতি পত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে ক্ষীরোদচন্দ্রের অন্যতম প্রিয় ছাত্র, বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশনের হেডমাস্টার কর্মবীর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—"সে সময় ছাত্রমণ্ডলীতে অনেকে ব্রাহ্মদের নিন্দা করিতেন. আমিও তাঁহাদের মুখে শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মদিগকে কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ মনে করিতে শিখিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম, আমাদের প্রবীণ শিক্ষক ব্রাহ্ম, তখন অবাক্ হইয়া ভাবিতাম, যদি এইরূপ পূত চরিত্র ও সহৃদয়তা ব্রাহ্মধর্ম সাধনের ফল হয়, তবে সে ধর্ম তো সকলের নমস্য। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতেই শুনিতাম, শিক্ষক মহাশয়ের গৃহ হইতে ভগবানের গুণগান ও স্তোত্র ধ্বনিত হইতেছে।"*

মধুসূদন রাওয়ের যুগ উৎকলের স্বর্ণযুগ (Golden Age) বলা যাইতে পারে। একদিকে মধুসূদন রাও, প্যারীমোহন আচার্য. ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুভাষচন্দ্রের পিতা—জানকীনাথ বসু, বৈজ্ঞানিক যোগেশচন্দ্র রায়, কবি রাধানাথ রায়, গণিতবিদ্ বিপিন বিহারী গুপ্ত, ওড়িয়া সাংবাদিক—গৌরীশঙ্কর রায় ও বিশ্বনাথ কর; অন্যদিকে ইঁহাদের শিষ্যগণ—যথা, গোপবন্ধু দাস, নীলকণ্ঠ দাশ, গোদাবরীশ মিশ্র, বিশ্বনাথ দাস, ব্রজসুন্দর দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট প্রেমের সম্বন্ধ ছিল, তাহা অতুলনীয়—ধর্ম, জাতি বা প্রাদেশিকতা সেই দৃঢ় প্রেম-সম্বন্ধকে কোন রকমেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের স্ব-স্বীকৃত পটভূমিকা অতি বিস্তৃত ছিল। কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ভগবানে বিশ্বাস তাঁহাদের পাথেয়

* নব্যভারত, ১৩২৪ সাল।

ছিল। ওড়িষ্যার বর্তমান যুগের লোকেরা হয়তো অনেকেই জানেন না যে, ওড়িষ্যার সেই স্বর্ণযুগের (Golden Age) সাধনার ফল ইঁহারা উপভোগ করিতেছেন। এই যুগে সাহিত্যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিক্ষাজগতে, আধ্যাত্মিকতায় ওড়িষ্যায় যে বিশেষ জাগৃতি হয়, সেই জাগৃতির মূলে ছিল এই মহাপুরুষগণের আপ্রাণ চেষ্টা—তাঁহারা কেহই অর্থবলে বলী ছিলেন না, তবে তাঁহাদের চরিত্রবল এবং কর্তব্যপরায়ণতা তাঁহাদের প্রধান সম্বল ছিল। সেই যুগের এই সাধকগুলি নানাভাবে ওড়িষ্যার যে কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বর্তমান কালের লোকদের কৃতার্থ বোধ করা উচিত। এক হিসাবে ভক্তকবি মধুসূদন রাওকে কেন্দ্র করিয়া এই বৃহত্তর উৎকলীয় পরিবার উৎকলে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। উৎকল ব্রাহ্মসমাজ ইঁহাদের জীবনে বহুভাবে আলোকপাত করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা জানকীনাথ বসু মহাশয় উৎকল ব্রাহ্মসমাজে নানা সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। এই নবযুগের কর্মীদের ভিতর একটা আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা ছিল, সে প্রেরণা না থাকিলে তাঁহারা হাসিমুখে অর্থের অনটনের মধ্যে এইরূপ বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন না।

ক্ষীরোদচন্দ্র আজীবন স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি উচ্চশিক্ষা দিয়াছিলেন। এক কন্যা বঙ্গদেশের সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে ব্রতী ছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় আসামের উচ্চ রাজকর্মী ও ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের বিধবা কন্যার সহিত। বিধবা মহিলা বিবাহ করিয়া তিনি ওড়িষ্যায় ভদ্রসমাজের সম্মুখে এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। কটকে মহিলাদের জন্য যখন কলেজ স্থাপিত হয় তখন ক্ষীরোদচন্দ্রের সহিত তৎকালীন বিহার ও ওড়িষ্যার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকৃশন-এর সহিত বহু পত্র বিনিময় হইয়াছিল। এমন কি ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁহাকে লেখেন যে, তিনি অবৈতনিক হিসাবে Girls' College-এর অধ্যাপকতা করিতে সম্মত আছেন। ক্ষীরোদচন্দ্র-প্রদত্ত মহিলা কলেজের পরিকল্পনা (Scheme) খুবই কার্য্যকরী হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ওড়িষ্যার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েক কথা বলা যাইতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনের প্রথম দৃষ্টান্ত কটকের সরকারী মেয়েদের স্কুল—রেভেন্‌শ'

বালিকা বিদ্যালয়। সেখানে তৎপূর্বে বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষাতেই, ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ানো হইত। ভক্তকবি মধুসূদন রাও মহাশয়ের প্রথমা কন্যা বাসন্তী ও রায়বাহাদুর নন্দকিশোর দাস মহাশয়ের কন্যা নিশামণি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল হইতে প্রথম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করেন।

তাহার দুই বা এক বৎসর পরে জগন্নাথ রাও-এর কন্যা, রেবা (ভক্তকবির ভ্রাতুষ্পুত্রী) ও কটকের প্রখ্যাত উকীল প্রিয়নাথ চ্যাটার্জির কন্যা, বসুমতী ঐ স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাস করেন। মধুসূদনের অন্যতমা কন্যা, শ্রীমতী অবন্তী (এই গ্রন্থের লেখিকা) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রেভেন্‌শ' বালিকা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করেন। তাহার পর উক্ত বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী রেবা রায় মডেল গার্লস স্কুল নামে মেয়েদের জন্য এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কটকে স্থাপন করেন। ইহার জন্য শ্রীমতী রেবা রায়কে অর্থ ও সামর্থ দ্বারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই স্কুল হইতে চন্দ্রমুখী ষড়ঙ্গী নামে একটি ওড়িয়া খৃষ্টান মেয়ে এবং জ্যোতির্ময়ী ঘোষ—পরে ডাক্তার প্রবোধ রায়ের স্ত্রী—প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা পাস করেন। রেবা রায় তাঁর স্কুলের জন্য বঙ্গদেশ হইতে কয়েকটী ব্রাহ্ম শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আনিয়াছিলেন।

মধুসূদন দাস মহাশয়ের পালিতা কন্যা শৈলবালা দাস বিলাত হইতে ফিরিয়া এই সময়ে কটকে আসেন ও ওড়িষ্যায় স্ত্রী-শিক্ষাকে দৃঢ়ীভূত এবং প্রসারিত করিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় রেভেন্‌শ' বালিকা বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পরিণত হয়। রেবা রায়ের আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় (Model Girls' School) এই স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, ইন্দুবালা ঘোষাল, প্রভৃতি আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ রেভেন্‌শ' গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য এই দুই মহিলা (স্বর্গীয়া রেবা রায় ও শ্রীমতী শৈলবালা দাস) যাহা করিয়াছিলেন তাহাই পরোক্ষভাবে বর্তমান কালে ওড়িষ্যার গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে অসংখ্য বালিকাবিদ্যালয়ে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। সম্মিলিত রেভেন্‌শ' বালিকা বিদ্যালয় ওড়িষ্যার স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসের প্রধান সোপান বলা যাইতে পারে।

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ক্ষীরোদচন্দ্রের দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহার সংগৃহীত পাঁচ হাজার পুস্তক রেভেন্‌শ' কলেজে দান করেন। —গ্রন্থকর্ত্রী

পরিসমাপ্তি

উৎকলের নবযুগের সূচনায়, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি বিশিষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিবার আমার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু বার্দ্ধক্যনিবন্ধন আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম পুস্তকমধ্যে স্থানে স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যদি উৎকলের কোনও সুসন্তান আমার এই ত্রুটির সংশোধনে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে আমার আনন্দের কারণ হইবে :—

১। কর্মবীর গৌরীশঙ্কর রায়—ওড়িয়া 'উৎকল দীপিকা' পত্রিকার সম্পাদক—ওড়িষ্যার প্রথম সাংবাদিক;

২। উৎকল বন্ধু টি. ই. রেভেন্‌শ' সাহেব, আই. সি. এস., ওড়িষ্যার বিভাগীয় কমিশনার;

৩। জন বীমস্ সাহেব;

৪। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই., ইনস্পেক্টর অব স্কুল্‌স্, (বঙ্গ বিহার ও ওড়িষ্যা);

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস., ওড়িষ্যার বিভাগীয় কমিশনার;

৬। কুলবৃদ্ধ মধুসূদন দাস, সি. আই. ই.;

৭। রাজা সার বাসুদেব সুঢল দেব (বামণ্ডা);

৮। মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব (ময়ূরভঞ্জ);

৯। সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব—বামণ্ডার যুবরাজ, পরে রাজা;

১০। নীলমণি বিদ্যারত্ন—'সম্বলপুর হিতৈষিণী' পত্রিকার সম্পাদক;

১১। গঙ্গাধর মেহের, কবি;

১২। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথ—বাণীভূষণ, কাব্যতীর্থ—ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদনের লেখক;

১৩। রামশঙ্কর রায়—ওড়িয়া নাটক রচয়িতা;

১৪ গোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক—'সম্বাদ বাহিকা' পত্রিকার সম্পাদক;

১৫। সামন্ত চন্দ্রশেখর (পঠাণি সামন্ত)—সুবিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্ ;

১৬। রাণী কাঞ্চনমঞ্জরী দেবী (খল্লি কোট)—রেভেন্‌শ' কলেজে একলক্ষ টাকা দান করেন ;

১৭। শশিভূষণ রায়—রাধানাথ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ;

১৮। নন্দকিশোর বল—ওড়িয়া ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি ;

১৯। ইয়ং সাহেব—খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইংরাজ মিশনারী ;

২০। ডাক্তার স্টুয়ার্ট সাহেব ;

২১। মহিলা কবি সুলক্ষণা দেবী ;

২২। জানকীনাথ বসু—কটকের বিশিষ্ট উকীল ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা ;

২৩। গোপবন্ধু দাস—জাতীয় নব জাগরণের পুরোধা, 'সত্যবাদী বিদ্যালয়' এবং 'সমাজ' নামক বিশিষ্ট ওড়িয়া দৈনিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ;

২৪। সুদামচরণ নায়ক ;

২৫। ত্যাগব্রত দেশকর্মী গোপবন্ধু চৌধুরী ;

২৬। বলরাম দাস—ভক্তকবির সহপাঠী, "বালবোধ রামায়ণ" প্রভৃতির লেখক ;

২৭। লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়ক—ওড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ও সমাজ সংস্কারক ;

২৮। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার—যিনি কয়েক বৎসর রেভেন্‌শ' কলেজে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন ;

২৯। রতন এস্টেটের জমিদার যোগীন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের য়্যাড্‌ভোকেট জেনারল সার এস. এম. বসুর পিতা—যিনি কটকে বাস করিয়া ওড়িষ্যাবাসীর সর্ব প্রকার উন্নতি-প্রচেষ্টার সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার